কাব্য-মঞ্জুষা

[কাব্য-পরিচয়, ছন্দ-শিক্ষা, কবিতা-পাঠ, শব্দার্থ-সূচী, কবি-পরিচয়, ও বিভিন্ন যুগের ভূমিকা সহ]

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

ঢাকা লাইব্রেরী, ঢাকা

১৯৪২
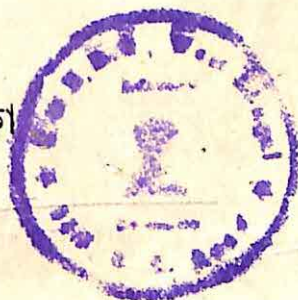
প্রকাশক ঃ
এ. এ. খান
ঢাকা লাইব্রেরী, ঢাকা

প্রথম সংস্করণ
প্রথম মুদ্রণ ঃ আষাঢ়, ১৩৪৯
পুনর্মুদ্রণ ঃ অগ্রহায়ণ, ১৩৪৯

মূল্য দুই টাকা

ঢাকা, আলেকজেণ্ড্রা এস, এম্, প্রেসে বি, এম্, বসাক কর্ত্তৃক মুদ্রিত

মুখবন্ধ

বহুদিন হইতে একখানি বাংলা কবিতা-সংগ্রহ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা মনের মধ্যে আছে; কাজটি অতিশয় পরিশ্রম-সাপেক্ষ বলিয়া, এবং অন্যবিধ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায়, এ পর্য্যন্ত সেই সাধ পূর্ণ করিতে পারি নাই। কিন্তু ইতিমধ্যে কিছুকাল যাবৎ, এই সম্পর্কে আর একটি গুরুতর প্রয়োজন অনুভব করিতেছিলাম—সেটা সাহিত্যিকের মনে নয়, মাষ্টারের মনে। বাংলাভাষা ও সাহিত্য একালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষার বিষয় হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার অনুযায়ী শিক্ষাপদ্ধতি, নানা কারণে, এখনও কার্য্যকরী হইতে পারে নাই; প্রধান কারণ, উপযুক্ত শিক্ষা-গ্রন্থের অভাব; নিজে শিক্ষকতা-কর্ম্মে ব্রতী থাকিয়া এ অভাব যেরূপ অনুভব করিয়াছি, আর কেহ সেরূপ করিয়াছেন কিনা জানিনা। আমার বিশ্বাস, পাঠ-পদ্ধতি (syllabus) যতই সুপরিকল্পিত হউক—ইংরাজী সাহিত্যের পঠন-পাঠনে যে সুবিধা আছে, বাংলা সাহিত্যের পক্ষে সে সুবিধা নাই। এ বিষয়ে চেষ্টার অভাব লক্ষিত হয় না বটে, কিন্তু যে কারণে সেই চেষ্টা ফলবতী হইতেছে না, তাহা চক্ষুষ্মান্ ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন; বিশেষ উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

এ পর্য্যন্ত যে সকল সঙ্কলন-পুস্তকের সাহায্যে স্কুলে ও কলেজে বাংলা কবিতার পঠন-পাঠন চলিতেছে, সে গুলিতে ভাল এবং উচ্চস্তরের কবিতা অনেক থাকে। কিন্তু আমার এই সঙ্কলনের অভিপ্রায় একটু স্বতন্ত্র, সে সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক।

এই পুস্তকে আমি কেবল ছাত্রগণের পরীক্ষার উপযোগী কবিতাই সঙ্কলন করি নাই, অথবা, কেবল সর্ব্বোৎকৃষ্ট কবিতাই নির্ব্বাচন করি নাই—শিক্ষার্থীর প্রয়োজন অনুযায়ী এই ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে, আমি যতদূর সম্ভব নানা প্রকারের কবিতা সংগ্রহ করিয়াছি; কোন্ কবিকে বাদ দেওয়া হইল,

সে ভাবনা না করিয়া, কয়টি উপযুক্ত কবিতার স্থান করা যাইতে পারে, সেই চিন্তাই করিয়াছি।

আমি জানি, কেবল ভাল কবিতা চয়ন করিলেই হইবে না, সেগুলিকে ভাল করিয়া পড়াইতে হইবে। এই শিক্ষা—যে কারণেই হোক—শিক্ষার্থীদের যে প্রায়ই হয় না, সে বিষয়ে আমার সাক্ষ্য আশা করি কেহ অগ্রাহ্য করিবেন না। যে সকল ছাত্র মাতৃভাষার প্রতি গভীর অনুরাগবশে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা-বিভাগে শিক্ষালাভ করিতে আসেন, তাঁহাদের অধিকাংশের অবস্থাদর্শনে বেদনা বোধ করিয়াছি—অনেকের প্রাথমিক শিক্ষাও সুসম্পন্ন হয় নাই। এজন্য, আমি এই পুস্তকে, যতদূর সম্ভব, শিক্ষকের কাজও করিয়াছি। বরং, ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, সেই পাঠন-পদ্ধতিকেই মুখ্য করিয়া আমি এই পুস্তক রচনা করিয়াছি—ইহা কেবল একখানি সঙ্কলন-গ্রন্থই নয়।

যে বয়সের ছাত্রগণের জন্য আমি এই পরিশ্রম করিয়াছি, ম্যাট্রিকুলেশন-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াই তাহাদের উপনয়ন-সংস্কার—উহাই তাহাদের সত্যকার সাহিত্যজগতে প্রবেশ করিবার কাল। তা ছাড়া, মাতৃভাষা ও তাহার সাহিত্য সম্বন্ধে একটু বিশেষ জ্ঞানলাভ—স্কুল ত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই হওয়া উচিত, এবং তাহা সুসাধ্যও বটে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেকালে মাইনর বা ছাত্রবৃত্তি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণ যেটুকু বাংলা বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া উচ্চ-ইংরাজী-স্কুলের মধ্যশ্রেণীতে স্থান পাইত, সেটুকু-ভাষা-জ্ঞান, বা বাংলা কাব্য-পরিচয় আজিকার উচ্চশিক্ষার্থী যুবকদিগের মধ্যেও কচিৎ দৃষ্টিগোচর হয়। কবিতা-শিক্ষার বিষয়ে, এই পুস্তকে, তাহারা কিছু সাহায্য পাইবে বলিয়া মনে করি।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই পুস্তক একখানি আদর্শ নির্ব্বাচন-গ্রন্থ নয়—বাংলা কবিতার সহিত মোটামুটি পরিচয় করাইবার ও তাহা ভাল করিয়া পড়াইবার

জন্য একখানি শিক্ষা-গ্রন্থ প্রণয়ন করাই আমার উদ্দেশ্য। প্রাচীন কবিতাগুলির নির্ব্বাচনে, কবিগণের নামের দিকেও দৃষ্টি রাখিয়াছি—কোন বড় নাম যেন বাদ না যায়; কারণ, এই অংশের ঐতিহাসিক মূল্যই বেশি। এ সম্বন্ধে আরও একটি কথা বলিবার আছে। এইরূপ কবিতার নির্ব্বাচনে ব্যক্তিগত রুচির বশবর্ত্তী না হইয়া, কালের বিচারই শিরোধার্য্য করা উচিত। তা ছাড়া, যে কবিতাগুলি বংশানুক্রমে প্রত্যেক বাঙালী-সন্তান পড়িয়া আসিতেছে; সেগুলির সহিত পরিচয় না থাকিলে, সাহিত্যিক সংস্কারই ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা; এজন্য আমি পুরাতন কবিতার নির্ব্বাচনে যথাসাধ্য সেই ঐতিহ্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক কবিতার নির্ব্বাচনে, আমি প্রত্যেক কবির বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াছি—অর্থাৎ, যে কবিতায় কবির নিজস্ব রচনা-ভঙ্গি ছাত্রগণের পক্ষে সহজেই বোধগম্য হয়—একের সহিত অন্যের পার্থক্য তাহারা বুঝিতে পারে—সেইরূপ কবিতাই চয়ন করিয়াছি।

কবিতার বিষয় যতটা রকমারি হইতে পারে—সেদিকেও যেমন লক্ষ্য রাখিয়াছি, তেমনই, একই বিষয়ে বিভিন্ন কবির রচনা কিরূপ বিভিন্ন হইতে পারে, তাহাও বুঝিবার উপায় করিয়াছি। কবিতার ভাষায় যে কারণে যত বৈচিত্র্য সম্ভব, গদ্যের ভাষায় তাহা ততটা সম্ভব নয়; ছাত্রগণের পক্ষে, এই ভাষার বৈচিত্র্য এবং রচনার বিবিধ ভঙ্গী বড়ই শিক্ষাপ্রদ।

এই কবিতাগুলি বিশেষ করিয়া ম্যাট্রিকুলেশন-পরীক্ষার্থী ছাত্রগণের জন্যই সঙ্কলন করিলেও, আমি এমন কবিতাও মাঝে মাঝে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি, যাহার ভাব বা ভাষা ঐ শ্রেণীর পক্ষে দুরূহ বলিয়া মনে হইতে পারে। এ বিষয়ে আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। প্রথম,—সাধারণ ছাত্রের পক্ষে যাহা দুরূহ, পরীক্ষার পাঠ্য হইতে তাহা বাদ দিলেই চলিবে। দ্বিতীয়,—দুরূহ বস্তুও শিক্ষকতার গুণে ছাত্রগণের বোধগম্য হইতে

পারে ; বিশেষতঃ, কবিতা এমন বস্তু যে, ছাত্রগণের চিত্ত আকৃষ্ট করিতে পারিলে, তাহারাই বুঝিয়া লইবার জন্য যথোচিত যত্ন করিবে। শিক্ষার ব্যাপারে এইরূপ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তৃতীয়,—একই কবিতার সরল ও গূঢ় —দুই অর্থই হইতে পারে, অবস্থাবিশেষে সহজ ব্যাখ্যাটি দিলেই চলিবে ; আমি এই পুস্তকের 'কবিতা-পাঠ'-প্রসঙ্গে অনেক স্থলে তাহা করিয়াছি। এ বিষয়ে আমার শেষ ও প্রধান বক্তব্য এই যে, সাধারণ ছাত্রগণের উপযোগী কবিতা ইহাতে যেমন প্রচুর আছে, তেমনই, যে সকল ছাত্র সুকবিতার সন্ধানে পাঠ্যতালিকার বাহিরে যাইতেও প্রস্তুত, তাহারা যেন একেবারে নিরাশ না হয়, আমি তাহাও ভাবিয়াছি। এক কথায়, আমি এই পুস্তক-খানিকে কাব্যরসপিপাসু তরুণ পাঠকগণের উপযোগী করিবার চেষ্টাও করিয়াছি। আশা করি, শিক্ষকগণও আমার এই সঙ্কল্পের অনুমোদন করিবেন।

কি আদর্শে, ও কোন্ অভিপ্রায়ে, এই পুস্তক রচনা করিয়াছি, তাহা উপরে সবিস্তারে বিবৃত করিলাম। এক্ষণে সুধীগণকে এই পুস্তকের আদ্যোপান্ত একবার চোখ বুলাইয়া দেখিতে অনুরোধ করি ; বিশেষতঃ পুস্তকের শেষভাগে আমি ছাত্রগণের জন্য যে পরিশ্রম করিয়াছি, তাহার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

অতঃপর, যাঁহাদের পুষ্পোদ্যানের মুক্ত-পথে প্রবেশ করিয়া আমি এই ফুলগুলি স্বেচ্ছামত চয়ন করিয়াছি, তাঁহাদিগের উদ্দেশে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। জাতির পিতৃস্থানীয় অতীত কবিগণের চরণ-বন্দনা করিয়া, আমি বর্ত্তমান স্বনামধন্য কবিগণকে এই সানুনয় নিবেদন করিতেছি যে, যাঁহাদের কবিতা আমি এই পুস্তকে গ্রহণ করিতে পারি নাই, তাঁহারা যেন তাহা উপেক্ষা বলিয়া মনে না করেন ; এই পুস্তকে আমি তরুণ শিক্ষার্থীদের জন্য, একটি বিশেষ প্রয়োজনবশে, এবং সুনির্দ্দিষ্ট আয়তনের মধ্যে, কয়েকটি

কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছি—ইহা বাংলা কবিতার বা কবিদিগের পূর্ণ-পরিচয়-গ্রন্থ নয়। যাঁহাদের কবিতা আমি লইয়াছি, তাঁহাদের নিকটেও আমি আমার দুইটি ত্রুটির জন্য মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতেছি। প্রথম,—সময়ের অল্পতার জন্য, এবং ঠিকানা সংগ্রহ করিতে না পারায়, ইচ্ছাসত্ত্বেও সকলের অনুমতি লইতে পারি নাই। দ্বিতীয়,—স্থানাভাবে আমি অনেক কবিতা কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত করিয়া লইয়াছি; কোন কোন অংশ, এই পুস্তকের উপযোগী হইবে না বলিয়া, ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছি। আশা করি, কারণ বুঝিয়া তাঁহারা আমার এ অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

সর্ব্বশেষে, এই সঙ্কলন-কার্য্যে আমি আমার পূর্ব্ববর্ত্তীগণের সঙ্কলিত এই শ্রেণীর পুস্তক হইতে যেটুকু সাহায্য পাইয়াছি, তজ্জন্য তাঁহাদিগকেও অন্তরের ধন্যবাদ জানাইতেছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,
রমনা, আষাঢ়, ১৩৪৯।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

পুনর্মুদ্রণের বিজ্ঞাপন

প্রথম মুদ্রণে বইখানিতে যে সকল দোষ ছিল তাহা এইবার আমার জ্ঞান ও সাধ্যমত দূর করিয়াছি। 'উন্মোচনী'-অংশে যেখানে আরও যেটুকু যোগ করা উচিত ছিল তাহা করিয়াছি, অনেক ভ্রমও সংশোধন করিয়াছি। এবার একটি বড় সংশোধন হইয়াছে—কবিতাগুলির কালানুক্রম-নির্ণয়ে অনবধানতা। পুরাতন যুগের কবিতা সম্বন্ধে আমার কোন কৈফিয়ৎ নাই; অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের কবিতাগুলির পৌর্ব্বাপর্য্য-নির্দ্দেশে আমি কবিগণের বয়স অর্থাৎ জন্ম-বৎসরের উপরেই নির্ভর করিতে বাধ্য হইয়াছি, কারণ, তাহাদের রচনা-কাল বা প্রকাশের তারিখ, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, জ্ঞাত হওয়ার উপায় নাই। এই নিয়মও আমি দুই-এক স্থানে ভঙ্গ করিয়াছি—রঙ্গলাল ও কামিনী রায়ের কবিতাগুলি কবির বয়স বা জন্ম-তারিখ অনুসারে সন্নিবেশ করি নাই,—তার কারণ যথাস্থানে উল্লেখ করিয়াছি; একই কারণে দেবেন্দ্রনাথ সেনকেও আমি পরবর্ত্তী যুগে স্থান দিয়াছি। সর্ব্বশেষের কবিতাটিও যে কারণে, কাল অপেক্ষা—স্থান ও পাত্রের মর্য্যাদাযুক্ত হইয়াছে, আশা করি পাঠকমাত্রেই তাহা বুঝিতে পারিবেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,
রমনা, অগ্রহায়ণ, ১৩৪৯।

গ্রন্থকার

সূচী

বিষয় | পৃষ্ঠা

পরিবর্ত্তন-যুগ

আধুনিক যুগ

কাব্য-মঞ্জুষা

১

প্রার্থনা *

মাধব, বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল এ দেহ সমর্পিলুঁ
দয়া জনু ছোড়বি মোয়॥

গণইতে দোষ গুণ- লেশ নাহি পায়বি
যব তুহুঁ করবি বিচার। ৫
তুহুঁ জগন্নাথ জগতে কহায়সি
জগ-বাহির নহ মুঞি ছার॥

কিয়ে মানুষ পশু পাখী কুলে জনমিয়ে
অথবা কীট পতঙ্গে।
করম-বিপাকে গতাগতি পুন পুন ১০
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গে॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর
তরইতে ইহ ভবসিন্ধু।
তুয়া পদ-পল্লব করি অবলম্বন
তিল এক দেহ দীনবন্ধু॥ ১৫

—বিদ্যাপতি

২

কৃতাঞ্জলি *

মাধব, হাম পরিণাম-নিরাশা।
তুহুঁ জগতারণ দীন দয়াময়
অতএ তোহারি বিশোয়াসা॥

কত চতুরানন মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসানা। ৫
তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত
সাগরলহরী সমানা॥

ভণয়ে বিদ্যাপতি শেষ শমন-ভয়ে
তুয়া বিনা গতি নাহি আরা।
আদি অনাদিক নাথ কহায়সি ১০
ভবতারণ ভার তোহারা॥

—বিদ্যাপতি

৩

সীতার বিবাহ

গলে বস্ত্র দিয়া বলে জনক রাজন।
তব পুত্রে কন্যা দিয়া লইনু শরণ ॥
দুই রাজা উঠি তবে কৈল সম্ভাষণ।
কন্যা আন আন বলে যত বন্ধুগণ ॥ ৪
হেন বেশ ভূষণ পরায় সখীগণ।
যাহাতে মোহিত হয় শ্রীরামের মন ॥
সখী দেয় সীতার মস্তকে আমলকী।
তোলা জলে স্নান করাইলা চন্দ্রমুখী ॥ ৮
চিরুণীতে কেশ আঁচড়িয়া সখীগণ।
চুল বান্ধি পরাইল অঙ্গে আভরণ ॥
কপালে তিলক আর নির্ম্মল সিন্দূর।
বালসূর্য্য সম তেজ দেখিতে প্রচুর ॥ ১২
নাকেতে বেশর দিল মুক্তা সহকারে।
পাটের পাছড়া দিল সকল শরীরে ॥
গলায় তাহার দিল হার ঝিলিমিলি।
বুকে পরাইয়া দিল সোণার কাঁচলি ॥ ১৬
উপর হাতেতে দিল তাড় স্বর্ণময়।
সুবর্ণের কর্ণফুলে শোভে কর্ণদ্বয় ॥
দুই বাহু শঙ্খেতে শোভিত বিলক্ষণ।
শঙ্খের উপরে সাজে সোণার কঙ্কণ ॥ ২০

বসন পরায় তারে সুন্দর প্রচুর।
দুই পায়ে দিল তার বাজন-নূপুর॥
স্ববর্ণ আসনে বসিলেন রূপবতী।
চারদিকে জ্বালি দিল সোহাগের বাতি॥ ২৪
চারি ভগিনীতে বেশ করে বিলক্ষণ।
তখন মণ্ডপে গিয়া দিল দরশন॥
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া তবে নমস্কার করে।
প্রদক্ষিণ সাত বার করিল রামেরে॥ ২৮
অবগুণ্ঠন ঘুচাইল যত বন্ধুগণ।
সীতা-রামে পরস্পর হৈল দরশন॥
জলধারা দিয়া তারা কন্যা নিল পরে।
শোয়াইল জানকীরে অন্ধকার ঘরে॥ ৩২
হস্তে ধরি আনাইল রামেরে তখন।
হস্তে ধরি তোল সীতা বলে বন্ধুজন॥
স্ত্রীলোকেরা পরিহাস করে ছল পেয়ে।
কেহ বলে হস্তে ধর কেহ বলে পায়ে॥ ৩৬
পূর্ব্বাপর বর কন্যা আইল দুই জনে।
রোহিণীর সহ চন্দ্র যেমন গগনে॥
কন্যা দান করে রাজা বিবিধ প্রকারে।
পঞ্চ হরীতকী দিয়া পরিহার করে॥ ৪০
বহু দাস দাসী রাজা দিল কন্যা-বরে।
জলধারা দিয়া কন্যা-বর লৈল ঘরে॥

রাজরাণী গিয়া পরে করিল রন্ধন।
কন্যা বর দুই জনে করিল ভোজন॥ ৪৪
সাজায় বাসরঘর যত সখীগণ।
রাম সীতা তাহাতে রহেন দুইজন॥

—কৃত্তিবাস

৪

সীতাহরণে রামের বিলাপ

হাতে ধনুর্ব্বাণ রাম আইসেন ঘরে।
পথে অমঙ্গল যত দেখেন গোচরে॥
বামে সর্প দেখিলেন শৃগাল দক্ষিণে।
তোলাপাড়া করেন শ্রীরাম কত মনে॥ ৪
বিপরীত ধ্বনি করিলেক নিশাচর।
লক্ষ্মণ আইলেন পাছে শূন্য রাখি ঘর॥
মারীচের আহ্বানে কি লক্ষ্মণ ভুলিবে।
সীতারে রাখিয়া একা অন্যত্র যাইবে॥ ৮
দুঃখের উপরে দুঃখ দিবে কি বিধাতা।
যে ছিল কপালে তাহা দিলেন বিমাতা॥
বলেন শ্রীরাম শুন সকল দেবতা।
আজিকার দিন মোর রক্ষা কর সীতা॥ ১২

যেমন চিন্তেন রাম ঘটিল তেমন।
আসিতে দেখেন পথে সম্মুখে লক্ষ্মণ ॥
লক্ষ্মণেরে দেখিয়া বিস্ময় মনে মানি।
ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন রঘুমণি ॥ ১৬
কেন ভাই আসিতেছ তুমি হে একাকী।
শূন্য ঘরে জানকীরে একাকিনী রাখি ॥
প্রমাদ পাড়িল বুঝি রাক্ষস পাতকী।
জ্ঞান হয় ভাই হারাইলাম জানকী ॥ ২০
আইলাম তোমারে করিয়া সমর্পণ।
রাখিয়ে আইলে কোথা মম স্থাপ্যধন ॥
মম বাক্য অন্যথা করিলে কেন ভাই।
আর বুঝি সীতার সাক্ষাৎ নাহি পাই ॥ ২৪
এই মত কহিতে কহিতে দুই ভাই।
বায়ুবেগে চলিলেন অন্য জ্ঞান নাই ॥
উপনীত হইলেন কুটীরের দ্বারে।
সীতা সীতা বলিয়া ডাকেন বারে বারে ॥ ২৮
শূন্যঘর দেখেন না দেখেন জানকী।
মূর্চ্ছাপন্ন অবসন্ন শ্রীরাম ধানুকী ॥
শ্রীরাম বলেন ভাই একি চমৎকার।
সীতা না দেখিলে প্রাণ না রাখিব আর ॥ ৩২
তখনি বলিনু ভাই সীতা নাই ঘরে।
শূন্যঘর পাইয়া হরিল কোন্ চোরে ॥

প্রতি বন প্রতি স্থান প্রতি তরুমূল।
দেখেন সর্ব্বত্র রাম হইয়া ব্যাকুল॥ ৩৬
পাতি পাতি করিয়া চাহেন দুই বীর।
উলটি পালটি যত গোদাবরী-তীর॥
গিরিগুহা দেখেন মুনির তপোবন।
নানা স্থলে সীতারে করেন অন্বেষণ॥ ৪০
একবার যেখানে করেন অন্বেষণ।
পুনর্ব্বার যান তথা সীতার কারণ॥
এইরূপে এক স্থানে যান শতবার।
তথাপি না পান দেখা শ্রীরাম সীতার॥ ৪৪
বিলাপ করেন রাম লক্ষ্মণের আগে।
ভুলিতে না পারি সীতা সদা মনে জাগে।
কি করিব কোথা যাব অনুজ লক্ষ্মণ॥
কোথা গেলে সীতা পাব কর নিরূপণ॥ ৪৮
মন বুঝিবারে বুঝি আমার জানকী।
লুকাইয়া আছেন লক্ষ্মণ দেখ দেখি॥
বুঝি কোন মুনিপত্নী সহিত কোথায়।
গেলেন জানকী না জানাইয়া আমায়॥ ৫২
গোদাবরী-তীরে আছে কমল-কানন।
তথা কি কমলমুখী করেন ভ্রমণ॥
পদ্মালয়া পদ্মমুখী সীতারে পাইয়া।
রাখিলেন বুঝি পদ্মবনে লুকাইয়া॥ ৫৬

চিরদিন পিপাসিত করিয়া প্রয়াস।
চন্দ্রকলা-ভ্রমে রাহু করিল কি গ্রাস॥
দশদিক্ শূন্য দেখি সীতা অদর্শনে।
সীতা বিনা কিছু নাহি লয় মম মনে॥ ৬০
সীতা ধ্যান সীতা জ্ঞান সীতা চিন্তামণি।
সীতা বিনা আমি যেন মণিহারা ফণী॥
দেখ রে লক্ষ্মণ ভাই কর অন্বেষণ।
সীতারে আনিয়া দেহ বাঁচাও জীবন॥ ৬৪

—কৃত্তিবাস

৫

সীতার পাতাল প্রবেশ

জগতের যত লোক অযোধ্যানগরে।
হেনকালে সীতা যান সভার ভিতরে॥
রামের চরণ সীতা করিল বন্দন।
বাল্মীকি রামের প্রতি কহেন তখন॥ ৪
চ্যবনের পুত্র যে বাল্মীকি নাম ধরি।
মন দিয়া শুন রাম নিবেদন করি॥
বহু তপ করিলাম ত্যজি ভক্ষ্য পানি।
সীতার শরীরে পাপ আমি নাহি জানি॥ ৮
পাপমতি নহে সীতা পরম পবিত্র।
ধ্যানে জানিলাম আমি সীতার চরিত্র॥

ঘরে লহ সীতায় কি করহ বিচার।
লব কুশ দুই পুত্র সীতার কুমার ॥ ১২
আমার বচন রাম না করিহ আন।
দুই পুত্রে লয়ে রাখ আপনার স্থান ॥
মুনি প্রতি শ্রীরাম কহেন যোড় হাতে।
সীতার চরিত্র আমি জানি ভাল মতে ॥ ১৬
শ্রীরাম বলেন সীতা শুন এ বচন।
দেখ ত্রিলোকের যে আইল সর্ব্বজন ॥
প্রথম পরীক্ষা দিলে সাগরের পার।
দেবগণ জানে তাহা না জানে সংসার ॥ ২০
পুনশ্চ পরীক্ষা দিবে সবাকার আগে।
দেখিয়া লোকের যেন চমৎকার লাগে ॥
এত যদি বলিলেন শ্রীরাম সীতারে।
জোড়হস্তে জানকী বলেন ধীরে ধীরে ॥ ২৪
কিবা কাজ মম নাথ বল এ জীবনে।
প্রবেশ করিব অগ্নি তোমার বচনে ॥
পতিকুলে পিতৃকুলে নাহি পাই স্থান।
অগ্নিতে পরীক্ষা লয়ে কর অপমান ॥ ২৮
সর্ব্বগুণ ধর তুমি বিচারে পণ্ডিত।
বুঝিয়া পরীক্ষা নিতে হয়ত উচিত ॥
অদেখা হইব প্রভু ঘুচাব জঞ্জাল।
সংসারের সাধ নাই যাইব পাতাল ॥ ৩২

আজি হৈতে ঘুচুক তোমার লাজ দুখ।
আর যেন নাহি দেখ জানকীর মুখ॥
নিরবধি অপবাদ দিতেছ আমারে।
সভায় পরীক্ষা দিতে আসি বারে বারে॥ ৩৬
ইহা কহিলেন সীতা সভা বিদ্যমানে।
মেলানি মাগি যে প্রভু তোমার চরণে॥
সীতার বচন যে শুনিল সর্ব্বলোকে।
লজ্জায় কাতরা সীতা পৃথিবীকে ডাকে॥ ৪০
মা হৈয়া পৃথিবী গো মায়ের কর কাজ।
এ কন্যার লাজ হৈতে তোমার যে লাজ॥
কত দুঃখ সহে মা গো আমার পরাণে।
সেবা করি থাকি সদা তোমার চরণে॥ ৪৪
উদরে ধরিলে মোরে তা কি মনে নাই।
তোমার চরণে সীতা মাগে কিছু ঠাঁই॥
করিলেন সীতা এই পৃথিবীর স্তুতি।
সপ্ত পাতালেতে থাকি শুনে বসুমতী॥ ৪৮
সীতা লৈতে পৃথিবী হইল আগুসার।
সপ্ত পাতাল হইতে হৈল এক দ্বার॥
অকস্মাৎ উঠিল সুবর্ণ সিংহাসন।
দশদিক্ আলো করে এ তিন ভুবন॥ ৫২
নানাবিধ বসন ভূষণ পরিধান।
মূর্ত্তিমতী পৃথিবী হইল বিদ্যমান॥

কন্যা বলি পৃথিবী সীতারে ডাকে ঘনে।
কোলে করি সীতারে তুলিল সিংহাসনে ॥ ৫৬
পরীক্ষা লইতে চান লোকের কথায়।
লোক লৈয়া সুখ রাম করুন হেথায় ॥
মায়ে ঝিয়ে দুইজনে থাকিব পাতালে।
সর্ব্বলোক শুনিল পৃথিবী যত বলে ॥ ৬০
নাহি চাহিলেন সীতা উভয় ছাবালে।
শ্রীরামেরে নিরখিয়া প্রবেশে পাতালে ॥
পাতালে প্রবেশিয়া তিলেক না থাকি।
স্বমূর্ত্তি ধরিয়া স্বর্গে গেলেন জানকী ॥ ৬৪
লক্ষ্মী স্বর্গে গেলেন হরিষ দেবগণ।
অযোধ্যানগরে হেথা উঠিল ক্রন্দন ॥
শ্রীরামের ক্রন্দন হইল অনিবার।
হাহাকার শব্দ করে সকল সংসার ॥ ৬৮

—কৃত্তিবাস

৬

শ্যাম-সুন্দর

সুধা ছানিয়া কেবা ও সুধা ঢেলেছে গো
তেমতি শ্যামের চিকণ দেহা ।
অঞ্জন গঞ্জিয়া কেবা খঞ্জন আনিল রে
চাঁদ নিঙ্গাড়ি কৈল থেহা ॥ ৪
থেহা নিঙ্গাড়িয়া কেবা মুখানি বনাল রে
জবা নিঙ্গাড়িয়া কৈল গণ্ড ।
বিম্বফল জিনি কেবা ওষ্ঠ গড়ল রে
ভুজে জিনিয়া করি-শুণ্ড ॥ ৮
কম্বু জিনিয়া কেবা কণ্ঠ বনাইল রে
কোকিল জিনিয়া সুস্বর ।
আরদ্র মাখিয়া কেবা সারদ্র বনাইল রে
ঐছন দেখি পীতাম্বর ॥ ১২
বিস্তারি পাষাণে কেবা রতন বসাইল রে
এমতি লাগয়ে বুকের শোভা ।
দাম-কুসুমে কেবা সুষম করেছে রে
এমতি তনুর দেখি আভা ॥ ১৬
আদলি উপরে কেবা কদলি রোপিল রে
ঐছন দেখি উরুযুগ ।
অঙ্গুলি উপরে কেবা দর্পণ বসাইল রে
চণ্ডীদাস দেখে যুগে যুগ ॥ ২০

—চণ্ডীদাস

৭

হতাশের আক্ষেপ *

সুখের লাগিয়া এঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া-সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল॥ ৪
সখি, কি মোর করমে লেখি।
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু—
ভানুর কিরণ দেখি॥
উচল বলিয়া অচলে চড়িনু, ৮
পড়িনু অগাধ জলে।
লছমী চাহিতে দারিদ্র্য বেঢ়ল,
মাণিক হারানু হেলে॥
নগর বসানু সাগর বান্ধিনু ১২
মাণিক পাবার আশে।
সাগর শুখাল মাণিক লুকাল
অভাগী-করম-দোষে॥
পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু ১৬
বজর পড়িয়া গেল।
জ্ঞানদাস কহে কানুর পীরিতি
মরণ-অধিক শেল॥

—জ্ঞানদাস

৮

পশুরাজের সভা

লইয়া পশুর পূজা, সিংহেরে করিয়া রাজা,
নিজ ঘণ্টা দিলা মহামায়া।
যে যার উচিত হয়, দিলা তারে সে বিষয়,
করি চণ্ডী পশুগণে দয়া ॥ ৪
সিংহ তুমি মহাতেজা, পশু মধ্যে হও রাজা,
টিকা দিলা ভবানী ললাটে।
তরক্ষু শুনহ কথা, ধরিয়া ধবল ছাতা,
থাক তুমি রাজার নিকটে ॥ ৮
শরভ কুলীন তুমি, সকল পশুর স্বামী,
ব্রাহ্মণ যেমন নরমাঝে।
হয়ে তুমি পুরোহিত, চিন্তিবে রাজার হিত,
এই কর্ম্ম অন্যে নাহি সাজে ॥ ১২
দূর কর নিজ শোক, শার্দ্দূল ভল্লুক কোক,
বরাহ গণ্ডার মহাবীর।
গুরু সঙ্গে যেন ছাত্র, লয়ে পঞ্চ মহাপাত্র,
প্রতি দিন দিবে পুষ্পনীর ॥ ১৬
সত্য করি মৃগরাজে, অভয় দিলেন গজে,
করাইল সিংহের বাহন।
আনি তথি জোড়া জোড়া, বাহন করিতে ঘোড়া,
বাজন করিল কপিগণ ॥ ২০

নিয়োজি তোমারে আমি, শুনহে চমরি তুমি,
চামর ঢুলাবে রাজ-অঙ্গে।
তোরে আমি দিলুঁ ভার, ফেরু হও রায়বার,
আপনি থাকিবে তার সঙ্গে ॥ ২৪
বৈদ্য হে নকুল তুমি, খাইবা ইনাম-ভূমি,
চিকিৎসা করিবা রাজপুরে।
পথ্যের নিয়ম শিক্ষা, করিবা পশুর রক্ষা,
ভুজঙ্গ না জিনিবে তোমারে ॥ ২৮
পশুর হাজ্‌রা মষ্য, খাইবা প্রজার শস্য,
হবে তুমি রাজার দুয়ারী।
নিশাতে জাগিয়া থাক, প্রহরে প্রহরে ডাক,
শিয়াল হও কোটাল প্রহরী ॥ ৩২
নীলকণ্ঠ বলবান, বারশিঙ্গা, ঢোলকাণ,—
পাঁজা, মিষ্ঠা, কারফরমা।
আমার পূজার ফলে, থাক সবে কুতূহলে,
বাঘে আর না খাইবে তোমা ॥ ৩৬
উট গাধা ক্ষেতি খাবে, রাজার নফর হবে,
বিপদে সম্পদে তোর ভার।
আর যত পশুগণ, সবে হবে প্রজাগণ,
মণ্ডল হইবে কালসার ॥ ৪০

—কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী

৯

কালকেতুর বিক্রম

দিনে দিনে বাড়ে কালকেতু।
বলে মত্ত গজপতি, রূপে নব রতিপতি,
সবার লোচন-সুখ-হেতু ॥
নাক মুখ চক্ষু কাণ, কুন্দে যেন নিরমাণ,
দুই বাহু লোহার সাবল। ৫
গুণ শীল রূপ বাড়া, বাড়ে যেন শাল-কোঁড়া,
জিনি শ্যাম-চামর কুন্তল ॥
বিচিত্র কপালতটী, গলায় জালের কাঁঠি,
করযুগে লোহার শিকলি।
বুক শোভে ব্যাঘ্র নখে, অঙ্গে রাঙ্গা ধূলি মাখে, ১০
কটিতটে শোভয়ে ত্রিবলী ॥
কপাট বিশাল বুক, নিন্দি ইন্দীবর মুখ,
আকর্ণ-আয়ত বিলোচন।
গতি জিনি গজরাজ, কেশরী জিনিয়া মাঝ,
মুক্তাপাঁতি জিনিয়া দশন ॥ ১৫
দুইচক্ষু জিনি নাটা, ঘুরে যেন কড়ি ভাঁটা,
কাণে শোভে স্ফটিক-কুণ্ডল।
পরিধান বীর-ধড়ী, মাথায় জালের দড়ী,
শিশুমাঝে যেমন মণ্ডল ॥

লইয়া ফাউড়া ডেলা, যার সঙ্গে করে খেলা, ২০
তার হয় জীবন সংশয়।
যে জনে আঁকড়ি করে, পড়য়ে ধরণী 'পরে,
ডরে কেহ নিয়ড়ে না রয়॥
সঙ্গে শিশুগণ ফিরে, তাড়িয়া শশারু ধরে,
দূরে গেলে ছুবায় কুকুরে। ২৫
বিহঙ্গ বাঁটুলে বিন্ধে, লতায় জড়িয়া বান্ধে,
স্কন্ধে ভার বীর আইসে ঘরে॥
গণক আনিয়া ঘরে, শুভ তিথি শুভ বারে,
ধনু দিল ব্যাধ সুত-করে।
ফোঁটা দিয়া বিন্ধে রেঝা, ছাড়িতে শিখায় নেজা ৩০
চামের টোপর দেয় শিরে॥

—কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী

১০
শিষ্য-গৌরব

তবে দ্রোণাচার্য্য সব কুমারে লইয়া।
কহিবারে লাগিলেন একান্তে বসিয়া॥
অস্ত্র বিদ্যা সবারে করাব অধ্যয়ন।
শিক্ষা করি মোর বাক্য করিবা পালন॥ ৪
মোর যেই বাঞ্ছা তাহা শুন সর্ব্ব শিষ্য।
সত্য কর তোমা সবে করিবা অবশ্য॥

দ্রোণের বচন শুনি যতেক কোঙর।
নিঃশব্দে রহিলা সবে না দিল উত্তর॥ ৮
অর্জ্জুন বলিল মোর সত্য অঙ্গীকার।
করিব পালন হয় যে আজ্ঞা তোমার॥
অর্জ্জুন বচনে দ্রোণ হরিষ অন্তর।
আলিঙ্গিয়া চুম্ব দিল মস্তক উপর॥ ১২
তবে দ্রোণাচার্য্য লৈয়া সব শিষ্যগণ।
অহর্নিশ নানা বিদ্যা করান পাঠন॥
তবে কতো দিনে দ্রোণ বিদ্যা পরীক্ষিতে।
রচিয়া কাষ্ঠের পক্ষী রাখিলা বৃক্ষেতে॥ ১৬
একে একে ডাকিলেন সব শিষ্যগণে।
আগে জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের নন্দনে॥
ধনুঃশর দিল দ্রোণ যুধিষ্ঠির করে।
ভাস পক্ষী দেখাইয়া কহেন তাহারে॥ ২০
ঐ দেখ ভাস পক্ষী বৃক্ষের উপর।
উহারে করিয়া লক্ষ্য রাখ ধনুঃশর॥
যেইক্ষণে মম আজ্ঞা হইবে বাহির।
সেইক্ষণে কাটিবে উহার তুমি শির॥ ২৪
এত শুনি ধনুঃশর ধরি যুধিষ্ঠির।
ভাস পক্ষী পানে দৃষ্টি করিলেন স্থির॥
ডাকিয়া বলিল দ্রোণ কুন্তীর কুমারে।
কোন্ কোন্ জনে তুমি পাও দেখিবারে॥ ২৮

ধর্ম্ম বলে ভাস পক্ষী বৃক্ষের উপর।
ভূমিতলে আছে দেখি যত সহোদর॥
এত শুনি দ্রোণ তারে অনেক নিন্দিয়া।
ছাড় ছাড় বলি ধনু লইলা কাড়িয়া॥ ৩২
দুর্য্যোধন শত ভাই বীর বৃকোদর।
একে একে সবারে দিলেন ধনুঃশর॥
যেইরূপে কহিলেন ধর্ম্মের নন্দন।
সেই মত কহিল সকল ভ্রাতৃগণ॥ ৩৬
সবাকারে বহু নিন্দা করি দ্রোণবীর।
ধনু লৈয়া ঠেলা মারি করেন বাহির॥
ধনুঃশর দিলা গুরু অর্জ্জুনের হাতে।
ভাস দেখাইয়া দিলা বৃক্ষের অগ্রেতে॥ ৪০
নির্গত হইবে যবে মোর মুখে বাণী।
নিঃশব্দে শূন্যেতে পাড় পক্ষী-শির হানি॥
গুরুবাক্যে পার্থ বীর টানে ধনুগুর্ণ।
পক্ষী প্রতি দৃষ্টি করি রহিলা অর্জ্জুন॥ ৪৪
কতক্ষণ থাকি দ্রোণ বলিলা অর্জ্জুনে।
কোন্ কোন্ জনে তুমি দেখহ নয়নে॥
পার্থ বলে আমি কিন্তু অন্য নাহি দেখি।
বৃক্ষের উপরে পাই দেখিবারে পাখী॥ ৪৮
হৃষ্ট হৈয়া দ্রোণ পুনঃ বলেন বচন।
কিরূপ ভাসের অঙ্গ কর নিরীক্ষণ॥

অর্জ্জুন বলেন আর ভাস নাহি দেখি।
কেবল দেখি যে মুণ্ড সহ দুই আঁখি॥ ৫২
দ্রোণ বলে মার অস্ত্র কাট পক্ষী-শির।
না স্ফুরিতে বাক্যমাত্র কাটে পার্থবীর॥
দ্রোণাচার্য্য দেখি হৈল হরষিত মন।
আলিঙ্গিয়া পুনঃ পুনঃ করিলা চুম্বন॥ ৫৬
প্রশংসা করেন দ্রোণ অর্জ্জুনে অপার।
দেখি চমৎকার হৈল সকল কুমার॥

—কাশীরাম দাস

১১
অর্জ্জুনের লক্ষ্যভেদ

ধনু লৈয়া পাঞ্চালে বলেন ধনঞ্জয়।
কি বিন্ধিব কোথা লক্ষ্য বলহ নিশ্চয়॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলে এই দেখহ জলেতে।
চক্রছিদ্রপথে মৎস্য পাইবে দেখিতে॥ ৪
কনকের মৎস্য তার মাণিক নয়ন।
সেই মৎস্য-চক্ষু ছেদিবেক যেই জন॥
সে হইবে বল্লভ আমার ভগিনীর।
এত শুনি জলে দেখে পার্থ মহাবীর॥ ৮
উর্দ্ধবাহু করিয়া আকর্ণ টানি গুণ।
অধোমুখ করি বাণ ছাড়েন অর্জ্জুন॥

সুদর্শন জগন্নাথ করিল অন্তর।
মৎস্য-চক্ষু ছেদিলেক অর্জ্জুনের শর ॥ ১২
মহাশব্দে মৎস্য ভেদি হৈল অস্ত্র পার।
অর্জ্জুনের সম্মুখে অস্ত্র আইল পুনর্ব্বার ॥
আকাশে অমরগণ পুষ্পবৃষ্টি কৈল।
জয় জয় শব্দ দ্বিজ-সভামধ্যে হৈল ॥ ১৬
বিন্ধিল বিন্ধিল বলি হৈল মহাধ্বনি।
শুনিয়া বিস্ময় হৈল যত নৃপমণি ॥
হাতেতে দধির পাত্র লৈয়া পুষ্পমালা।
দ্বিজেরে বরিতে যায় দ্রুপদের বালা ॥ ২০
দেখি হতচিত্ত হৈল যত নৃপমণি।
ডাকিয়া বলিল রহ রহ যাজ্ঞসেনী ॥
ভিক্ষুক দরিদ্র এ সহজে দ্বিজ-জাতি।
লক্ষ্য বিন্ধিবারে কোথা ইহার শকতি ॥ ২৪
মিথ্যা গোল কি কারণে কর দ্বিজগণ।
গোল করি কন্যা কোথা পাইবে ব্রাহ্মণ ॥
ব্রাহ্মণ বলিয়া চিত্তে উপরোধ করি।
ইহার উচিত এইক্ষণে দিতে পারি ॥ ২৮
পঞ্চ ক্রোশ ঊর্দ্ধে লক্ষ্য শূন্যেতে আছয়।
বিন্ধিছে কি না বিন্ধিছে কে জানে নিশ্চয় ॥
বিন্ধিল বিন্ধিল বলি লোকে জানাইল।
কহ দেখি কোথা মৎস্য কেমনে বিন্ধিল ॥ ৩২

তবে ধৃষ্টদ্যুম্নসহ বহু দ্বিজগণ।
নির্ণয় করিতে জলে করে নিরীক্ষণ॥
শিষ্টে বলে বিন্ধিয়াছে দুষ্টে বলে নয়।
ছায়া দেখি কি প্রকারে হইবে প্রত্যয়॥ ৩৬
শূন্য হৈতে মৎস্য যদি কাটিয়া পাড়িবে।
সাক্ষাতে দেখিলে তবে প্রত্যয় জন্মিবে॥
কাটি পাড় মৎস্য যদি আছয়ে শকতি।
এইরূপ কহিল যতেক দুষ্টমতি॥ ৪০
শুনিয়া বিস্ময় হৈল পাঞ্চাল-নন্দন।
হাসিয়া অর্জ্জুন বীর বলেন বচন॥
অকারণে মিথ্যা দ্বন্দ্ব কর তুমি সবে।
মিথ্যা কহি শুভ ফল কভু নাহি লভে॥ ৪৪
কতক্ষণ জলের তিলক রহে ভালে।
কতক্ষণ রহে শিলা শূন্যেতে মারিলে॥
সর্ব্বকাল অন্ধকার নিশি নাহি রয়।
মিথ্যা মিথ্যা সত্য সত্য লোকে খ্যাত হয়॥ ৪৮
কতক্ষণ রহিবেক করিলে ভণ্ডন।
লক্ষ্য কাটি পাড়িব দেখুক সর্ব্বজন।
এত বলি অর্জ্জুন লইল ধনুঃশর।
আকর্ণ পূরিয়া বিন্ধে ইন্দ্রের কোঙর॥ ৫২
সুরাসুর নরগণ দেখয়ে কৌতুকে।
কাটিয়া পাড়িল লক্ষ্য সবার সম্মুখে॥

অদ্ভুত দেখিয়া তবে যত রাজগণ।
বিস্ময় হইয়া সবে ভাবে মনে মন॥ ৫৭
জয় জয় শব্দ করে ব্রাহ্মণমণ্ডল।
আকাশে কুসুমবৃষ্টি করে আখণ্ডল॥
হাতে দধিপাত্র মাল্য দ্রৌপদীসুন্দরী।
পার্থের নিকটে গেলা কৃতাঞ্জলি করি॥ ৬০

—কাশীরাম দাস

১২

শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগ

নিজ দেহ ত্যজিতে বিচারি।
প্রভাস তীর্থের তীরে, উঠিলেন শাখীপরে,
বসিলেন শাখায় মুরারি॥

বসিয়া বৃক্ষ উপর, চিন্তিলেন চক্রধর,
নিজ দেহ ত্যাগের কারণ। ৫
এক পদ তরুপর, আরোহিয়া গদাধর,
নম্র করি দ্বিতীয় চরণ॥

আপনা চিন্তিয়া মনে, বসি প্রভু শাখাসনে,
মৌনেতে আছেন গদাধর।
নম্রকায় মন্দগতি, ব্যাধ এক এল তথি, ১০
মৃগয়ার ছলে একেশ্বর॥

জরাব্যাধ ধরে নাম, ধনুর্ব্বেদে অনুপাম,
হাতে ধরি দিব্য শরাসন।
মৃগ মারিবার ছলে, ব্যাধ আসি সেই স্থলে,
দেখিলেন কৃষ্ণের চরণ॥ ১৫

ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ পদ, রবিবিম্ব কোকনদ,
শত পদ্ম যেন সুশোভন।
রাতুল চরণ দেখি, ব্যাধসুত হৈল সুখী,
মৃগকর্ণ হেন লয় মন॥

মুষলের শেষ পাই, যেই বাণ নিরমাই, ২০
দৈবে সেই বাণ নিল হাতে।
টানিয়া ধনুক খান, সন্ধানিয়া মারে বাণ,
চরণ ভেদিল জগন্নাথে॥

বাণ মারি ব্যাধসুত, বৃক্ষতলে এল দ্রুত,
অপূর্ব্ব দেখিয়া হৈল ভীত। ২৫
কিরীট কুণ্ডল হার, নানা রত্ন অলঙ্কার,
হৃদয়ে কৌস্তুভ সুশোভিত॥

পাঞ্চজন্য সুদর্শন, পাদপদ্ম সুশোভন,
চতুর্ভুজ, গলে বনমালা।
শ্রীবৎসলাঞ্ছন দেহে, মণিবিভূষণ তাহে, ৩০
নবমেঘে যেমন চপলা॥

অম্লান তুলসীমাল, আকর্ণ লোচন ভাল,
অলকা তিলকা ভালে সাজে।
পরিধান পীতবাস, মুখচন্দ্র সুপ্রকাশ,
কত শোভা শত দ্বিজরাজে ॥ ৩৫

ভয়ার্ত্ত হইয়া ব্যাধ, মাগে নিজ অপরাধ,
প্রণমিয়া প্রভুর চরণে।
কৃপাময় অবতরি, অনাদি-পুরুষ হরি,
তুমি সার এ তিন ভুবনে ॥

আমি পাপী দুরাশয়, অজ্ঞানের মূর্ত্তিময়, ৪০
অপরাধ করিনু গোঁসাই।
শুন প্রভু চক্রপাণি, যে কর্ম্ম করিনু আমি,
আমার নিষ্কৃতি কভু নাই ॥

শুনিয়া ব্যাধের বাণী, আশ্বাসেন চক্রপাণি,
শুন ব্যাধ না করিহ ভয়। ৪৫
মম দেহত্যাগ কালে, নয়নেতে নিরখিলে,
স্বর্গ পাবে কহিনু নিশ্চয় ॥

রামচন্দ্র অবতারে, পিতৃসত্য পালিবারে,
প্রবেশিনু অরণ্য ভিতরে।
সীতা নামে মম নারী, রাবণ লইল হরি, ৫০
অন্বেষিতে দুই সহোদরে ॥

সাক্ষাৎ হইল বনে, আর চারি কপিসনে,
সখ্য হৈল সহিত আমার।
বধ করি বালিরাজা, সুগ্রীবে করিনু রাজা,
ছিলা তুমি বালির কুমার ॥ ৫৫

মারিয়া লঙ্কার পতি, উদ্ধারিনু সীতা সতী,
দিতে বর চাহিনু তোমারে।
পিতৃবৈরী মারিবারে, বর মাগি নিলা মোরে,
আমিহ ছিলাম অঙ্গীকারে ॥

সেই প্রয়োজন ফলে, জন্ম হৈল ব্যাধকুলে, ৬০
মুক্ত হয়ে যাহ স্বর্গপুরে।
হেনকালে আচম্বিত, পুষ্পবৃষ্টি অপ্রমিত,
রথ এল ব্যাধের গোচরে ॥

চাহিয়া গোবিন্দপদ, রথ আরোহিয়া ব্যাধ,
স্বর্গপুরে করিল গমন। ৬৫
শ্রীমধুসূদন হরি, হৃদয়ে ভাবনা করি,
নিজ দেহ ত্যজেন তখন ॥

—কাশীরাম দাস

১৩

এক কর্ত্তা

প্রথমে প্রণাম করি এক করতার।
যেই প্রভু জীব-দানে স্থাপিল সংসার॥
সৃজিলেক আগুন পবন জল ক্ষিতি।
নানা রঙ্গ সৃজিলেক কোরে নানা ভাতি॥ ৪
সৃজিলেক দিবাকর শশি দিবা রাতি।
সৃজিলেক নক্ষত্র নির্ম্মল পাঁতি পাঁতি॥
আপনা প্রচার হেতু সৃজিল জীবন।
নিজ-ভয় দর্শাইতে সৃজিল মরণ॥ ৮
কাকে কৈল ভিক্ষুক কাকে কৈল ধনী।
কাকে কৈল নির্গুণ কাকে কৈল গুণী॥
পুষ্পে জন্মাইল মধু গোপত আকার।
সৃজিয়া মক্ষিকা তায় করিল প্রচার॥ ১২
সকলের উপরে তাঁহার দৃষ্টি আছে।
কিবা মিত্র কিবা শত্রু কাকে নাহি বাছে॥
হেন দাতা আছে কেবা শুন জগ-জন।
সবাকে খাওয়ায় পুনি না খায় আপন॥ ১৬
জীবন-আহার-দানে করিছে আশ্বাস।
সকলের আশা পূরে আপনে নৈরাশ॥
যুগে যুগে করে দান না টুটে ভাণ্ডার।
জগ-জনে যেই দেয় সেই দান তাঁর॥ ২০

আদি অন্ত সংসারেতে সেই এক রাজা।
ত্রিলোকের জীব জন্তু করে তাঁর পূজা॥
পর্ব্বত করয়ে রেণু দেখে সর্ব্ব লোকে।
হস্তীরে করয় পিপীলিকা সমযোগে॥ ২৪
যেই ইচ্ছা সেই করে কেহ নাহি জানে।
মন বুদ্ধি অন্ধ ধন্ধ তাহার কারণে॥
সেই সে সকল গড়ে সকল ভাঙ্গয়।
ভাঙিয়া গঠয় পুনঃ যদি মনে লয়॥ ২৮
আপনি সৃজক সেই না হয় সৃজন।
যেন ছিল তেন আছে থাকিবে তেমন॥
স্থান-বিবর্জ্জিত মাত্র আছে সর্ব্ব ধাম।
রূপ রেখা বহির্ভূত নিরমল নাম॥ ৩২
অনেক অপার অতি প্রভুর করণ।
কহিতে অপূর্ব্ব কথা না যায় বর্ণন॥
পৃথিবীর যত রেণু স্বর্গে যত তারা।
জীব-জন্তু-শ্বাস আর বরিখের ধারা॥ ৩৬
যুগে যুগে বসি যদি স্তুতি এ লেখয়।
সহস্র ভাগের এক ভাগ নাহি হয়॥
সংসারের গুণী যত গুণ প্রকাশিল।
এই সমুদ্রের এক বিন্দু না টলিল॥ ৪০
কৃপাময় স্বামী বলি আছে যে উপায়।
তে কারণে কবিকুল নিতি গুণ গায়॥

—সৈয়দ আলাওল

১৪

শিবের দক্ষালয়ে যাত্রা *

মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে।
ভভম্ভম্ ভভম্ভম শিঙ্গা ঘোর বাজে ॥
লটাপট্ জটাজূট সংঘট্ট গঙ্গা।
ছলচ্ছল টলট্টল কলক্কল তরঙ্গা ॥ ৪
ফণাফণ্ ফণাফণ্ ফণীফণ্ণ গাজে।
দিনেশ-প্রতাপে নিশানাথ সাজে ॥
ধক্ধ্বক্ ধক্ধ্বক্ জ্বলে বহ্নি ভালে।
ববম্বম্ ববম্বম্ মহাশব্দ গালে ॥ ৮
চলে ভৈরব ভৈরবী নন্দী ভৃঙ্গী।
মহাকাল বেতাল তাল ত্রিশৃঙ্গী ॥
চলে ডাকিনী যোগিনী ঘোর বেশে।
চলে শাঁখিনী প্রেতিনী মুক্তকেশে ॥ ১২
গিয়া দক্ষ-যজ্ঞে সবে যজ্ঞ নাশে।
কথা না সরে দক্ষরাজে তরাসে ॥
অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে।
অরে রে অরে দক্ষ দে রে সতীরে ॥ ১৬
ভুজঙ্গপ্রয়াতে কহে ভারতী দে।
সতী দে সতী দে সতী দে সতী দে ॥ ১৮

—কবিগুণাকর ভারতচন্দ্র রায়

১৫

হরগৌরীর কোন্দল

(১)

শিবার হইল ক্রোধ শিবের বচনে।
ধক্ ধক্ জ্বলে অগ্নি ললাট-লোচনে॥
শুনিলি বিজয়া জয়া বুড়াটির বোল।
আমি যদি কই তবে হবে গণ্ডগোল॥ ৪
হায় হায় কি কহিব বিধাতা পাষণ্ডী।
চণ্ডের কপালে প'ড়ে নাম হৈল চণ্ডী॥
গুণের না দেখি সীমা রূপ ততোধিক।
বয়সে না দেখি গাছ পাথর বল্মীক॥ ৮
সম্পদের সীমা নাই বুড়া গরু পুঁজি।
রসনা কেবল কথা-সিন্দুকের কুঁজি॥
কড়া পড়িয়াছে হাতে অন্ন-বস্ত্র দিয়া।
কেন সব কটু কথা কিসের লাগিয়া॥ ১২
আমার কপাল মন্দ তাই নাই ধন।
উঁহার কপালে সব হয়েছে নন্দন॥
কেমনে এমন কন লাজ নাহি হয়।
কহিবারে পারি কিন্তু উপযুক্ত নয়॥ ১৬
অলক্ষণা সুলক্ষণা যে হই সে হই।
মোর আসিবার পূর্ব্বকালী ধন কই॥

গিয়াছিলে বুড়াটি যখন বর হয়ে।
দিয়াছিলে মোর তরে কত ধন লয়ে॥ ২০
বুড়া গরু লড়া দাঁত ভাঙ্গা গাছ-গাড়ু।
ঝুলি কাঁথা বাঘছাল সাপ সিদ্ধি-লাড়ু॥
তখন যে ধন ছিল এখন সে ধন।
তবে মোরে অলক্ষণা কন কি কারণ॥ ২৪
উঁহার ভাগ্যের বলে হইয়াছে বেটা।
কারে কব এ কৌতুক বুঝিবেক কেটা॥
বড় পুত্র গজমুখ চারি হাতে খান।
সবে গুণ সিদ্ধি খেতে বাপের সমান॥ ২৮
ভিক্ষা মাগি খুদ কণা যা পান ঠাকুর।
তাহার ইন্দুরে করে কাটুর কুটুর॥
ছোট পুত্র কার্ত্তিকেয় ছয় মুখে খায়।
উপায়ের সীমা নাই ময়ূর লড়ায়॥ ৩২
উপযুক্ত দুটি পুত্র আপনি যেমন।
সবে ঘরে আমি মাত্র এই অলক্ষণ॥
করেতে হইল কড়া সিদ্ধি বেটে বেটে।
তৈল বিনা চুলে জটা অঙ্গ গেল ফেটে॥ ৩৬
শাঁখা শাড়ী সিন্দূর চন্দন পান গুয়া।
নাহি দেখি আয়তি কেবল আচাভুয়া॥
ভারত কহিছে মাগো কত বল আর।
শিবের যে তিরস্কার সেই পুরস্কার॥ ৪০

(২)

ভবানীর কটুভাষে লজ্জা হৈল কৃত্তিবাসে
ক্ষুধানলে কলেবর দহে।
বেলা হৈল অতিরিক্ত পিত্তে হৈল গলা তিক্ত
বৃদ্ধ লোকে ক্ষুধা নাহি সহে॥ ৪৪

হেঁট মুখে পঞ্চানন নন্দীরে ডাকিয়া কন
বৃষ আন যাইব ভিক্ষায়।
আন গিয়া হাড়মাল ডমরু বাঘের ছাল
বিভূতি লেপিয়া দেহ গায়॥ ৪৮

আন রে ত্রিশূল ঝুলি প্রমথ সকলগুলি
যতগুলি ধুতূরার ফল।
থলি ভরি সিদ্ধি-গুঁড়া লহ রে ঘোটনা কুড়া
জটায় আছয়ে গঙ্গাজল॥ ৫২

ঘর উজাড়িয়া যাব ভিক্ষায় যে পাই খাব
অদ্যাবধি ছাড়িনু কৈলাস।
নারী যার স্বতন্তরা সে জন জীয়ন্তে মরা
তাহার উচিত বনবাস॥ ৫৬

বৃদ্ধকাল আপনার নাহি জানি রোজগার
চাষবাস বাণিজ্য ব্যাপার।
সকলে নির্গুণ কয় ভুলায়ে সর্ব্বস্ব লয়
নাম মাত্র রহিয়াছে সার॥ ৬০

যত আনি তত নাই না ঘুচিল খাই খাই
কিবা সুখ এ ঘরে থাকিয়া।
এত বলি দিগম্বর আরোহিয়া বৃষোপর
চলিলেন ভিক্ষার লাগিয়া ॥ ৬৪

শিবের দেখিয়া গতি শিবা কন ক্রোধমতি
কি করিব একা ঘরে রয়ে।
বৃথা কেন দুঃখ পাই বাপের মন্দিরে যাই
গণপতি কার্ত্তিকেয় লয়ে ॥ ৬৮

যে ঘরে গৃহস্থ হেন সে ঘরে গৃহিণী কেন
নাহি ঘরে সদা খাই খাই।
কি করে গৃহিণীপণে খনখন ঝনঝনে
আসে লক্ষ্মী বেড় বান্ধে নাই ॥ ৭২

বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস তাহার অর্দ্ধেক চাষ
রাজসেবা কত খচমচ।
গৃহস্থ আছয়ে যত সকলের এই মত
ভিক্ষায় নৈবচ নৈবচ ॥ ৭৬

হইয়া বিরস-মন লয়ে গুহ গজানন
হিমালয়ে চলিলা অভয়া।
ভারত বিনয়ে কয় এমত উচিত নয়
নিষেধ করিয়া কহে জয়া ॥ ৮০

কবিগুণাকর ভারতচন্দ্র রায়

১৬

ঈশ্বরী পাটনী

অন্নপূর্ণা উত্তরিলা গাঙ্গিনীর তীরে।
পার কর বলিয়া ডাকিলা পাটনীরে ॥
সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটনী।
ত্বরায় আনিল নৌকা বামা-স্বর শুনি ॥ ৪
ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাটনী।
একা দেখি কুলবধূ কে বট আপনি ॥
পরিচয় না দিলে করিতে নারি পার।
ভয় করি কি জানি কে দেবে ফের-ফার ॥ ৮
ঈশ্বরীরে পরিচয় করেন ঈশ্বরী।
বুঝহ ঈশ্বরী আমি পরিচয় করি ॥
বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি।
জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী ॥ ১২
গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশজাত।
পরম কুলীন স্বামী বন্দ্যবংশখ্যাত ॥
পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম।
অনেকের পতি তেঁই পতি, মোর বাম ॥ ১৬
অতি-বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাহি তার কপালে আগুন ॥

কু-কথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ ॥ ২০
গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি।
জীবন-স্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি ॥
ভূত নাচাইয়া পতি ফিরে ঘরে ঘরে।
না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে ॥ ২৪
অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিলা ভাই।
যে মোরে আপনা ভাবে তার ঘরে যাই ॥
পাটনী বলিছে আমি বুঝিনু সকল।
যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কোন্দল ॥ ২৮
শীঘ্র আসি নায়ে চড় দিবা কিবা বল।
দেবী কন দিব, আগে পারে লয়ে চল ॥
যাঁর নামে পার করে ভব-পারাবার।
ভাল ভাগ্য পাটনী তাঁহারে করে পার ॥ ৩২
বসিলা নায়ের বাড়ে নামাইয়া পদ।
কিবা শোভা নদীতে ফুটিল কোকনদ ॥
পাটনী বলিছে মাগো বৈস ভাল হয়ে।
পায়ে ধরি কি জানি কুমীরে যাবে লয়ে ॥ ৩৬
ভবানী বলেন তোর নায়ে ভরা জল।
আল্‌তা ধুইবে পদ কোথা থুই বল ॥
পাটনী বলিছে মা গো শুন নিবেদন।
সেঁউতি-উপরে রাখ ও রাঙ্গা চরণ ॥ ৪০

পাটনীর বাক্যে মাতা হাসিয়া অন্তরে।
রাখিলা দুখানি পদ সেঁউতি-উপরে॥
বিধি বিষ্ণু ইন্দ্র চন্দ্র যে পদ ধেয়ায়।
হৃদে ধরি ভূতনাথ ভূতলে লুটায়॥ ৪৪
সে পদ রাখিলা দেবী সেঁউতি-উপরে।
তাঁর ইচ্ছা বিনা ইথে কি তপ সঞ্চরে॥
সেঁউতিতে পদ দেবী রাখিতে রাখিতে।
সেঁউতি হইল সোনা দেখিতে দেখিতে॥ ৪৮
সোনার সেঁউতি দেখি পাটনীর ভয়।
এ ত' মেয়ে মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয়॥
তটে উত্তরিলা তরী তারা উত্তরিলা।
পূর্ব্বমুখে সুখে গজ-গমনে চলিলা॥ ৫২
সেঁউতি লইয়া কক্ষে চলিলা পাটনী।
পিছে দেখি তারে দেবী ফিরিলা আপনি॥
সভয়ে পাটনী কহে চক্ষে বহে জল।
দিয়াছ যে পরিচয় সে বুঝিনু ছল॥ ৫৬
হের দেখ সেঁউতিতে থুয়েছিলা পদ।
কাঠের সেঁউতি মোর হৈল অষ্টাপদ॥
ইহাতে বুঝিনু তুমি দেবতা নিশ্চয়।
দয়ায় দিয়াছ দেখা দেহ পরিচয়॥ ৬০
তপ জপ নাহি জানি ধ্যান জ্ঞান আর।
তবে যে দিয়াছ দেখা দয়া সে তোমার॥

যে দয়া করিলা মোর এ ভাগ্য উদয়।
সেই দয়া হৈতে মোরে দেহ পরিচয়॥ ৬৪
ছাড়াইতে নারি দেবী কহিলা হাসিয়া।
কহিয়াছি সত্য কথা বুঝহ ভাবিয়া॥
আমি দেবী অন্নপূর্ণা প্রকাশ কাশীতে।
চৈত্রমাসে মোর পূজা শুক্ল-অষ্টমীতে॥ ৬৮
ভবানন্দ মজুন্দার নিবাসে রহিব।
বর মাগ মনোনীত যাহা চাবে দিব॥
প্রণমিয়া পাটনী কহিছে যোড়হাতে।
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে॥ ৭২
তথাস্তু বলিয়া দেবী দিলা বরদান।
দুধে-ভাতে থাকিবেক তোমার সন্তান॥
বর পেয়ে পাটনী ফিরিয়া ঘাটে যায়।
পুনর্ব্বার ফিরি চাহে দেখিতে না পায়॥ ৭৬

—কবিগুণাকর ভারতচন্দ্র রায়

১৭

চাঁদ ধরা

গিরিবর, আর আমি পারি না হে
প্রবোধ দিতে উমারে !
অতি অবশেষ নিশি, গগনে উদয় শশী,
বলে উমা—"ধ'রে দে উহারে !" ৪
কাঁদিয়ে ফুলাল' আঁখি, মলিন ও-মুখ দেখি'
মায়ে ইহা সহিতে কি পারে ?
"আয়, আয়, মা, মা" বলি' ধরিয়ে কর-অঙ্গুলি
যেতে চায় না জানি কোথা রে। ৮
আমি কহিলাম তায়— "চাঁদ কি রে ধরা যায় ?"—
ভূষণ ফেলিয়া মোরে মারে।

উঠে বসে গিরিবর, করি' বহু সমাদর
গৌরীরে লইয়া কোলে করে, ১২
সানন্দে কহিছে হাসি'— "ধর, মা, এই লও শশী।"—
মুকুর লইয়া দিল করে।
মুকুরে হেরিয়া মুখ উপজিল মহাসুখ
বিনিন্দিত কোটি শশধরে ! ১৬

—কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন

১৮

নিরাকারা

এমন দিন কি হবে তারা !
যবে 'তারা, তারা, তারা' ব'লে
তারা বেয়ে পড়্‌বে ধারা !
হৃদিপদ্ম উঠবে ফুটে, মনের আঁধার যাবে ছুটে,
তখন ধরাতলে পড়্‌ব লুটে, তারা ব'লে হব সারা !
ত্যজিব সব ভেদাভেদ, ছুটে যাবে মনের খেদ,
ওরে শত শত সত্য বেদ—তারা আমার নিরাকারা !
শ্রীরাম প্রসাদ রটে—মা বিরাজে সর্ব্ব-ঘটে,
ওরে আঁখি অন্ধ ! দেখ মাকে, তিমিরে তিমিরহরা !

—কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন

১৯

শ্রেষ্ঠ পূজা *

মন, তোর এত ভাবনা কেনে ?
একবার, কালী ব'লে ব'স্ রে ধ্যানে ।
জাঁকজমকে কর্‌লে পূজা
অহঙ্কার হয় মনে মনে ;
তুমি লুকিয়ে তারে কর্‌বে পূজা
জান্‌বে না রে জগজ্জনে ।

ধাতু পাষাণ মাটীর মূর্ত্তি
কাজ কি রে তোর সে গঠনে ? ৮
তুমি মনোময় প্রতিমা করি'
বসাও হৃদি-পদ্মাসনে।
আলোচাল আর পাকা কলা
কাজ কি রে তোর আয়োজনে ; ১২
তুমি ভক্তি-সুধা খাইয়ে তাঁরে
তৃপ্তি কর আপন মনে।
ঝাড় লণ্ঠন বাতির আলো
কাজ কি রে তোর সে রোস্‌নাইয়ে, ১৬
তুমি মনোময় মাণিক্য জ্বেলে
দেও না—জ্বলুক নিশিদিনে !
মেষ ছাগল মহিষাদি
কাজ কি রে তোর বলিদানে ? ২০
তুমি—জয় কালী ! জয় কালী ! ব'লে—
বলি দাও ষড়্‌-রিপুগণে।
প্রসাদ বলে, ঢাকে ঢোলে
কাজ কি রে তোর—সে বাজনে ? ২৪
তুমি, 'জয় কালী' ব'লে, দেও করতালি
মন রাখ সেই শ্রীচরণে।

—কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন

২০

স্বদেশী ভাষা *

নানান্ দেশের নানান্ ভাষা ;
বিনা স্বদেশীয় ভাষা
পূরে কি আশা ?
কত নদী সরোবর কিবা ফল চাতকীর ?
ধারা-জল বিনে কভু
ঘুচে কি তৃষা ?

—রামনিধি গুপ্ত

২১

সর্ব্ববাদি-সম্মত স্তোত্র

সকলের পিতা তুমি, তুমি সর্ব্বময়,
সর্ব্ব দেশে পূজ্য তুমি সকল সময় ;
জ্ঞানী বা অজ্ঞানী কিংবা সাধু সদাশয়—
কেহ বা যিহোবা, যোব, কেহ প্রভু কয়। ৪

অনাদি-কারণ তুমি, জ্ঞানের অতীত,
রেখেছ আমার বোধ করে আচ্ছাদিত ;
এইমাত্র জানি আমি তুমি শিবময়,
স্বভাবতঃ অন্ধ আমি নাহি জ্ঞানোদয়। ৮

যদিও করেছ হেন অবস্থা আমার,
তবু পারি ভাল মন্দ করিতে বিচার ;
নিতান্তই জীব যদি ভাগ্যের অধীন,
তথাচ মানব-মন সদাই স্বাধীন। ১২

ধর্ম্মেতে যে করে সাধু কর্ম্মের বিধান,
যে কর্ম্ম করিতে সদা করে সাবধান,
সেই সাধু কর্ম্ম প্রতি মন যেন যায়,
কুকর্ম্মেতে ঘৃণা হোক নরকের প্রায়। ১৬

অপার কৃপার গুণে যা দিয়াছ প্রভু,
অসন্তোষ তাহাতে না হয় যেন কভু,—
তখন মানব রাখে ঈশ্বরের মান,
যখন সুখেতে ভুঞ্জে বিভুদত্ত দান। ২০

ক্ষুদ্র এই ধরাধামে তোমার কুশল,
হেন যেন নাহি ভাবি রয়েছে কেবল ;
মানুষের শুধু তুমি, না করি বিচার—
যেহেতু সহস্র বিশ্ব চৌদিকে তোমার ! ২৪

যেন এই বোধহীন অজ্ঞানের হাত,
পাপী বোধে কারে নাহি করে দণ্ডাঘাত ;
অভিশাপে যেন নাহি মন্দ করি তার,
ভবে যারে ভাবিয়াছি বিপক্ষ তোমার। ২৮

ন্যায়-পথে থাকি যদি, কর দয়া দান—
চিরকাল করি যা'তে সুখে অবস্থান ;
ভ্রান্ত হয়ে ভ্রমে যদি ভ্রমি ভ্রম-পথ,
সুপথ দেখায়ে কর পূর্ণ মনোরথ। ৩২

তাহে যেন নাহি করি মিছা অহঙ্কার,
করিয়াছ তুমি যত কল্যাণ আমার।
আর অসন্তোষ যেন তাহাতে না হয়,
আমারে যা দাও নাই, ওহে দয়াময়! ৩৬

পর-দুঃখে দুঃখী হ'তে কর উপদেশ,
ঢাকিতে পরের দোষ করহ্ আদেশ ;
সদা যেন সেই দয়া পরেরে দেখাই,
দয়াময়! যেই দয়া চাই তব ঠাঁই। ৪০

নীচ যদি আমি, ফলে নহি নীচ জীব,
যেহেতু কৃপায় তব রয়েছি সজীব ;
আমারে চালাও, নাথ! আপন অধীনে,
বাঁচি কিংবা মরি আমি অদ্যকার দিনে। ৪৪

অদ্য যেন অন্ন আর শান্তি লাভ হয়,
আর আর বস্তু যাহা রবি-তলে রয়,—
দিতে হয় দাও, নয় কর নিবারণ,
ইচ্ছাময়! ইচ্ছা তব হোক সম্পাদন। ৪৮

সমুদয় স্থল হয় তোমার ভবন,
ধরা, সিন্ধু, শূন্য—তব পবিত্র আসন ;
করুক একত্রে এরা তব গুণ গান,
রাখুক সকলে মিলি তোমার সম্মান। ৫২

—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

২২

তপ্‌সে মাছ

কষিত-কনককান্তি কমনীয় কায়।
গালভরা গোঁপ-দাড়ি তপস্বীর প্রায়॥
মানুষের দৃশ্য নও বাস কর নীরে।
মোহন মণির প্রভা ননীর শরীরে॥ ৪
পাখী নও কিন্তু ধর মনোহর পাখা।
সুমধুর মিষ্ট রস সব-অঙ্গে মাখা॥
একবার রসনায় যে পেয়েছে তার।
আর কিছু মুখে নাহি ভাল লাগে তার॥ ৮
দৃশ্যমাত্র সর্ব্বগাত্র প্রফুল্লিত হয়।
সৌরভে আমোদ করে ত্রিভুবনময়॥
প্রাণে নাহি দেরি সয় কাঁটা আঁশ বাছা।
ইচ্ছা করে একেবারে গালে দিই কাঁচা॥ ১২
অপরূপ হেরে রূপ পুত্রশোক হরে।
মুখে দেওয়া দূরে থাক গন্ধে পেট ভরে॥

কুড়ি দরে কিনে লই দেখে তাজা তাজা।
টপাটপ্ খেয়ে ফেলি ছাঁকা-তেলে ভাজা ॥ ১৬
না করে উদরে যেই তোমায় গ্রহণ।
বৃথায় জীবন তার বৃথায় জীবন ॥
সব গুণে বদ্ধ তব আছে সর্ব্বজনে।
লোণাজলে বাস কর এই দুঃখ মনে ॥ ২০
অমৃত থাকিতে কেন রুচি হয় বিষে।
লুণ-পোড়া পোড়া জল ভাল লাগে কিসে ॥
উলুবেড়ে আলো ক'রে করিছ বিহার।
নগরের উত্তরেতে গতি নাই আর ॥ ২৪
ক্ষীরোদমথনকালে অপূর্ব্ব ঘটন।
দেবাসুরে ঘোর দ্বন্দ্ব সুধার কারণ ॥
সাগর-সলিলে হয় বিবাদ বিস্তার।
গড়াগড়ি ছড়াছড়ি সুধার সুধার ॥ ২৮
সে সময়ে তুমি মীন অতি কুতূহলে।
খেয়েছিলে সেই জল তপস্যার ফলে ॥
অমৃত-ভক্ষণে তাই এরূপ প্রকার।
সুমধুর আস্বাদন হয়েছে তোমার ॥ ৩২
এমত অমৃত-ফল ফলিয়াছে জলে।
সাহেবেরা সুখে তাই ম্যাঙ্গোফিশ্ বলে ॥
বাঙ্গালীর মত তারা রন্ধন না জানে।
আধ-সিদ্ধ করি শুধু টেবিলেতে আনে ॥ ৩৬

মসলার গন্ধ গায় কিছুমাত্র নাই।
অঙ্গে করে আলিঙ্গন কমলিনী রাই॥
কিন্তু এক মম মনে এই বড় শোক।
না জানে তোমার গুণ উত্তরের লোক॥ ৪০
তোমার চরণে করি এই নিবেদন।
কর সবে সমভাবে দয়া বিতরণ॥
গোঁৎ করে সোঁৎ ঠেলে ভাটি-গাঙ ছেড়ে।
উজানের পথে চল দাড়ি গোঁপ নেড়ে॥ ৪৪
শাঁক ঘণ্টা বাজাইবে যত মেয়ে ছেলে।
ভিটে বেচে পূজা দিব মিঠে জলে এলে॥

—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

২৩

ধন-সুখ

লক্ষ্মীছাড়া হও যদি খেয়ে আর দিয়ে।
কিছুমাত্র সুখ নাই হেন লক্ষ্মী নিয়ে॥
যতক্ষণ থাকে ধন তোমার আগারে।
নিজে খাও, খেতে দাও, সাধ্য অনুসারে॥
ইথে যদি কমলার মন নাহি সরে।
পেঁচা নিয়ে যান মাতা কৃপণের ঘরে॥

—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

২৪

মিত্রতায় সুজন ও কুজন

কুজনের মৈত্রীভাব যেন জলে রেখা।
সম্ভাষ না করে পরে যদি হয় দেখা॥

আপাতত মুখে মধু তালফলসম।
পরিণামে পরিপাকে হয় সে বিষম॥ ৪

সজ্জনের প্রীতি প্রতিদিন প্রতিবেলা।
সিতপক্ষ-শশীসম বাড়ে প্রতিকলা॥

পাষাণের রেখাসম সম চিরদিন।
নিধন হইলে তবু নাহি ভাবে ভিন॥ ৮

ইহার দৃষ্টান্ত নীর ক্ষীর পূর্ব্বাপর।
পয় এই নাম মাত্র প্রীতি পরস্পর॥

জ্বাল দিয়া দুগ্ধেরে বিনাশ যবে করে।
ক্ষীরের প্রীতিতে নীর আগেভাগে মরে॥ ১২

জলের দেখিয়া মৃত্যু দগ্ধ তার স্নেহে।
উথলিয়া উঠে ঝাঁপ দিতে সেই দাহে॥

এই মত সজ্জন মরণ-অবসরে।
যথাসাধ্য অপরের উপকার করে॥ ১৬

তার সাক্ষী চন্দ্র-সূর্য্য থাকি রাহুমুখে।
তথাপি প্রদান করে পুণ্য অন্য-লোকে॥

মশকের রীতিসম হয় অসজ্জন।
কেবল পরের ছিদ্র করে অন্বেষণ॥ ২০
অগ্রেতে কাণের কাছে করে মৃদুধ্বনি।
পরে পৃষ্ঠ-মাংস খায় নিঃশঙ্ক এমনি॥
খলের চরিত্র কিছু এমনি বিচিত্র।
কে জানিতে পারে তার কেবা শত্রু-মিত্র॥ ২৪
দেখা হৈলে দূর হৈতে করয়ে সম্ভাষ।
কাছে আসি বসি কহে মৃদু-মৃদু ভাষ॥
কিন্তু কুটিলতা তার প্রতি পায় পায়।
অনন্ত খলের অন্ত কেবা অন্ত পায়॥ ২৮
পরদোষ দর্শনেতে সহস্র নয়ন।
শুনিতে পরের নিন্দা অযুত শ্রবণ॥
রচিতে পরের নিন্দা সহস্র রসনা।
শতমুখ হয় হেন করয়ে বাসনা॥ ৩২
দেখিতে স্বদোষ আর সজ্জনের গুণ।
অন্ধ হয় সে দুর্ম্মতি এমতি বিগুণ॥
মনে মনোগত ভাব থাকে একমত।
বাক্যেতে সে ভাব ব্যক্ত করে অন্যমত॥ ৩৬
কার্য্যমত সে মত বিমত হয় তার।
খলের চরিত্র চিত্ত এমত প্রকার॥

—মদনমোহন তর্কালঙ্কার

২৫

ব্যর্থ প্রয়াস

কোন মূঢ় চিত্রকরে পদ্ম-দেহ চিত্র করে ?
করিলে কি বাড়ে তার শোভা ?
কিংবা সেই কোকনদে মাখাইলে মৃগমদে,
অতি-সুখ লভে মধুলোভা ? ৪

কষিত কাঞ্চন-কায় কিবা কার্য্য সোহাগায় ?
কিবা কার্য্য রসানের ছটা ?
হেন মূর্খ আছে কে হে, দিবে ইন্দ্রধনু দেহে,
অভিনব রূপরঙ্গ-ঘটা ? ৮

জ্বালিয়ে ঘৃতের বাতি, প্রখর ভাস্কর-ভাতি
বৃদ্ধি করা দুরাশা কেবল।
কি কাজ সিন্দূরে মাজি গজমুক্তাফলরাজি ?
মাজিলে কি হয় সমুজ্জ্বল ? ১২

—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

দেশহিতে মরে যেই

স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায়।
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায় ॥ ৪
কোটি-কল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে,
নরকের প্রায়।
দিনেকের স্বাধীনতা, স্বর্গ-সুখ তায় হে,
স্বর্গ-সুখ তায় ॥ ৮
অই শুন ! অই শুন ! ভেরীর আওয়াজ হে,
ভেরীর আওয়াজ।
সাজ সাজ সাজ বলে, সাজ সাজ সাজ হে,
সাজ সাজ সাজ ॥ ১২
সার্থক জীবন আর বাহু-বল তার হে,
বাহু-বল তার।
আত্মনাশে যেই করে দেশের উদ্ধার হে,
দেশের উদ্ধার ॥ ১৬
অতএব রণভূমে চল ত্বরা যাই হে,
চল ত্বরা যাই।
দেশহিতে মরে যেই তুল্য তার নাই হে,
তুল্য তার নাই ॥ ২০

—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

নীতিকুসুমাঞ্জলি

(সংস্কৃত হইতে)

(১)

বায়সের যদি হয়, চক্ষুটি সুবর্ণময়,
মাণিকে মণ্ডিত পদদ্বয়।
প্রতি পক্ষে গজমোতি, প্রকাশে বিমল জ্যোতি,
তবু কাক রাজহংস নয়॥ ৪

(২)

অতিশয় ক্ষুদ্র নরে, যে হিত সাধন করে,
মহতেও তাহা নাহি পারে।
পান করি কূপ-পয়, প্রায় তৃষা শান্ত হয়,
বারিধি কি পিপাসা নিবারে? ৮

(৩)

যথা নারিকেল ফল গর্ভে সঞ্চরয়ে জল,
সেরূপ লক্ষ্মীর আগমন।
গজভুক্ত কথ্‌বেল, সেরূপ লক্ষ্মীর খেল,
পলায়ন করেন যখন॥ ১২

(৪)

অনল শীতল হয় সলিল-সম্পাতে।
ছত্রে ভানু-কর, করী অঙ্কুশ-আঘাতে ॥
গো-গর্দ্দভ বশীভূত লাঠির প্রহারে।
ভেষজেতে ব্যাধি, মন্ত্রে গরল নিবারে ॥ ১৬
সর্ব্বত্র ঔষধ শাস্ত্রে সুবিহিত আছে।
সকল ঔষধ ব্যর্থ মূর্খদের কাছে ॥

(৫)

শ্রুতির শোভন শ্রুতি, কুণ্ডলে না হয়।
করের ভূষণ দান, কঙ্কণেতে নয় ॥ ২০
পর প্রতি দয়া আর হিত-আচরণে।
শরীরের শোভা বৃদ্ধি, নহে ত চন্দনে ॥

(৬)

ঋণ-শেষ অগ্নি-শেষ আর রোগ-শেষ।
বিচক্ষণগণ কভু না রাখেন লেশ ॥ ২৪
থাকিলেই পুনর্ব্বার সংবর্দ্ধিত হয়।
অতএব শেষ রাখা সমুচিত নয় ॥

—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিবর্ত্তন-যুগ

(উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ)

২৮
সীতার পঞ্চবটী-বাস

যথা গোমুখীর মুখ হইতে সুস্বনে
ঝরে পূত বারি-ধারা, কহিলা জানকী,
মধুর-ভাষিণী সতী, আদরে সম্ভাষি
সরমারে,—"হিতৈষিণী সীতার পরমা ৪
তুমি, সখি! পূর্ব্বকথা শুনিবারে যদি
ইচ্ছা তব, কহি আমি, শুন মন দিয়া।—
"ছিনু মোরা, সুলোচনে, গোদাবরী-তীরে,
কপোত-কপোতী যথা উচ্চ-বৃক্ষ-চূড়ে ৮
বাঁধি নীড়, থাকে সুখে; ছিনু ঘোর বনে,
নাম পঞ্চবটী, মর্ত্ত্যে সুর-বন সম।
সদা করিতেন সেবা লক্ষ্মণ সুমতি।
দণ্ডক ভাণ্ডার যার, ভাবি দেখ মনে, ১২
কিসের অভাব তার? যোগাতেন আনি
নিত্য ফল-মূল বীর সৌমিত্রি; মৃগয়া
করিতেন কভু প্রভু; কিন্তু জীব-নাশে
সতত বিরত, সখি, রাঘবেন্দ্র বলী,— ১৬
দয়ার সাগর নাথ, বিদিত জগতে!
"ভুলিনু পূর্ব্বের সুখ! রাজার নন্দিনী,
রঘুকুলবধূ আমি; কিন্তু এ কাননে,

পাইনু, সরমা সই, পরম পীরিতি ! ২০
কুটীরের চারিদিকে কত যে ফুটিত
ফুলকুল নিত্য নিত্য, কহিব কেমনে ?
পঞ্চবটী-বন-চর মধু নিরবধি !
জাগা'ত প্রভাতে মোরে কুহরি সুস্বরে ২৪
পিক-রাজ ! কোন্ রাণী, কহ, শশিমুখি,
হেন চিত্ত-বিনোদন বৈতালিক গীতে
খোলে আঁখি ? শিখী সহ, শিখিনী সুখিনী
নাচিত দুয়ারে মোর ! নর্ত্তক নর্ত্তকী, ২৮
এ দোঁহার সম, রামা, আছে কি জগতে ?
অতিথি আসিত নিত্য করভ, করভী,
মৃগ-শিশু, বিহঙ্গম, স্বর্ণ-অঙ্গ কেহ,
কেহ শুভ্র, কেহ কাল, কেহ বা চিত্রিত, ৩২
যথা বাসবের ধনুঃ ঘন-বর-শিরে ;
অহিংসক জীব যত। সেবিতাম সবে,
মহাদরে ; পালিতাম পরম যতনে,
মরুভূমে স্রোতস্বতী তৃষাতুরে যথা, ৩৬
আপনি সুজলবতী বারিদ-প্রসাদে।
সরসী আরসী মোর ! তুলি কুবলয়ে,
(অতুল রতন-সম) পরিতাম কেশে ;
সাজিতাম ফুল-সাজে ; হাসিতেন প্রভু, ৪০
বনদেবী বলি মোরে সম্ভাষি কৌতুকে !

"পঞ্চবটী-বনে মোরা গোদাবরী-তটে
ছিনু সুখে। হায়, সখি, কেমনে বর্ণিব
সে কান্তার-কান্তি আমি? সতত স্বপনে ৪৪
শুনিতাম বন-বীণা বনদেবী-করে;
সরসীর তীরে বসি, দেখিতাম কভু
সৌর-কর-রাশি-বেশে সুরবালা-কেলি
পদ্মবনে; কভু সাধ্বী ঋষি-বংশ-বধূ
সুহাসিনী আসিতেন দাসীর কুটীরে, ৪৮
সুধাংশুর অংশু যেন অন্ধকার ধামে!
অজিন (রঞ্জিত, আহা, কত শত রঙে!)
পাতি বসিতাম কভু দীর্ঘ তরুমূলে,
সখী-ভাবে সম্ভাষিয়া ছায়ায়, কভু বা ৫২
কুরঙ্গিনী-সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে,
গাইতাম গীত শুনি কোকিলের ধ্বনি!
নব লতিকার, সতি! দিতাম বিবাহ
তরু সহ; চুম্বিতাম, মঞ্জরিত যবে ৫৬
দম্পতী, মঞ্জরীবৃন্দে, আনন্দে সম্ভাষি
নাতিনী বলিয়া সবে! গুঞ্জরিলে অলি,
নাতিনী-জামাই বলি বরিতাম তারে!
কভু বা প্রভুর সহ ভ্রমিতাম সুখে ৬০
নদী-তটে; দেখিতাম তরল সলিলে
নূতন গগন যেন, নব তারাবলী,

নব নিশাকান্ত-কান্তি! কভু বা উঠিয়া
পর্ব্বত-উপরে, সখি, বসিতাম আমি ৬৪
নাথের চরণতলে, ব্রততী যেমতি
বিশাল রসাল-মূলে; কত যে আদরে
তুষিতেন প্রভু মোরে, বরষি বচন-
সুধা, হায়, কব কারে? কব বা কেমনে? ৬৮
সাঙ্গ কি দাসীর পক্ষে, হে নিষ্ঠুর বিধি,
সে সঙ্গীত?"—নীরবিলা আয়ত-লোচনা
বিষাদে। কহিলা তবে সরমা সুন্দরী,—
"শুনিলে তোমার কথা, রাঘব-রমণি, ৭২
ঘৃণা জন্মে রাজ-ভোগে! ইচ্ছা করে, ত্যজি
রাজ্য-সুখ, যাই চলি হেন বনবাসে!
কিন্তু ভেবে দেখি যদি, ভয় হয় মনে।
রবিকর যবে, দেবি, পশে বনস্থলে ৭৬
তমোময়, নিজগুণে আলো করে বনে
সে কিরণ; নিশি যবে যায় কোন দেশে,
মলিন-বদন সবে তার সমাগমে!
যথা পদার্পণ তুমি কর, মধুমতি, ৮০
কেন না হইবে সুখী সর্ব্বজন তথা,
জগৎ-আনন্দ তুমি, ভুবনমোহিনী!"

—মাইকেল মধুসূদন দত্ত

২৯

রামের বিলাপ

(শক্তিশেলাহত লক্ষ্মণের উদ্দেশে)

চেতন পাইয়া নাথ কহিলা কাতরে ;—
"রাজ্য ত্যজি, বনবাসে নিবাসিনু যবে,
লক্ষ্মণ, কুটীর দ্বারে, আইলে যামিনী,
ধনুঃ করে, হে সুধন্বি, জাগিতে সতত ৪
রক্ষিতে আমায় তুমি ; আজি রক্ষঃপুরে—
আজি এই রক্ষঃপুরে অরি-মাঝে আমি,
বিপদ-সলিলে মগ্ন ; তবুও ভুলিয়া
আমায়, হে মহাবাহু, লভিছ ভূতলে ৮
বিরাম ? রাখিবে আজি কে, কহ, আমারে ?
উঠ, বলি ! কবে তুমি বিরত পালিতে
ভ্রাতৃ-আজ্ঞা ? তবে যদি মম ভাগ্যদোষে—
চির ভাগ্যহীন আমি—ত্যজিলা আমারে, ১২
প্রাণাধিক, কহ, শুনি, কোন্ অপরাধে
অপরাধী তব কাছে অভাগী জানকী ?
দেবর লক্ষ্মণে স্মরি রক্ষঃকারাগারে
কাঁদিছে সে দিবানিশি ! কেমনে ভুলিলে— ১৬
হে ভাই, কেমনে তুমি ভুলিলে হে আজি
মাতৃসম নিত্য যারে সেবিতে আদরে !

হে রাঘবকুলচূড়া, তব কুলবধূ,
রাখে বাঁধি পৌলস্তেয় ? না শাস্তি সংগ্রামে ২০
হেন দুষ্টমতি চোরে, উচিত কি তব
এ শয়ন—বীরবীর্য্যে সর্ব্বভুক্‌সম
দুর্ব্বার সংগ্রামে তুমি ? উঠ, ভীমবাহু,
রঘুকুলজয়কেতু ! অসহায় আমি ২৪
তোমা বিনা, যথা রথী শূন্যচক্র রথে !
তোমার শয়নে হনূ বলহীন, বলি,
গুণহীন ধনুঃ যথা ; বিলাপে বিষাদে
অঙ্গদ ; বিষণ্ণ মিতা সুগ্রীব সুমতি, ২৮
অধীর কর্ব্বুরোত্তম বিভীষণ রথী,
ব্যাকুল এ বলিদল ! উঠ, ত্বরা করি,
জুড়াও নয়ন, ভাই, নয়ন উন্মীলি !

"কিন্তু ক্লান্ত যদি তুমি এ দুরন্ত রণে, ৩২
ধনুর্দ্ধর, চল ফিরি যাই বনবাসে।
নাহি কাজ, প্রিয়তম, সীতায় উদ্ধারি,—
অভাগিনী ! নাহি কাজ বিনাশি রাক্ষসে।
তনয়-বৎসলা যথা সুমিত্রা জননী ৩৬
কাঁদেন সরযূতীরে, কেমনে দেখাব
এ মুখ, লক্ষ্মণ, আমি, তুমি না ফিরিলে
সঙ্গে মোর ? কি কহিব, সুধিবেন যবে

মাতা,—'কোথা, রামভদ্র, নয়নের মণি ৪০
আমার, অনুজ তোর ?' কি ব'লে বুঝাব
ঊর্ম্মিলা বধূরে আমি, পুরবাসী জনে ?
উঠ, বৎস ! আজি কেন বিমুখ হে তুমি
সে ভ্রাতার অনুরোধে, যার প্রেমবশে, ৪৪
রাজ্যভোগ ত্যজি তুমি পশিলা কাননে।
সমদুঃখে সদা তুমি কাঁদিতে হেরিলে
অশ্রুময় এ নয়ন ; মুছিতে যতনে
অশ্রুধারা ; তিতি এবে নয়নের জলে ৪৮
আমি, তবু নাহি চাহ তুমি মোর পানে,
প্রাণাধিক ? হে লক্ষ্মণ, এ আচার কভু
(সুভ্রাতৃবৎসল তুমি বিদিত জগতে !)
সাজে কি তোমারে, ভাই, চিরানন্দ তুমি ৫২
আমার ! আজন্ম আমি ধর্ম্মে লক্ষ্য করি,
পূজিনু দেবতাকুলে,—দিলা কি দেবতা
এই ফল ? হে রজনি, দয়াময়ী তুমি ;
শিশির-আসারে নিত্য সরস' কুসুমে, ৫৬
নিদাঘার্ত্ত ; প্রাণদান দেহ এ প্রসূনে !
সুধানিধি তুমি, দেব সুধাংশু ; বিতর'
জীবনদায়িনী সুধা, বাঁচাও লক্ষ্মণে—
বাঁচাও, করুণাময়, ভিখারী রাঘবে।" ৬০

—মাইকেল মধুসূদন দত্ত

৩০
আত্মবিলাপ *

(১)

আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু, হায়!
তাই ভাবি মনে।
জীবন-প্রবাহ বহি কালসিন্ধু পানে যায়,
ফিরাব কেমনে? ৪
দিন দিন আয়ুহীন, হীনবল দিন দিন,—
তবু এ আশার নেশা ছুটিল না?—এ কি দায়!

(২)

রে প্রমত্ত মন মম! কবে পোহাইবে রাতি?
জাগিবি রে কবে? ৮
জীবন-উদ্যানে তোর যৌবন-কুসুম-ভাতি
কত দিন রবে?
নীরবিন্দু দূর্ব্বাদলে নিত্য কি রে ঝলঝলে?
কে না জানে অম্বুবিম্ব অম্বুমুখে সদ্যঃপাতি? ১২

(৩)

নিশার স্বপন-সুখে সুখী যে, কি সুখ তার?
জাগে সে কাঁদিতে!
ক্ষণপ্রভা প্রভা-দানে বাড়ায় মাত্র আঁধার,
পথিকে ধাঁদিতে! ১৬
মরীচিকা মরুদেশে, নাশে প্রাণ তৃষাক্লেশে;—
এ তিনের ছল-সম ছল রে এ কু-আশার।

(৪)

প্রেমের নিগড় গড়ি পরিলি চরণে সাধে,
কি ফল লভিলি ? ২০
জ্বলন্ত-পাবক-শিখা-লোভে তুই কাল-ফাঁদে
উড়িয়া পড়িলি !
পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়, ধাইলি, অবোধ, হায় !
না দেখিলি, না শুনিলি, এবে রে পরাণ কাঁদে ! ২৪

(৫)

বাকি কি রাখিলি তুই বৃথা অর্থ-অন্বেষণে,
সে সাধ সাধিতে ?
ক্ষত মাত্র হাত তোর মৃণাল-কণ্টকগণে,
কমল তুলিতে ! ২৮
নারিলি হরিতে মণি, দংশিল কেবল ফণী !
এ বিষম বিষ-জ্বালা ভুলিবি, মন, কেমনে ?

(৬)

যশোলাভ-লোভে আয়ু কত যে ব্যয়িলি, হায় !
কব তা কাহারে ? ৩২
সুগন্ধ কুসুম-গন্ধে অন্ধকীট যথা ধায়,
কাটিতে তাহারে,—
মাৎসর্য্য-বিষদশন কামড়ে রে অনুক্ষণ !
এই কি লভিলি লাভ, অনাহারে, অনিদ্রায় ? ৩৬

(৭)

মুকুতা-ফলের লোভে ডুবে রে অতল জলে
যতনে ধীবর,
শত মুক্তাধিক আয়ু কালসিন্ধু-জল-তলে
ফেলিস্, পামর ! ৪০
ফিরি দিবে হারাধন কে তোরে, অবোধ মন,
হায় রে, ভুলিবি কত আশার কুহক-ছলে !

—মাইকেল মধুসূদন দত্ত

৩১

কাশীরাম দাস

চন্দ্রচূড়-জটাজালে আছিলা যেমতি
জাহ্নবী, ভারত-রস ঋষি দ্বৈপায়ন,
ঢালি সংস্কৃত-হ্রদে রাখিলা তেমতি ;—
তৃষ্ণায় আকুল বঙ্গ করিত রোদন। ৪
কঠোরে গঙ্গায় পূজি ভগীরথ ব্রতী,
(সুধন্য তাপস ভবে, নর-কুল-ধন !)
সগর-বংশের যথা সাধিলা মুকতি ;
পবিত্রিলা আনি মায়ে, এ তিন ভুবন ; ৮
সেইরূপে ভাষা-পথ খননি স্ববলে,
ভারত-রসের স্রোতঃ আনিয়াছ তুমি

জুড়াতে গৌড়ের তৃষা সে বিমল জলে !
নারিবে শোধিতে ধার কভু গৌড়ভূমি। ১২
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
হে কাশি! কবীশদলে তুমি পুণ্যবান্‌॥

—মাইকেল মধুসূদন দত্ত

৩২

সমুদ্র-দর্শন

এ কি, এ প্রকাণ্ড কাণ্ড সম্মুখে আমার !
অসীম আকাশ-প্রায় নীল জল-রাশি ;
ভয়ানক তোল্‌পাড় করে অনিবার,
মুহূর্ত্তেকে যেন সব ফেলিবেক গ্রাসি ! ৪

আগু-পাছু কোটি কোটি কি কল্লোলমালা !
প্রকাণ্ড পর্ব্বত সব যেন ছুটে আসে ;
উঃ! কি প্রচণ্ড রব ! কানে লাগে তালা,
প্রলয়ের মেঘ যেন গরজে আকাশে ! ৮

তুলার বস্তার মত ফেনা রাশি রাশি,
তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে ধায় ;
রাশি রাশি সাদা মেঘ নীলাম্বরে ভাসি,
ঝড়ের সঙ্গেতে যেন ছুটিয়া বেড়ায় ! ১২

আপনার মনে ওহে উদার সাগর,
গড়ায়ে গড়ায়ে তুমি চলেছ সদাই ;
প্রাণীদের কলরবে পোরা চরাচর,
কিন্তু তব কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই। ১৬

ধরাধামে তব সম কেহ নাহি পারে
বিস্ময়-আনন্দ-রসে আলোড়িতে মন ;
অখিল ব্রহ্মাণ্ড আছে তোমার ভাণ্ডারে,
নিসর্গের তুমি এক বিচিত্র দর্পণ। ২০

কোথাও ধবলাকার কেবল বরফ,
কোথাও তিমিরময় দেদার আঁধার,
কোথাও জ্বলন-জ্বালা জ্বলে দপ্ দপ্,
সকল স্থানেই তুমি অনন্ত অপার ! ২৪

পুরাকালে তব তটে কত কত দেশ,
ঐশ্বর্য্য-কিরণে বিশ্ব কোরেছিল আলো ;
যেমন এখন পরি মনোহর বেশ,
কত দেশ বেলাভূমে সেজে আছে ভাল ! ২৮

দেবের ত্বুর্ল্লভ লঙ্কা, ভুস্বর্গ দ্বারকা,
কালের তুর্জ্জয় যুদ্ধে হয়েছে নিধন ;
আলো কোরে ছিল রাত্রে যে সব তারকা,
ক্রমে ক্রমে নিবে তারা গিয়েছে কখন ! ৩২

কিন্তু সেই সর্ববজয়ী মহাবল কাল,
যার নামে চরাচর কাঁপে থরহরি—
আপনার জয়চিহ্ন, বুঝে চিরকাল
দাগিতে পারেনি তব ললাট-উপরি। ৩৬

সত্যযুগে আদি-মনু যেমন তোমায়
হেরেছেন, হেরিতেছি আমিও তেমন ;
কাল তব সঙ্গে শুধু গড়ায়ে বেড়ায়,
জাহির করিতে নারে বিক্রম আপন। ৪০

এই যে দাঁড়ায়ে পুন সেই কিনারায় !
বহিছে তরঙ্গ রঙ্গে সেই জলরাশি !
উদার সাগর দাও বিদায় আমায় !
আজিকার মত আমি আসি তবে আসি। ৪৪

—বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী

৩৩
আদি-কবি

(১)

হিমাদ্রি-শিখর 'পরে
আচম্বিতে আলা করে
অপরূপ জ্যোতিঃ ওই পুণ্য তপোবন !
বিকচ নয়নে চেয়ে ৪
হাসিছে দুধের মেয়ে,—
তামসী-অরুণ ঊষা কুমারী-রতন।

(২)

অম্বরে অরুণোদয়,
তলে দুলে দুলে বয় ৮
তমসা তটিনী-রাণী কুলু কুলু স্বনে ;
নিরখি লোচনলোভা
পুলিন-বিপিন-শোভা
ভ্রমেন বাল্মীকি মুনি ভাব-ভোলা মনে। ১২

(৩)

শাখি-শাখে রস-সুখে
ক্রৌঞ্চ ক্রৌঞ্চী মুখে মুখে
কতই সোহাগ করে বসি দু'জনায় ;
হানিল শবরে বাণ, ১৬
নাশিল ক্রৌঞ্চের প্রাণ,
রুধিরে আপ্লুত পাখা ধরণী লুটায় !

(৪)

ক্রৌঞ্চী প্রিয় সহচরে
ঘেরে ঘেরে শোক করে, ২০
অরণ্য পূরিল তার কাতর ক্রন্দনে !
চক্ষে করি' দরশন
জড়িমা-জড়িত মন,
করুণ-হৃদয় মুনি বিহ্বলের প্রায় ; ২৪
সহসা ললাটভাগে
জ্যোতির্ম্ময়ী কন্যা জাগে,
জাগিল বিজলী যেন নীল নবঘনে !

(৫)

কিরণে কিরণময়, ২৮
বিচিত্র আলোকোদয়,
ম্রিয়মাণ রবিচ্ছবি, ভুবন উজলে ।
চন্দ্র নয়, সূর্য্য নয়,
সমুজ্জ্বল শান্তিময়, ৩২
ঋষির ললাটে আজি না জানি কি জ্বলে !

(৬)

কিরণ-মণ্ডলে বসি'
জ্যোতির্ম্ময়ী সুরূপসী—
যোগীর ধ্যানের ধন ললাটিকা-মেয়ে ; ৩৬
নামিলেন ধীর ধীর,
দাঁড়ালেন হ'য়ে স্থির,
মুগ্ধনেত্রে বাল্মীকির মুখপানে চেয়ে !

(৭)

হাসি-হাসি শশিমুখী, ৪০
কতই কতই সুখী !
মনের মধুর জ্যোতি উছলে নয়নে ।
কভু হেসে ঢল-ঢল,
কভু রোষে জ্বল-জ্বল, ৪৪
বিলোচন ছল-ছল করে প্রতিক্ষণে !

(৮)

করুণ ক্রন্দন-রোল
উত উত উতরোল,
চমকি বিহ্বলা বালা চাহিলেন ফিরে ; ৪৮
হেরিলেন রক্তমাখা
মৃত ক্রৌঞ্চ ভগ্ন-পাখা,
কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে ক্রৌঞ্চী ওড়ে ঘিরে ঘিরে !

(৯)

একবার সে ক্রৌঞ্চীরে, ৫২
আর বার বাল্মীকিরে
নেহারেন ফিরে ফিরে, যেন উন্মাদিনী !
কাতরা করুণাভরে,
গা'ন সকরুণ স্বরে, ৫৬
ধীরে ধীরে বাজে করে বীণা বিষাদিনী !

(১০)

সে শোক-সঙ্গীত-কথা
শুনে কাঁদে তরু-লতা,
তমসা আকুল হয়ে কাঁদে উভরায় ! ৬০
নিরখি' নন্দিনী-ছবি
গদগদ আদি-কবি—
অন্তরে করুণা-সিন্ধু উথলিয়া ধায় !

—বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী

৩৪

মাতৃমঙ্গল

(১)

স্মরিয়া মায়ের মায়া,
পুলকে না পূরে কায়া,
আঁখি না রসাক্ত হয়, হেন যেই জন !—
তার কাছে না থাকিব, ৪
তারে নাহি বিশ্বাসিব,
কবে মম কণ্ঠনালী করিবে ছেদন !
মুখে মাতৃ-নিন্দা ফুটে,
ঈশ-ভ্রূ কুঞ্চিয়া উঠে, ৮
করে বজ্র টলে,—করে অনল বমন ;

জননীরে কটু ভাষে,
উল্লাসি নরক হাসে—
কট্-কট্-রবে করে কপাট-পাটন ; ১২
শাণ দেয় শস্ত্রচয় যমচরগণ ।

(২)

আর কি সে তনু আছে,
ছিল যা মায়ের কাছে !—
কোথা ফুল্ল সে কপোল, সে ফুল্ল নয়ন ! ১৬
কোথা নৃত্য হর্ষভরে,
কোথা করতালি করে,
কোথা সে চপল কায়, সপুলক মন !
কোথা খল-খল হাস, ২০
কোথা কল-কল ভাষ,
সে সুষুপ্তি সুখময় নাহি পাই আর !
ভাবি-ভয়-বিবর্জ্জিত
কোথা সে অদীন চিত, ২৪
নিকুঞ্জে না দেখি আর ঘর দেবতার !—
দেখিতে না পাই হাসি মুখে প্রতিমার !

(৩)

হে মাতঃ ! হৃদয়ে ধর,
সন্তানের ত্রাস হর, ২৮
তোমা বিনা ভব-দুঃখে কোথা পরিত্রাণ !

তুমি পরশিলে করে,
জ্বর জ্বালা তাপ হরে,
তব অঙ্ক, শঙ্কা-শূন্য বৈকুণ্ঠসমান ! ৩২
তুমি মুখে দিবে যাহা,
মৃত্যুহরী সুধা তাহা,
আশীর্ব্বাদ তোমার,—অভেদ্য অঙ্গত্রাণ !
তব কাছে স্বর্গবাস, ৩৬
তব তুষ্টি শ্রেষ্ঠ আশ,
ধরায় না ধর্ম্ম তব সেবার সমান ।
জীবে কৃপা করি তুমি ঈশ মূর্ত্তিমান্ !

(৪)

ধরা হীরা হয়, হায় !— ৪০
সিংহাসন রচি তায়,
বসাইতে পারি যদি জননী তোমায় ;
ফুল হয় তারাদল,
চন্দন সাগর-জল, ৪৪
শত-কল্প বসি যদি পূজি তব পায় ;
সুধাকর-সুধাগারে
পারি যদি আনিবারে,
সুনিত্য যদি সে সুধা করাই ভোজন ; ৪৮
পারিজাত-দল দিয়া
নিত্য শয্যা বিরচিয়া,

করাইতে পারি যদি তোমায় শয়ন ;—
তবু না শুধিতে পারি তোমার পালন ! ৫২

(৫)

তুমি, মা ! না ধর দোষ,
তুমি নাহি কর রোষ,
দুঃশীল মানব, প্রাণে বেঁচে থাকে তায় !
শত অপরাধ করে, ৫৬
তবু না মানব মরে,
শুধু তব হৃদয়ের প্রেম-মহিমায় !
বাণী বর্ণিবারে চায়,
শেষ যদি সদা গায়, ৬০
তবু তব মহিমা না হয় সমাধান !
হে সুর, অসুর, নর,
যেবা তনু বুদ্ধি ধর,
এস মিলি করি সবে মাতৃস্তুতি গান— ৬৪
বিশ্ব যাঁর কর-গড়া কন্দুক সমান !

—সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

৩৫

যৌবন-কাল

হেন দুখ-মাঝে হেন সুখ কোথা আর,
যথা নর-জন্ম-মাঝে যৌবন-সঞ্চার !—
মরু-মাঝে চারু দ্বীপ শ্যামল যেমন,
ঝটিকা-নিশায় যেন
ঘন-অবকাশে হেন
ক্ষণিক শশাঙ্ক-ভাতি সংসার-রঞ্জন,
নিঃস্বের জীবনে যেন রাজত্ব-স্বপন ! ৪

কলেবরে কিবা-রূপ বলের উদয় !
কিবা অজানিত রস-পূরিত হৃদয় !
কিবা অকাতরে চায় অটন রটন,
হৃদে ধ্যান কবিতার
উঠে কিবা অনিবার,
কিবা পূর্ণবলে দেহ আত্মা করে রণ,
অথবা কি উভয়ের প্রেম-আলিঙ্গন ! ৮ ১২

মধ্যদিনে যথা আলো সকল ধরার,
কোথাও থাকে না আর ছায়ার আঁধার, ১৬

যৌবন-আগমে তথা সব সুখময় ;
হৃদয়ে আশার বাস,
প্রমোদ উল্লাস হাস ;
যদি দৈবে বিষাদ আগত কভু হয়, ২০
সে চিত-কমলে জল কতক্ষণ রয় !

বাল্যের সারল্য রয়, চাপল্য পলায়,
রয় রূপ কলেবরে, অবলতা যায় ;
হৃদে শুভ অনুরাগ, আগ্রহ প্রবল, ২৪
প্রেম-মৈত্রী-পূর্ণ মনে
হাসি কাঁদি পর-সনে,
নাই প্রৌঢ়-স্বার্থাসক্তি কঠিনতা ছল ;—
কোথা হেন সুশোভন গিরিসন্ধিস্থল ! ২৮

তব তরে যৌবন সৃজিত এ সংসার !
তব প্রতি এ সংসার রাখিবার ভার ;
বুদ্ধিবল-হীন শিশু, বৃদ্ধ, দোঁহাকার—
তোমায় পালন চায়, ৩২
তোমায় জীবন পায়,
তুমি ধনী আর সবে দরিদ্র ধরার,
যুবজানি যুবার অবনী অধিকার !

—সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

৩৬

নক্ষত্র

অন্তরীক্ষবাসী ওহে নক্ষত্র মণ্ডল,
কে তোমরা নিশাভাগে দেও দরশন ?
মনোমুগ্ধকর স্নিগ্ধ বরণ উজ্জ্বল—
কুবের-ভাণ্ডারে যথা অসংখ্য রতন। ৪

শ্যামাঙ্গিনী রজনীর কবরী-ভূষণ
কনকের ফুলরাশি—তাই কি তোমরা ?
অথবা দীপের মালা সুরবালাগণ
জ্বেলেছে উৎসবামোদে প্রফুল্ল-অন্তরা ? ৮

আছে কি প্রকাণ্ড হেন শিখী ব্যোমচর,
মেঘ-সখা সনে সদা ক্রীড়া-অভিলাষী,
সান্দ্র নৈশ-তমে ভাবি শ্যাম জলধর,
দেখায় উন্মুক্ত পুচ্ছে চন্দ্রকের রাশি ? ১২

শুনেছি ত্রিদিবে আছে নন্দন-কানন,
মন্দার-কুসুম-দাম-শোভিত সে স্থান ;
তোমরা কি পারিজাত লোচন-লোভন,
দেবেন্দ্র-কামিনী-কণ্ঠে যার বহুমান ? ১৬

কিংবা, যথা মানস-সরস ভূমণ্ডলে,
প্রসর সেরূপ সরঃ ঊর্দ্ধে শোভা পায় ;
কম-কুমুদের দাম তোমরা সকলে,
প্রদোষেতে প্রমোদিত, মুদিত ঊষায় ? ২০

কিংবা ধার্ম্মিকের আত্মা তোমরা সকলে ?
সুকৃতির ফলে স্বর্গে করেছ গমন,
নিশিতে উদয় হয়ে নীল নভস্তলে
ধর্ম্মের মাহাত্ম্য নরে করিছ জ্ঞাপন ? ২৪

কে তোমরা নিশাভাগে দেও দরশন ?
বুধগণ স্থানে আমি না লই সন্ধান,
পর-পদাঙ্কিত মার্গে করিতে গমন
কল্পনাকৌতুকী কবি ভাবে অপমান। ২৮

শুনি বটে হও গ্রহ, গ্রহদলপতি,
বহু যোজনের পথে কর অবস্থান,
রাশিচক্র-কেন্দ্র-স্থানে করিয়া বসতি
মানুষের ভাগ্য-ফল করহ বিধান। ৩২

ঋষি হও, ঋক্ষ হও, হও দাক্ষায়ণী,
তারারূপে রূপবতী দারা চন্দ্রমার,—
না চাই জ্যোতিষ-তত্ত্ব, কথা পুরাতনী,
প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যে এত কাজ কি আমার ? ৩৬

দৃষ্টির-সহায়-যন্ত্রে নাহি প্রয়োজন,
চর্ম্মচক্ষে করিয়াছি আমি আবিষ্কার,
জানিয়াছি কে তোমরা উজলি গগন
নিশীথে নীরবে কিবা করিছ প্রচার। ৪০

বিশাল বিমান-গ্রন্থে গ্রথিত সুন্দর
উজ্জ্বল নক্ষত্রদল-অক্ষরমালায়
দৃষ্টিমাত্র এই জ্ঞান লভিবেক নর,—
বিরাট্ এ বিশ্বসৃষ্টি, অন্ত কেবা পায়! ৪৪

যাঁর হাস্য-প্রকাশক কুসুমের দল,
সৌম্য-ভাব ব্যক্ত যাঁর পূর্ণ শশধরে,
যাঁর জ্যোতিঃপ্রতিবিম্ব মিহিরমণ্ডল,
তাঁহারি মহিমা লেখা নক্ষত্র-অক্ষরে! ৪৮

—যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়

৩৭

জীবন-সঙ্গীত *

ব'লো না কাতর স্বরে বৃথা জন্ম এ সংসারে
এ জীবন নিশার স্বপন,
দারা পুত্র পরিবার, তুমি কার, কে তোমার—
ব'লে জীব করো না ক্রন্দন। ৪

মানব-জনম সার, এমন পাবেনা আর,
বাহ্যদৃশ্যে ভুলো না রে মন ;
কর যত্ন হবে জয়, জীবাত্মা অনিত্য নয়,
অহে জীব কর আকিঞ্চন। ৮
ক'রো না সুখের আশ, প'রো না দুখের ফাঁস,
জীবনের উদ্দেশ্য তা নয় ;
সংসারে সংসারী সাজ, করো নিত্য নিজ কাজ,
ভবের উন্নতি যাতে হয়। ১২

দিন যায়, ক্ষণ যায়, সময় কাহারো নয়,
বেগে ধায় নাহি রহে স্থির,—
সহায় সম্পদ বল, সকলি ঘুচায় কাল,
আয়ু যেন শৈবালের নীর ! ১৬

সংসার-সমরাঙ্গনে, যুদ্ধ কর দৃঢ়পণে,
ভয়ে ভীত হ'য়ো না, মানব !
কর যুদ্ধ বীর্য্যবান, যায় যাবে যাক প্রাণ,
মহিমাই জগতে দুর্ল্লভ। ২০

মহাজ্ঞানী মহাজন, যে পথে ক'রে গমন
হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়,
সেই পথ লক্ষ্য ক'রে স্বীয় কীর্ত্তি-ধ্বজা ধ'রে,
আমরাও হব বরণীয়। ২৪
সময়-সাগর-তীরে, পদাঙ্ক অঙ্কিত ক'রে
আমরাও হব হে অমর ;
সেই চিহ্ন লক্ষ্য ক'রে, অন্য কোন জন পরে,
যশোদ্বারে আসিবে সত্বর। ২৮

—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

৩৮

শিশুর হাসি

কি মধু-মাখানো, বিধি, হাসিটি অমন,
দিয়াছ শিশুর মুখে !
স্বর্গেতে আছে কি ফুল
মর্ত্ত্যে যার নাহি তুল, ৪
তারি মধু দিয়ে, কি হে, করিলে সৃজন ?
সৃজিলে কি নিজ সুখে ?
কিংবা, বিধি, নরদুঃখে
মনে ক'রে—ও হাসিটি করেছ অমন ? ৮

কারে গড়েছিলে আগে,
কারে বেশী অনুরাগে
সৃজন করিলে, বিধি, সৃজিলে যখন ?—
ফুলের লাবণ্য, বাস, ১২
অথবা শিশুর হাস,—
কারে, বিধি, আগে ধ্যানে করিলে ধারণ ?

দেখায়েছিলে কি উটি সৃজিলে যখন,
অমৃত-পিপাসু দেবে— ১৬
কি বলিল তারা সবে,
দেখিল যখন অই হাসিটি মোহন ?

কিংবা চেয়েছিল তারা, তুমিই না দিলে ;
দিয়াছ এতই, হায়, ২০
চিরসুখী দেবতায়,
দুঃখী মানবের তরে ওটুকু রাখিলে ?

জাতি-বেশ-বর্ণভেদ, ধর্ম্মভেদ নাই ;
শিশুর হাসির কাছে, ২৪
সবি প'ড়ে থাকে পাছে,
যেখানে যখন দেখি তখনি জুড়াই !

নাহি পর আপনার, নাহি দুঃখ সুখ,—
দেখিলে তখনি মন ২৮
মাধুরীতে নিমগন,
কি যেন উথলি উঠে' পূর্ণ করে বুক !

হে বিধি, নিয়াছ সব, করেছ উদাসী !
এক হৃদয়ের আলো,— ৩২
উহারে ক'রো না কালো,
অতুলনা দীপ ওটি—নিও না ও হাসি !

চাহি না শীতল বায়ু, মুকুল, অমিয় ;
চন্দ্রকর বারি-কোলে ৩৬
নাচিয়া নাচিয়া দোলে,
তাও নাহি চাই, বিধি,—ও হাসিটি দিও।

—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

৩৯

পদ্মের মৃণাল

(১)

পদ্মের মৃণাল এক সুনীল-হিল্লোলে
দেখিলাম সরোবরে ঘন ঘন দোলে ;
কখন ডুবায় কায়, কভু ভাসে পুনরায়,
হেলে দুলে আশে পাশে তরঙ্গের কোলে— ৪
পদ্মের মৃণাল এক সুনীল-হিল্লোলে।
একদৃষ্টে কতক্ষণ— কৌতুকে অবশ মন,
দেখিতে শোকের বেগ ছুটিল কল্লোলে—
পদ্মের মৃণাল এক তরঙ্গের কোলে। ৮

(২)

সহসা চিন্তার বেগ উঠিল উথলি ;
পদ্ম, জল, জলাশয় ভুলিয়া সকলি,
অদৃষ্টের নিবন্ধন, ভাবিয়া ব্যাকুল মন,—
অই মৃণালের মত হায় কি সকলি ? ১২
রাজা রাজমন্ত্রিলীলা বলবীর্য্য স্রোতঃশিলা
সকলি কি ক্ষণস্থায়ী দেখিতে কেবলি ?
অই মৃণালের মত নিস্তেজ সকলি !

(৩)

কোথা সে প্রাচীন জাতি, মানবের দল, ১৬
শাসন করিত যারা অবনীমণ্ডল ?
বলবীর্য্য-পরাক্রমে ভবে অবলীলাক্রমে
ছড়াইত মহিমার কিরণ উজ্জ্বল—
কোথা সে প্রাচীন জাতি, মানবের দল ? ২০
বাঁধিয়ে পাষাণস্তূপ অবনীতে অপরূপ
দেখাইল মানবের কি কৌশল বল—
প্রাচীন মিশরবাসী—কোথা সে সকল ?
পড়িয়া রয়েছে স্তূপ— অবনীতে অপরূপ ! ২৪
কোথা তারা, এবে কারা হয়েছে প্রবল,
শাসন করিতে এই অবনীমণ্ডল ?

(৪)

জগতের অলঙ্কার আছিল যে জাতি—
জ্বালিল উন্নতি-দীপ অরুণের ভাতি, ২৮
অতুল অবনীতলে, এখনো মহিমা জ্বলে,
কে আছে সে নর-ধন্য কুলে দিতে বাতি ?
এই কি কালের গতি, এই কি নিয়তি ?
ম্যারাথন্ থার্মপলি, হয়েছে শ্মশানস্থলী, ৩২
গিরীশ আঁধারে আজ পোহাইছে রাতি,—
এই কি কালের গতি এই কি নিয়তি ?
যার পদচিহ্ন ধ'রে অন্য জাতি দম্ভ করে,

আকাশ পয়োধি-নীরে ছড়াইত ভাতি— ৩৬
জগতের অলঙ্কার কোথায় সে জাতি ?

(৫)

দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ যার কোথায় সে রোম ?
কাঁপিত যাহার তেজে মহী সিন্ধু ব্যোম ?
ধরণীর সীমা যার ছিল রাজ্য অধিকার, ৪০
সহস্র বৎসরাবধি একাদি নিয়ম—
দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ আজি কোথায় সে রোম !
সাহস ঐশ্বর্য্যে যার ত্রিভুবন চমৎকার—
সে জাতি কোথায় আজি, কোথা সে বিক্রম ? ৪৪
এমনি অব্যর্থ কি রে কালের নিয়ম !
কি চিহ্ন আছে রে তার ? রাজপথ দুর্গে যার
পৃথিবী বন্ধন ছিল কোথায় সে রোম ?—
নিয়তির কাছে নর এত কি অক্ষম ? ৪৮

(৬)

আরবের পারস্যের কি দশা এখন ?
সে তেজ নাহিক আর, নাহি সে তর্জ্জন !
সৌভাগ্য-কিরণজালে উহারাই কোনকালে,
করেছিল মহাতেজে পৃথিবী শাসন। ৫২
আরবের পারস্যের কি দশা এখন !
পশ্চিমে হিস্পানী-শেষ, পূর্ব্বে সিন্ধু হিন্দুদেশ,—

কাফের যবনবৃন্দে করিল দমন,
উল্কাসম অকস্মাৎ হইল পতন। ৫৬
'দীন্' ব'লে মহীতলে, যে কাণ্ড করিলা বলে,
সে দিনের কথা এবে হয়েছে স্বপন!
আরবের উপন্যাস অদ্ভুত যেমন।

(৭)

আজি এ ভারতে হায়, কেন হাহাধ্বনি— ৬০
কলঙ্ক লিখিতে কার কাঁদিছে লেখনী?
তরঙ্গে তরঙ্গে নত পদ্ম-মৃণালের মত
পড়িয়া পরের পায় লুটায় ধরণী।
আজি এ ভারতে কেন হাহাকার ধ্বনি? ৬৪
জগতের চক্ষু ছিল, কত রশ্মি ছড়াইল,
সে দেশে নিবিড় আজ আঁধার রজনী—
পূর্ণগ্রাসে প্রভাকর নিস্তেজ যেমনি।
বুদ্ধি বীর্য্য বাহুবলে সুধন্য জগতীতলে, ৬৮
ছিল যারা আজি তারা অসার তেমনি।
আজি এ ভারতে কেন হাহাকার-ধ্বনি!

(৮)

নিয়তির গতিরোধ হবে না কি আর?
উঠিবে না কেহ কি রে উজলি আবার— ৭২

মিসর পারস্য-ভাতি, গিরীক রোমীয় জাতি ?
ভারত থাকিবে কি রে চির-অন্ধকার ?
জাপান জিলণ্ডে নিশি পোহাবে এবার ?
যত্ন আশা পরিশ্রমে, খণ্ডিয়া নিয়তি ক্রমে ৭৬
উঠিয়া প্রবল হ'তে পারে না কি আর,
অই মৃণালের মত সহিবে প্রহার ?
না জানি কি আছে ভালে, তাই গো মা, এ কাঙ্গালে
মিশাইছে অশ্রুধারা ভস্মেতে তোমার, ৮০
ভারত কিরণময় হবে কি আবার ?

—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

৪০
সুখী ও দুঃখী *

চিরসুখী জন ভ্রমে কি কখন ব্যথিত-বেদন বুঝিতে পারে ?
কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে, কভু আশীবিষে দংশেনি যারে ?
যতদিন ভবে না হবে—না হবে তোমার অবস্থা আমার সম,
ঈষৎ হাসিবে, শুনে না শুনিবে, বুঝে না বুঝিবে যাতনা মম।

—কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

যক্ষের আলয়

কুবের-আলয় ছাড়ি' উত্তরে আমার বাড়ী,
গিয়া তুমি দেখিবে সেথায়—
সম্মুখে বাহির-দ্বার, বাহার কে দেখে তার,
ইন্দ্রধনু যেন শোভা পায় ! ৪
পার্শ্বে এক সরোবরে জল থই-থই করে,
হাসে ফুল্ল নলিনীর হাট ;
উহার একটি ধারে, অপরূপ দেখিবারে
রমণীয় মণিময় ঘাট। ৮
সরসীর স্বচ্ছ জলে, ইতস্ততঃ দলে দলে,
ভ্রমে হংস হংসী অবিরামে ;
যাইতে মানস-সরে কারো না মানস সরে,
আছে তারা এমনি আরামে। ১২
উদ্যানে একটি চারু শিশু পারিজাত-তরু
বায়ু-কোলে হেলে, পুষ্প হাসে ;
বহু যত্নে জল দিয়া বাড়ায়েছে তারে প্রিয়া,
সুতসম তেঁই ভালবাসে। ১৬
উচ্চভূমি একধারে, গিরিসম দেখিবারে,
নীলকান্তি শিখরে বিরাজে।
সুবর্ণ-কদলীতরু চারিধারে শোভে চারু,
মেঘেতে তড়িৎ যেন সাজে। ২০

মাধবী-মণ্ডপ 'পরে কুঁরুবক্ শোভা করে,
ফুল-গন্ধে ছোটে অলিকুল ;
লতায় পাতায় ঘেরা, আছয়ে সবার সেরা
দু'টি গাছ অশোক বকুল। ২৪
তাহার মাঝেতে আর ময়ূরের বসিবার
সোনার একটী আছে দাঁড়,
শিখী যথা কেকাভাষী সন্ধ্যাকালে বসে আসি',
আনন্দেতে উঁচা করি' ঘাড়। ২৮
তাহারে নাচায় প্রিয়া, করতালি দিয়া দিয়া,
রুনুরুনু বাজে তায় বালা ;
স্মরিতে সে-সব কথা মরমে জনমে ব্যথা,
জ্বলি' উঠে হৃদয়ের জ্বালা। ৩২
এ-সকল নিদর্শনে চিনিবে মুহূর্ত্ত-ক্ষণে
চেয়ে মাত্র মোর বাড়ী পানে ;
এবে উহা শূন্যপ্রায় ! কমল না শোভা পায়
কখনো দিবস-অবসানে। ৩৬

—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

পলাশির যুদ্ধ *

(১)

বৃটিশের রণবাদ্য বাজিল অমনি—
কাঁপাইয়া রণস্থল,
কাঁপাইয়া গঙ্গাজল,
কাঁপাইয়া আম্রবন উঠিল সে ধ্বনি। ৪

(২)

অর্দ্ধ-নিষ্কোষিত অসি করি যোদ্ধগণ,
বারেক গগন প্রতি,
বারেক মা বসুমতী
নিরখিল, যেন এই জন্মের মতন। ৮

(৩)

ইঙ্গিতে পলকে মাত্র সৈনিক সকল,
বন্দুক সদর্পভরে,
তুলি নিল অংসোপরে ;
সঙ্গিনে কণ্টকাকীর্ণ হ'ল রণস্থল। ১২

(৪)

ইংরাজের বজ্রনাদী কামান সকল—
গম্ভীর গর্জ্জন করি,
নাশিতে সম্মুখ অরি,
মুহূর্ত্তেকে উগরিল কালান্ত-অনল। ১৬

(৫)

ছুটিল একটি গোলা রক্তিম-বরণ,
বিষম বাজিল পায়ে,
সেই সংঘাতিক ঘায়ে
ভূতলে হইল মির-মদন পতন ! ২০

(৬)

"হুর্‌রে ! হুর্‌রে !"—করি গর্জ্জিল ইংরাজ।
নবাবের সৈন্যগণ
ভয়ে ভঙ্গ দিল রণ ;
পলাতে লাগিল সবে, নাহি সহে ব্যাজ। ২৪

(৭)

"দাঁড়া রে ! দাঁড়া রে ফিরে ! দাঁড়া এই ক্ষণ !
দাঁড়াও ক্ষত্রিয়গণ !
যদি ভঙ্গ দেও রণ,"—
গর্জ্জিলা মোহনলাল,—"নিকট শমন ! ২৮

(৮)

"আজি এই রণে যদি কর পলায়ন,
মনেতে জানিও স্থির,
কারো না থাকিবে শির,
সবান্ধবে যাবে সবে শমন-ভবন। ৩২

(৯)

"সেনাপতি ! ছি ছি, এ কি ! হা ধিক্ তোমারে !
কেমনে, বল না, হায় !
কাষ্ঠের পুতুল প্রায়,
সসজ্জিত দাঁড়াইয়া আছ একধারে ? ৩৬

(১০)

"ওই দেখ, ওই যেন চিত্রিত প্রাচীর,
ওই তব সৈন্যগণ
দাঁড়াইয়া অকারণ,
গণিতেছে লহরী কি রণ-পয়োধির ? ৪০

(১১)

"দেখিছ না সর্ব্বনাশ সম্মুখে তোমার ?
যায় বঙ্গ-সিংহাসন,
যায় স্বাধীনতা-ধন,
যেতেছে ভাসিয়া সব, কি দেখিছ আর ? ৪৪

(১২)

"বীরপ্রসবিনী যত মোগল-রমণী,
না বুঝিনু কি প্রকারে
প্রসবিল কুলাঙ্গারে !
চঞ্চলা মোগল-লক্ষ্মী বুঝিনু এখনি। ৪৮

(১৩)

"কেমনে যাবি রে ফিরে ক্ষত্রিয়-সমাজে ?
কেমনে দেখাবি মুখ ?
জীবনে কি আছে সুখ ?
স্ত্রী-পুত্র তোদের যত হাসিবেক লাজে ! ৫২

(১৪)

"সহে না বিলম্ব আর, চল ভ্রাতাগণ !
চল সবে রণস্থলে !
দেখিব কে জিনে বলে !
দেখাব ক্ষত্রিয়-বীর্য্য, দেখাব কেমন !" ৫৬

(১৫)

বাজিল তুমুল যুদ্ধ ; অস্ত্রের নির্ঘাত,
তোপের গর্জ্জন ঘন,
ধূম-অগ্নি-উদ্‌গিরণ,
জলধর মধ্যে যেন অশনিসম্পাত ! ৬০

(১৬)

নাচিছে অদৃষ্ট-দেবী, নির্দ্দয়-হৃদয় ;
এই বৃটিশের পক্ষে,
এই বিপক্ষের বক্ষে ;
এইবার ইংরাজের হ'ল পরাজয় ! ৬৪

(১৭)

অকস্মাৎ তূর্য্যধ্বনি হইল তখন,—
"ক্ষান্ত হও যোদ্ধাগণ!
কর অস্ত্র সম্বরণ!
নবাবের অনুমতি কালি হবে রণ।" ৬৮

(১৮)

উত্থিত কৃপাণ কর হইল অচল ;
সম্মুখে চরণদ্বয়
উত্থিত—তুরঙ্গচয়
দাঁড়াল, নবাবসৈন্য হইল চঞ্চল। ৭২

(১৯)

অচল শিলার সহ যুঝি বহুক্ষণ,
নদী কোনমতে তারে
যদি বা টলাতে পারে,
উপাড়িয়া শিলা হয় ভূতলে পতন। ৭৬

(২০)

তেমতি বারেক যদি টলে সৈন্যগণ,
ইংরাজ সঙ্গিন করে,
(ইন্দ্র যেন বজ্র ধরে)
ছুটিল পশ্চাতে—যেন কৃতান্ত শমন। ৮০

(২১)

কারো বুকে, কারো পৃষ্ঠে, কাহারো গলায়
লাগিল, সঙ্গিন-ঘায়—
বরিষার ফোটা প্রায়
আঘাতে আঘাতে পড়ে নিমেষে ধরায়। ৮৪

(২২)

ঝম্ ঝম্ ঝম্ করি বৃটিশ বাজনা
কাঁপাইয়া রণস্থল,
কাঁপাইয়া গঙ্গাজল,
আনন্দে করিল বঙ্গে বিজয় ঘোষণা। ৮৮

—নবীনচন্দ্র সেন (ঈষৎ পরিবর্ত্তিত)

৪৩

যমুনা-লহরী *

(১)

নির্ম্মল সলিলে বহিছ সদা
তটশালিনী সুন্দরী যমুনে ও !
কত কত সুন্দর নগরী তীরে
রাজিছে তটযুগ ভূষি' ও ! ৪
পড়ি' জল-নীলে ধবল সৌধ-ছবি
অনুকারিছে নভ-অঞ্জন ও !

(২)

যুগযুগবাহী প্রবাহ তোমারি
দেখিল কত শত ঘটনা ও ; ৮
তব জল-বুদ্বুদ সহ কত রাজা
পরকাশিল, লয় পাইল ও ।

(৩)

কলকল-ভাষে বহিয়ে, কাহিনী
কহিছ সবে কি পুরাতন ও ? ১২
স্মরণে আসি' মরম পরশে কথা—
ভূত সে ভারত-গাথা ও !

(৪)

তব জল-কল্লোল -সহ কত সেনা
গরজিল কোনদিন সমরে ও ;— ১৬
আজি শব-নীরব, রে যমুনে, সব
গত যত বৈভব কালে ও !

(৫)

শ্যাম সলিল তব লোহিত ছিল কভু
পাণ্ডব-কুরুকুল-শোণিতে ও ; ২০
কাঁপিল দেশ তুরগ-গজ-ভারে
ভারত স্বাধীন যে দিন ও।

(৬)

তব জল-তীরে পৌরব যাদব
পাতিল রাজ-সিংহাসন ও ; ২৪
শাসিল দেশ অরিকুল নাশি'
ভারত স্বাধীন যে দিন ও।

(৭)

দেখিলে কি তুমি বৌদ্ধ-পতাকা
উড়িতে দেশ-বিদেশে ও— ২৮
তিব্বত চীনে ব্রহ্ম তাতারে
ভারত স্বাধীন যে দিন ও ?

(৮)

এ পয়ঃ-পারে কত কত জাতীয়
ভাতিল কত শত রাজা ও ! ৩২
আসিল স্থাপিল শাসিল রাজ্য
রচি ঘর কত পরিপাটী ও !

(৯)

কত শত দুর্জ্জয় দুর্গম দুর্গে
বেড়িল তব তটদেশে ও ; ৩৬
নগর-প্রাচীরে ঘেরিল শেষে
চিরযুগ সম্ভোগ-আশে ও ।

(১০)

সে সব কৌতুক কাল-কবল আজি
লেশ না রাখিল শেষ ও ! ৪০
কোথা সেই গৌরব নিকুঞ্জ-সৌরভ ?
হ'ল পরিণত শত কাহিনী ও !

—গোবিন্দচন্দ্র রায়

৪৪

ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর

(রঘুবংশ)

বাজিছে মঙ্গল-বাদ্য মধুর নিক্কণে,
উঠিছে শঙ্খের ধ্বনি ব্যাপি দিগন্তর ;
মেঘের গর্জ্জন-ভ্রমে পুর-উপবনে
নাচিছে উল্লাসভরে ময়ূর-নিকর। ৪

সাজি স্বয়ম্বর-বেশে চারু ইন্দুমতী
সুবর্ণ-শিবিকা চাপি, মানব-বাহনে,
আসিলা সে সভামাঝে ; শত রূপবতী
সখীবৃন্দ বেষ্টিয়াছে পরম যতনে। ৮

সুনন্দা নামেতে প্রতিহারিণী তখন
রাজগণ-ইতিবৃত্ত বিদিত যাহার,
কুমারীরে ল'য়ে অগ্রে মগধ-রাজার,
প্রগল্‌ভে পুরুষপ্রায় কহিল বচন— ১২

"পরন্তপ নাম এই মগধ-ঈশ্বর,
অরিন্দম, মহাবীর, প্রকৃতি-গম্ভীর,
প্রজার রঞ্জন-কার্য্যে রত নিরন্তর,
দীনের শরণ রাজা পরম সুধীর। ১৬

"যদিও সহস্র রাজা আছেন ধরায়,
এই রাজা হ'তে ধরা হৈল রাজন্বতী ;
যদিও অগণ্য তারা শোভিত নিশায়,
কিন্তু নিশি পেয়ে শশী হন জ্যোতিষ্মতী। ২০

"ইচ্ছা যদি, দেও পাণি এই রাজবরে—
যাইবে কুসুমপুরে ; রমণী-নিকরে
মহোৎসবে মাতি, বসি হর্ম্ম্য-বাতায়নে
জুড়াবে নয়ন তোমা হেরি, বরাননে।" ২৪

এরূপ কহিল সুনন্দা সুন্দরী,
নমিলা মগধরাজে ভোজ-রাজবালা,
সদূর্ব্বা দুলিছে করে মধুকের মালা ;
নীরবে সে স্থান হ'তে চলিলা কুমারী। ২৮

তথা হ'তে দৌবারিকী অন্য রাজপানে
ল'য়ে গেল কুমারীরে,—মানসের নীরে
লয়ে যায় ঊর্ম্মিমালা পবন-চালনে
পদ্ম হ'তে পদ্মান্তরে যথা মরালীরে। ৩২

* * *

সুনন্দার সঙ্গে তবে রাজার নন্দিনী
অন্য নৃপতির কাছে করিলা গমন ;
অরিকুল-দর্পহারী এই নৃপমণি
নবোদিত শশিকলা-সম দরশন। ৩৬

"মহাবাহু এ যুবক অবন্তী-ঈশ্বর
সুগোল সুতনু কটি, বক্ষ সুবিশাল ;
বিশ্বকর্ম্মা-শাণচক্রে শাণিত ভাস্কর-
সম তেজে, শোভিছেন এই মহীপাল। ৪০

"রণভূমে যান যবে অবন্তী-রাজন্
অগ্রগামী বাজিরাজি-দ্রুতপদ-ভরে
সমুত্থিত ধূলারাশি আবরে গগন,
সামন্ত-নৃপতি-শিরে মণি-তেজ হরে। ৪৪

"ইচ্ছা তব হয় কি লো ইন্দুনিভাননে,
বিহরিতে প্রেমভরে এ যুবার সনে—
সিপ্রা-তরঙ্গিনী-তীরে উদ্যান-মালায়
ঊর্ম্মি-স্পর্শ-শীত বায়ু খেলিছে যথায় ?" ৪৮

কোমলাঙ্গী কুমুদিনীসম ইন্দুমতী
সূর্য্যতেজা এ রাজারে বরিবে কেমনে ?—
শোষে রিপুরূপ পঙ্কে যেই মহামতি,
প্রফুল্ল রাখেন পদ্মপ্রায় বন্ধুগণে। ৫২

* * *

হেমাঙ্গদ নামে রাজা কলিঙ্গের পতি
পরেন অঙ্গদ ভুজে শত্রু-দর্পহারী ;
আসিলা সম্মুখে তার চারু ইন্দুমতী
পূর্ণেন্দু-বদনা, হেরি কহিল কিঙ্করী— ৫৬

"মহেন্দ্র-পর্ব্বতসম বলী এ রাজন্,
শাসেন জলধি আর মহেন্দ্র-ভূধর,
সেনা-অগ্রে চলে তাঁর সহস্র কুঞ্জর
সচল মহেন্দ্রাচল-সম দরশন। ৬০

"শত্রুর বিজয়লক্ষ্মী জিনিয়া সমরে
ধনুর্দ্ধর, ভুজে তুলি নিয়াছিলা বলে ;
লক্ষ্মীর সাঞ্জন অশ্রু পড়ি ভুজোপরে
অঙ্কিল শ্যামল রেখা গুণাঘাত-ছলে। ৬৪

"হর্ম্ম্যোপরি সুপ্ত যবে কলিঙ্গ-ঈশ্বর,
অদূরে তরঙ্গ-রঙ্গে পূরব-সাগর
আসিয়া গবাক্ষ-পাশে বৈতালিকপ্রায়
গম্ভীর নিনাদে তাঁরে নিয়ত জাগায়। ৬৮

"কর বাস, রাজবালা, এ রাজার সনে
সিন্ধুতীরে সু-মর্ম্মর তাল-বনমাঝে ;
দূর দ্বীপ হ'তে বহি লবঙ্গ-প্রসূনে
পবন জুড়াবে স্বেদ ও মুখ-সরোজে !" ৭২

সখীর প্রলোভ-বাণী শুনি সুবদনী
অন্যত্র চলিলা, ছাড়ি কলিঙ্গের পতি,—
গ্রহ-দোষে দোষী জনে ত্যজিয়া যেমতি
চলেন সুভগা লক্ষ্মী গুণ-বিলাসিনী। ৭৬

দেবাকৃতি মহাবীর নাগপুরেশ্বরে
দেখাইয়া দৌবারিকী কহিল তখন
সম্ভাষিয়া সুন্দরীরে ;—"কর বিলোকন
চকোরাক্ষী রাজবালা, এই রাজবরে। ৮০

"বিধিমতে পাণি-দান কর এ রাজায়—
দাক্ষিণাত্য মহাকুলে জনম যাঁহার ;
সরত্ন-অর্ণব-কাঞ্চী বসুধার প্রায়
হইবে সপত্নী তুমি দক্ষিণা-দিশার। ৮৪

"বিহরিবে নিরন্তর মলয়-অঞ্চলে—
আবৃত তমাল-পত্রে যথা কুঞ্জবন,
বেষ্টিছে তাম্বূল-লতা পূগ-তরুদলে,
আলিঙ্গিছে এলা-লতা সুরভি চন্দন।" ৮৮

ভোজের ভগিনী ইন্দুমতীর হৃদয়ে
না পশিল সুনন্দার বচন মধুর ;
পশে কি সুধাংশু-অংশু নিশীথ-সময়ে
মুদিত কমলে, রবি-বিরহ-বিধুর ? ৯২

যে যে রাজগণে ছাড়ি চলিলা যুবতী
মলিন তাঁদের মুখ দুখের আঁধারে ;
গেলে চলি দীপ-শিখা নিশায় যেমতি
রাজপথে হর্ম্ম্যরাজি ডুবে অন্ধকারে ! ৯৬

নিকটে আইল বালা,—রঘুর নন্দন
বরে কি না বরে তাঁরে ভাবিয়া আকুল ;
কাঁপিল দক্ষিণ ভুজে কেয়ূর-বন্ধন,
ঈষৎ ফুটিল তাহে আশার মুকুল। ১০০

সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হেরি রঘুর কুমার
দাঁড়াইলা রাজবালা, না চলিলা আর ;—
মঞ্জরিত সহকারে পাইলে যেমতি
না যায় অপর বৃক্ষে ভ্রমরের পাঁতি। ১০৪

অজে-নিবেশিত-মতি রাজার নন্দিনী
শরদিন্দুনিভাননা—হেরিয়া, আদরে
বচন-কুশলা ধনী মধুর-ভাষিনী
বিস্তারি সুনন্দা সখী কহিল তাঁহারে— ১০৮

"ককুৎস্থের কুলে জন্ম করিয়া গ্রহণ
সুযশা কুলের দীপ দিলীপ নৃপতি,
ইন্দ্রের ঈর্ষায় ক্ষান্ত হইলা সুমতি
ঊনশত যজ্ঞমাত্র করি সমাপন। ১১২

"তাঁর পুত্র রঘু এবে রাজ্য-অধিকারী—
বিশ্বজিৎ-যজ্ঞ যিনি করিয়া সাধন,
দিগন্ত-অর্জ্জিত নিজ ঐশ্বর্য্য বিতরি
রাখিলা মৃন্ময়-পাত্র—একমাত্র ধন ! ১১৬

"তাঁহার তনুজ এই অজ বীরবর,
ইন্দ্রের জয়ন্তে জিনি রূপে মনোহর ;
পিতৃসহ সমভাবে বহেন কুমার
এ নব-বয়সে গুরু পৃথিবীর ভার। ১২০

"রূপে, গুণে, কুলে, শীলে, নবীন যৌবনে
তব তুল্য এ কুমার, ওলো বরাননে !
বর তাঁরে, নিরখিয়া জুড়াবে নয়ন—
রতনে কাঞ্চনে আহা হউক মিলন !" ১২৪

শুনিয়া সখীর এই মধুমাখা বাণী,
সম্বরি নবীন লাজ রাজার নন্দিনী
সপ্রেম প্রসন্ন নেত্রে হেরিলা কুমারে—
দৃষ্টিযোগে মাল্য যেন দিলেন তাঁহারে। ১২৮

যুবতীর হেন ভাব করি দরশন
পরিহাসচ্ছলে সখী কহিল তখন—
"চল ধনি, অন্য দিকে দেখ রাজগণে",
রোষে বালা হেরে তারে কুটিল নয়নে। ১৩২

নব-অনুরাগভরে ভোজ-রাজবালা
সখী-হস্তে অজ-গলে করিলা অর্পণ
মূর্ত্তিমান্ প্রেমরূপ স্বয়ম্বর-মালা,
রঞ্জিত মঙ্গল-দ্রব্যে মানস-মোহন। ১৩৬

—নবীনচন্দ্র দাস

৪৫
শান্তি *

যে জন দিবসে মনের হরষে জ্বালায় মোমের বাতি,
আশু গৃহে তার হেরিবে না আর নিশীথে প্রদীপ-ভাতি।

—রাজকৃষ্ণ রায়

৪৬
শিশু-বীর

(১)

এ নহে তৈমুরলঙ্গ চীন তাতারীর,
আসেনি হিমাদ্রি লঙ্ঘি, নাহি সৈন্য সাথী সঙ্গী,
নাহি হাতে তরবার, নাহি ধনু তীর!
পথে পথে হাহাকারে, আসেনি কাঁদায়ে কারে, ৪
আসে নাই দেশে দেশে বহায়ে রুধির।
আসিয়াছে পুষ্প-রথে, সুমেরুর স্বর্ণপথে,
উড়ায়ে কনকরেণু কিরণে মিহির!

(২)

এ দেশে এসেছে এক দিগ্বিজয়ী বীর। ৮
সে যাহার ধরে গলে— হিমাদ্রি হ'লেও গলে,
বহে নেত্রে শতধারা সুধা জাহ্নবীর!
ও ক্ষুদ্র হাসির চোটে সাগর ফোঁপায়ে ওঠে,

শিহরে নারীর বুক—স্তনে ঝরে ক্ষীর ! ১২
কে জানে কিসের মোহ, নাহি যুদ্ধ নাহি দ্রোহ,
আত্মসমর্পণে সবে আনন্দে অধীর !
এ দেশে এসেছে এক দিগ্বিজয়ী বীর !

(৩)

এ দেশে এসেছে এক দিগ্বিজয়ী বীর। ১৬
তার হামাগুড়ি দিতে কুলায় না পৃথিবীতে,
অতি ক্ষুদ্র আঙ্গিনা সে ক্ষুদ্র পরিধির !
তার সে চরণ-দাপে বিশাল ব্রহ্মাণ্ড কাঁপে,
অতি ক্ষুদ্র ধরণী সে আকুল অস্থির ! ২০
প্রতাপ প্রভুত্ব তার নাহি বিশ্বে তুলনার,
কি ছার লঙ্কার সেই রাজা দশশির !
জুড়াইতে তার হিয়া শীতল পরশ দিয়া
আসিয়া রয়েছে আগে মলয় সমীর ! ২৪
তাহারি পানের তরে নদী হ্রদ সরোবরে
নীরদ রেখেছে ভরি সুশীতল নীর !

(৪)

তারি আসিবার তরে, রজত, সুবর্ণ-করে—
উজলিয়া আছে ধরা শশাঙ্ক, মিহির ! ২৮

তারি আগমন জন্য ধরণী হয়েছে ধন্য,
আর কোন প্রয়োজন নাহি পৃথিবীর !
তুষিতে তাহারি মন বসন্তের ফুলবন
ফুটায়ে রেখেছে ফুল সুধা-সুরভির ! ৩২

ফল-শস্যে হয় নত তরু তৃণ আছে যত,
পোষিতে অমৃত-খাদ্যে তাহারি শরীর !
তারি তরে আমি, তুমি, অনন্ত আকাশ, ভূমি—
সৃষ্টির গভীর অর্থ হয়েছে গম্ভীর ! ৩৬
এ দেশে এসেছে এক দিগ্বিজয়ী বীর !

—গোবিন্দচন্দ্র দাস

৪৭
বঙ্কিম-বিদায়

(১)

সায়াহ্ন—ছাব্বিশে চৈত্র – তের-শত সন,
এক পায় দুই পায় বসন্ত চলিয়া যায়
শ্যাম মমতায় মেখে বন-উপবন !
তার সে বিদায়-ভোজ—মধু খায় রোজ রোজ ৪
ফুলের গেলাস ভরি’ মধুকরগণ।
তরুণ তমালগাছে কি জানি কি লেখা আছে—
কোকিল করিছে পাঠ সে অভিনন্দন।

উড়ায়ে রুমাল ছাতা—নূতন পল্লব পাতা, ৮
আনন্দ জানায় যেন নীরবে কানন।
বসন্ত বিদায় আজ, সভাপতি দ্বিজরাজ
সুধাকরে করে তার শেষ সম্ভাষণ,
সায়াহ্ন—ছাব্বিশে চৈত্র—তের-শত সন! ১২

(২)

সায়াহ্ন—ছাব্বিশে চৈত্র—হায় হায় হায়,
বঙ্কিম বসন্ত-কবি আগে তার যায়!
লইয়ে নবীন, হেম, অক্ষয়ে অক্ষয় প্রেম,
চন্দ্রনাথ, প্রিয় বন্ধু দীনবন্ধু, রায়, ১৬
ধ'রে সবে হাতে হাতে, লইয়ে আসিলে সাথে,—
পারিজাত-বন থেকে শ্যামা পাপিয়ায়!
ছিন্ন-আশা ছিন্ন-বাসা সাজাইলে বঙ্গভাষা,
শীতের শিশির মুছে মলয়-হাওয়ায়! ২০
এখনো পূরেনি তার সময়ের অধিকার ;—
সায়াহ্ন—ছাব্বিশে চৈত্র, হায় হায় হায়!
বঙ্কিম বসন্ত-কবি আগে তার যায়!

(৩)

যাবে তুমি ? এ জগতে কে না বল যায় ? ২৪
কেহ গেলে হাসে লোকে, কেহ গেলে কাঁদে শোকে,
পরাণ বিদরে কারে করিতে বিদায়!

বসন্ত বাঁচিয়া থাক্, নিদাঘ শিশির যাক্,
কুলার বাতাসে আর তুষের ধুঁয়ায় ! ২৮
বারমাস নিতি নিতি, থাকুক পূর্ণিমা তিথি,
চ'লে যাক্ অমা-রাহু—ক্ষতি নাহি তায়।
তুমি থাক', মোরা যাই, আমরা যে ভস্ম ছাই,
কি হবে এ কোটি কোটি রেণু-কণিকায় ? ৩২
বিধির অপূর্ব্ব দান, দেশের গৌরব মান—
তুমি কবি-কোহিনূর কিরীট-চূড়ায় !
মোরা যাই, তুমি থাক, সুখী কর মায় !

(৪)

গভীর বসন্ত-নিশি—গভীর গগন, ৩৬
কলিকাতা নিমতলে, দিতেছে গঙ্গার জলে
ধোয়াইয়া ভারতের বুকভরা ধন !
পাতিয়ে অঞ্চল-ঢেউ,—আঁধারে দেখিনি কেউ,
মহাযত্নে মন্দাকিনী করিছে গ্রহণ ! ৪০
পাইয়া কবির ছাই, আনন্দের সীমা নাই,
চলেছে পতিরে দিতে ডগমগ মন !
কত যুগ যুগান্তর হৃতরত্ন রত্নাকর—
দেবতা লুটিয়া নেছে করিয়া মন্থন, ৪৪
পরশে কবির ছাই, ফিরিয়ে পাইবে তাই,
লবণাক্ত জলে হবে সুধা অতুলন !

ইন্দিরা জন্মিবে শঙ্খে, পারিজাত হবে পঙ্কে,
শুকুতি পরশে হবে মুকুতা-সৃজন ! ৪৮
শৈবাল প্রবাল হবে, সুধাকর ফেন সবে,
হইবে কলপতরু তৃণ তরুগণ !
পাষাণে পড়িলে দাগ, হবে মণি পদ্মরাগ,
অঙ্গারে হইবে হীরা, কৌস্তুভ-রতন ! ৫২
সত্যই কি কবি মরে ? বোঝে না অবোধ নরে,
কবি করে ত্রিদিবের নব আয়োজন,
আনন্দে অমর বন্দে কবির চরণ।

—গোবিন্দচন্দ্র দাস

৪৮

গ্রাম্য ছবি

মাটীতে নিকানো ঘর, দাওয়াগুলি মনোহর,
সমুখেতে মাটীর উঠান ;
খ'ড়ো চালখানি ছাঁটা, লতিয়া করলা-লতা
মাচা বেয়ে করেছে উত্থান। ৪
পিঁজারায় বস্ত্র-বাঁধা বউ-কথা কহে কথা,
বিড়ালটি শুইয়া দাবাতে,
মঞ্চে তুলসীর চারা গৃহে শিল্প কড়ি-ঝারা,
খোকা শুয়ে দড়ির দোলাতে। ৮

কানে দুল দুল্‌-দুল্‌; গাছ-ভরা পাকা কুল
ধীরে ধীরে পাড়ে দুটি বোনে,
ছোট হাতে জোর ক'রে শাখাটি নোয়ায়ে ধরে,
কাঁটা ফুটে, হাত লয় টেনে। ১২
পুকুরে নির্ম্মল জল, ঘেরা কলমীর দল,
হাঁসী দুটী করে সন্তরণ,
পুকুরের পাড়ে বাঁশ-বন।
শূন্য জন-কোলাহল, কিচি-মিচি পাখীদল, ১৬
সাঁই সাঁই বায়ুর স্বনন,
রোদটুকু সোণার বরণ!
লুটায়ে চুলের গোছা, বালাদুটি হাতে গোঁজা,
একাকিনী আপনার মনে ২০
ধান নাড়ে বসিয়া প্রাঙ্গণে।
শান্ত স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে গ্রাম্য মাঠে গোরু চরে,
তরুতলে রাখাল শয়ান,
সরু মেঠো রাস্তা বেয়ে পথিক চলেছে গেয়ে, ২৪
সাথে মিশে ঘুঘুর সে তান।

—গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

৪৯

আজান

কে অই শুনা'ল মোরে
আজানের ধ্বনি !
মর্ম্মে মর্ম্মে সেই সুর, বাজিল কি সুমধুর,
আকুল হইল প্রাণ, নাচিল ধমনী !
কি মধুর আজানের ধ্বনি ! ৫

আমি ত পাগল হ'য়ে
সে মধুর তানে,
কি যে এক আকর্ষণে, ছুটে যাই মুগ্ধমনে,
কি নিশিতে কি দিবসে
মস্‌জিদের পানে ! ১০

হৃদয়ের তারে তারে, প্রাণের শোণিত-ধারে
কি যে এক ঢেউ উঠে
ভক্তির তুফানে
কত সুধা আছে সেই মধুর আজানে !
নদী ও পাখীর গানে ১৫
তারি প্রতিধ্বনি ;

ভ্রমরের গুণ-গানে, সেই সুর আসে কাণে—
কি এক আবেশে মুগ্ধ
নিখিল ধরণী !

ভূধরে সাগরে জলে নির্ঝরিণী-কল-কলে ২০
আমি যেন শুনি সেই আজানের ধ্বনি !

যবে সেই সুর
ভাসে দূরে সায়াহ্নের নিথর অম্বরে,
প্রাণ করে আন্‌চান, কি মধুর সে আজান,
তারি প্রতিধ্বনি শুনি আত্মার ভিতরে ! ২৫

আকাশের পানে আমি
চে'য়ে থাকি যবে,
চন্দ্র সূর্য্য তারকায় অই সুর শুনি হায়,
সবাই গাহিয়া যায়
নীরবে নীরবে ! ৩০

ফুলের সৌরভ নিয়া পাতাগুলি দোলাইয়া
নৈশ বায়ু বহে যবে
"সর্ সর্" রবে,
তাহারি প্রত্যেক শ্বাসে, সেই সুর ভেসে আসে
ভ্রমান্ধ মানব তাহা বোঝে না এ ভবে ! ৩৫

ঊষা যবে ফুলসাজে
আসে ধরাধামে,
বিশ্বপতি-পূজা তরে, শেফালি ঝরিয়া পড়ে,
রজনী প্রণমে তারে
প্রতি যামে যামে ! ৪০

নীরব নিঝুম ধরা, বিশ্বে যেন সবি মরা,
একটুকু শব্দ যবে
নাহি কোন স্থানে—
মোয়াজ্জিন উচ্চৈঃস্বরে দাঁড়ায়ে মিনার 'পরে
কি সুধা ছড়িয়ে দেয় ৪৫
ঊষার আজানে !
জাগাইতে মোহ-মুগ্ধ মানব-সন্তানে !
"লা-এলাহা ইল্‌লাল্লা, মোহাম্মদ-অর্ রসুলোল্লা"—
মোয়াজ্জিন মিনারে উঠে
ফুকারে যখন, ৫০
সবাই ভকতিভরে, তাঁহারে অর্চ্চনা করে,
এ সৌর-জগৎ যিনি করেছে সৃজন।
কি মধুর আজানের ধ্বনি !
মর্ম্মে মর্ম্মে সেই সুর, বাজিল কি সুমধুর,
আকুল হইল প্রাণ, নাচিল ধমনী ! ৫৫

—কায়কোবাদ

৫০

পাছে লোকে কিছু বলে

করিতে পারি না কাজ,
সদা ভয়, সদা লাজ,
সংশয়ে সংকল্প সদা টলে,
পাছে লোকে কিছু বলে ! ৪
আড়ালে আড়ালে থাকি,
নীরবে আপনা ঢাকি,
সম্মুখে চরণ নাহি চলে,
পাছে লোকে কিছু বলে ! ৮
হৃদয়ে বুদ্‌বুদ্‌ মত
উঠে শুভ্র চিন্তা কত,
মিশে যায় হৃদয়ের তলে,
পাছে লোকে কিছু বলে ! ১২
কাঁদে প্রাণ যবে, আঁখি
সযতনে শুষ্ক রাখি,
নিরমল নয়নের জলে
পাছে লোকে কিছু বলে ! ১৬
একটি স্নেহের কথা
প্রশমিতে পারে ব্যথা—
চ'লে যাই উপেক্ষার ছলে,
পাছে লোকে কিছু বলে ! ২০

মহৎ উদ্দেশ্যে যবে
একসাথে মিলে সবে,
পারি না মিলিতে সেই দলে,
পাছে লোকে কিছু বলে ! ২৪
বিধাতা দেছেন প্রাণ,
থাকি সদা ম্রিয়মাণ,
শক্তি মরে ভীতির কবলে,
পাছে লোকে কিছু বলে ! ২৮

—কামিনী রায়

৫১

চাহিবে না ফিরে

পথে দেখে' ঘৃণাভরে কত কেহ গেল সরে',
উপহাস করি' কেহ যায় পায়ে ঠেলে ;
কেহ বা নিকটে আসি' বরষি' গঞ্জনারাশি
ব্যথিতেরে ব্যথা দিয়ে যায় শেষে ফেলে'। ৪
পতিত মানব-তরে নাহি কি গো এ সংসারে
একটি ব্যথিত প্রাণ, দু'টি অশ্রুধার ?
পথে পড়ে' অসহায়,— পদে তারে দলে' যায়,
দু'খানি স্নেহের কর নাহি বাড়াবার ? ৮

সত্য, দোষে আপনার চরণ স্খলিত তার ;
তাই তোমাদের পদ উঠিবে ও-শিরে ?
তাই তার আর্ত্তরবে সকলে বধির হবে,
যে যাহার চ'লে যাবে—চাহিবে না ফিরে ? ১২
বর্ত্তিকা লইয়া হাতে চলেছিল এক সাথে,
পথে নিবে গেল আলো,—পড়িয়াছে তাই ;
তোমরা কি দয়া ক'রে, তুলিবে না হাত ধ'রে,
অর্দ্ধদণ্ড তার লাগি' থামিবে না, ভাই ? ১৬
তোমাদের বাতি দিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া নিয়া,
তোমাদেরি হাতে ধরি' হোক্ অগ্রসর ;
পঙ্কমাঝে অন্ধকারে ফেলে যদি দাও তারে,
আঁধার রজনী তার রবে নিরন্তর। ২০

—কামিনী রায়

আধুনিক যুগ

৫২

অশোক তরু *

হে অশোক, কোন্ রাঙ্গা-চরণ-চুম্বনে
মর্ম্মে মর্ম্মে শিহরিয়া হ'লি লালে-লাল ?
কোন্ দোল-পূর্ণিমায় নব-বৃন্দাবনে
সহর্ষে মাখিলি ফাগ্, প্রকৃতি-দুলাল ? ৪
কোন্ চির-সধবার ব্রত-উদ্যাপনে
পাইলি বাসন্তী শাড়ি সিন্দূর-বরণ ?
কোন্ বিবাহের রাত্রে বাসর-ভবনে
একরাশি ব্রীড়া-হাসি করিলি চয়ন ? ৮
বৃথা চেষ্টা !—হায় ! এই অবনী-মাঝারে
কেহ নহে জাতিস্মর—তরু-জীব-প্রাণী !
পরাণে লাগিয়া ধাঁধা আলোক-আঁধারে,
তরুও গিয়াছে ভুলে অশোক-কাহিনী ! ১২
শৈশবের আবছায়ে শিশুর 'দেয়ালা',—
তেমতি, অশোক, তোর লালে-লাল খেলা !

—দেবেন্দ্রনাথ সেন

৫৩

বৈশাখ

(১)

কপালে কঙ্কণ হানি, মুক্ত করি চুল,
"বাসন্তী যামিনী" আহা কাঁদিয়া আকুল !
স্বামী তার, "চৈত্রমাস," অনঙ্গের মত,
দক্ষিণে ঈষৎ হেলি, জানু করি নত, ৪
কার তপ ভাঙিবারে করিছে প্রয়াস ?
রুদ্রের মূরতি ওযে !—একি সর্ব্বনাশ !

(২)

ললাটে অনল, হের, ধক্ ধক্ জ্বলে !
সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি-ভস্ম মাখি কুতূহলে, ৮
তপে মগ্ন,—চিনিলে না বৈশাখ-দেবেরে ?
হে চৈত্র, এ নিশি-শেষে, নিয়তির ফেরে,
হারাইলে প্রাণ, আহা !—নাশিতে জীবন,
রোষান্ধ বৈশাখ ওই মেলিল নয়ন ! ১২

(৩)

দিগঙ্গনা হাঁকি ডাকে, "কি কর, কি কর !"—
নব-ঊষা বলে—"ক্রোধ সম্বর, সম্বর !"

কোকিল ডাকিল মুহু, করিয়া মিনতি,
সম্ভ্রমে অশোক-পুষ্প করিল প্রণতি ! ১৬
বৃথা ! বৃথা ! বৈশাখের দু'চক্ষু হইতে,
নিঃসরিল অগ্নিকণা বেগে আচম্বিতে !

(৪)

ভস্ম হ'ল "চৈত্রমাস" ! হয়ে অনাথিনী
মুছিল সিন্দূর-বিন্দু "বাসন্তী যামিনী" ! ২০
শাল্মলীর পুষ্পরাশি পড়িল ঝরিয়া,
পাপিয়া বসন্ত-রাজ্যে গেল পলাইয়া ;
প্রজাপতি লুকাইল করবীর শিরে,—
ভিজিল শিরীষ-পুষ্প নয়নের নীরে ! ২৪

(৫)

আম্রের বাছনিদের সুহরিত দেহ
ভরি গেল রক্তপীতে, খসি গেল কেহ ।
কঠিন উপলে বসি সারস সারসী
বিহগ-ভাষায় ডাকে—"কোথায় সরসী !" ; ২৮
গহন অরণ্যে ছায়া পলাল তরাসে,—
ক্লান্ত পান্থ শ্রান্ত হয়ে আতপে সন্তাষে !

—দেবেন্দ্রনাথ সেন

৫৪

দরিদ্রের স্বপ্ন

শীর্ণ দেহ, পাণ্ডুর অধর,
শুষ্ক তালু, কুঞ্চিত জঠর,—
চারিধারে করি' হাহাকার,
চারিধারে বলি' মার মার,
দুর্ভিক্ষ চলিয়ে যবে যায়, ৫
অসংখ্য অসংখ্য পঙ্গপাল,
দুর্ভিক্ষের দুরন্ত ছাবাল,
তরু, লতা, ঘাস, পাতা, সব মুড়াইয়া,
বসন্ত-লক্ষ্মীর আহা সিন্দূর মুছিয়া,
জনকের পিছু পিছু ধায়! ১০

তার পরে, ভাগ্যবলে, বাসব হইলে কৃপাবান,
ফল-ফুলে হ'য়ে শোভাবান,
সাহারার মাঝে পুন দেখা দেয় বিচিত্র উদ্যান!
নেহারে কৃষকবালা হরিষ-অন্তর,—
গোলাবাড়ি মাঠ আর ঘর ১৫
ভরি গেছে ফসলে ফসলে!
কনক-কুণ্ডলগুলি দোলে,
অতি মনোহর—
মনোহর সমীর-হিল্লোলে!

সেইরূপ কনককুণ্ডলা, ২০
স্বর্ণকান্তি, তেমতি উজলা,
আসিয়াছ মোর গৃহে ?—এস মা কমলা !
ধান্য-শীষ অলকে দুলিছে,
মাধুরী যে উথলি পড়িছে !
ঝাঁপি কাঁখে, হসিত বয়ানে, ২৫
কটাক্ষে করিছ দৃষ্টি নীবারের পানে,
নীবার যে ঝরিয়া পড়িছে !

দেবি, একি—সবি কি স্বপন ?
তুমিও কি স্বপন-সৃজন ?
বারবার অবিশ্বাস ৩০
ফেলিয়া দীরঘ-শ্বাস,
মর্ম্মমাঝারে আসি লভিছে জনম !
বল, দেবি, তুমি কি স্বপন ?

দূর দেশান্তরে বধূ আনিবারে
যায় যবে বর, ৩৫
দুই দিন উদাসীন থাকে
স্বজন-নিকর ;
দুই দিন ফাঁক ফাঁক লাগে
আঙিনা ও ঘর !
তার পর, যবে বর ৪০

বধূটিরে ল'য়ে,
ফিরে আসে আপন আলয়ে,
খুলে যায় প্রাণের মোহানা ;
চারি দিকে উলু ধ্বনি হয়,
হর্ষ করে গণ্ডগোল— ৪৫
হ'য়ে মহা উতরোল
বেজে উঠে কঙ্কণ বলয় ;
লইয়ে বরণডালা,
যতেক সধবা বালা,
কোলে করি বধূরে নামায়,— ৫০
কৌতুকে ঘোমটা হ'তে
মুচকিয়া মৃদু হাসি,
নববধূ চারিধারে চায় !

তেমতি বধূর রূপ ধরি,
আসিয়াছ ?—এস মা কমলা ! ৫৫
তেমতি গো উৎসবলহরী,
চারিধারে বরিষণ করি,
আসিয়াছ ?—এস দেববালা !
শোভার মূরতি অভিনব,
অনুপম রূপরাশি তব ! ৬০

বল দেবি, সবি কি স্বপন ?
তুমিও কি স্বপন-সৃজন ?
বার বার অবিশ্বাস
ফেলিয়া দীরঘ-শ্বাস
মর্ম্মমাঝারে আসি লভিছে জনম ; ৬৫
বল, দেবি, সবি কি স্বপন ?

—দেবেন্দ্রনাথ সেন

৫৫

হৃদয়-শঙ্খ

তুচ্ছ শঙ্খসম এ হৃদয়
পড়ে' আছে সংসারের কূলে,
সুদূর সংসারপানে চাহি'
সতৃষ্ণ নয়ন দুটি তুলে'। ৪

আসে যায়—কেহ নাহি চায়,
সবাই খুঁজিছে মুক্তা-মণি ;
কে শুনিবে, হৃদয়ে আমার
ধ্বনিছে কি অনন্তের ধ্বনি ! ৮

হে রমণী, লও—তুলে লও
তোমাদের মঙ্গল-উৎসবে—
একবার ওই গীতি-গানে
বেজে উঠি সুমঙ্গল রবে ! ১২

হে রথী, হে মহারথী, লও,
একবার ফুৎকার' সরোষে—
বলদৃপ্ত, পরস্বলোলুপ
মরে যাক্ সে বজ্র-নির্ঘোষে ! ১৬

হে যোগী, হে ঋষি, হে পূজক,
তোমরা ফুৎকার' একবার—
আহুতি, প্রণতি, স্তুতি-আগে
আনি বহে' আশীর্ব্বাদ ভার ! ২০

—অক্ষয়কুমার বড়াল

৫৬
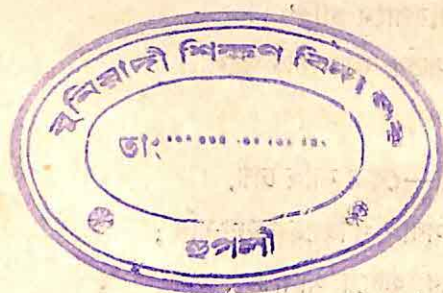
শিশুহারা

হা বিধি,
কেন রে করিলি তারে চুরি!
অভাব কি হ'য়েছিল স্বরগে মাধুরী?
ভরিতে কাহার বুক
হরিলি আমার সুখ! ৪
তার সেই হাসিমুখ চাঁদে নাহি দিলে—
যেত কি রে সব আলো নিবিয়া অখিলে?

বুকখানা ভেঙ্গে' চূরে'
কার বুক দিলি জুড়ে'— ৮
আমার সে বুকে-বাঁধা বাহুদুটি তার?
ছিঁড়েছিল কোন্ শাখা কল্প-লতিকার!

আমারে করিয়া অন্ধ,
কারে দিলি সে আনন্দ? ১২
কোন্ স্বর্গ-হরিণীর অন্ধ শিশু ছিল—
সেই দুটি টানা-চোখে আবার চাহিল!

কোন্ নন্দনের পাশে,
অলস জ্যোৎস্নার হাসে, ১৬
কোন্ মন্দাকিনী-স্রোত থেমেছিল ভুলে—
চলি-চলি চলা তার দিলি কূলে কূলে!

কোন্ অপ্সরীর বীণা
হ'তেছিল সুরহীনা ? ২০
দিয়ে তার আধ-কথা—নবীন ঝঙ্কার,
বিষণ্ণ দেবতাকুলে ভুলালি আবার !

বাছা রে,
আজি স্বর্গ-রঙ্গভূমে,
কত দেবী তোরে চুমে ! ২৪
সে আনন্দ-কোলাহলে খুঁজিস্ কি মোরে ?
পেয়েছে কি হেন কেহ—
জানে জননীর স্নেহ !
তেমনি কি ভয়ে—ভূমে নামায় না তোরে ? ২৮

শত কোলে ফিরে' ফিরে'
কার কোলে ঘুমালি রে—
আপন করিলি কারে, মায়ে ক'রে পর !
জীবন-শ্মশান-কূলে ৩২
বসে' আছি বড় ভুলে' !
আকাশের পানে চেয়ে অশ্রু দরদর—
আজ তুই কোথা, বাছা, কত দূরান্তর !

—অক্ষয়কুমার বড়াল

'৫৭

সন্ধ্যা

দূরে—সুমেরুর শিরে আসে সন্ধ্যারাণী,
সুনীল বসনে ঢাকি' ফুলতনুখানি।
তরল গুণ্ঠন-আড়ে
মুখ-শশী উঁকি মারে ;
সরমে উছলি' পড়ে কত প্রেম-বাণী! ৫

নব-নীলোৎপল মত
আঁখি দুটি অবনত ;
সম্ভ্রমে সঙ্কোচে কত বাধিছে চরণ!
পতির পবিত্র ঘরে
সতী পরবেশ করে— ১০
হাতে সুবর্ণের দীপ, হৃদয়ে কম্পন!

নয়নে গভীর তৃপ্তি—
ক্ষীরোদ-সমুদ্র-দীপ্তি ;
অধরে চন্দ্রিকা-হাসি—বিজয়-বিশ্রাম!
নিশ্বাসে মলয়াবেগ, ১৫
অলকে অলক-মেঘ,
শুক্রতারা-মুকুতার—নৃত্য অভিরাম!

আসে ধনী আথিবিথি,
কপালে তারকা-সিঁথা
সীমন্তে সিন্দূর-বিন্দু—দিনান্ত-তপন ; ২০
গুচ্ছে গুচ্ছে কালো চুলে
স্তব্ধ অন্ধকার দুলে ;
দিগন্ত-বসনাঞ্চলে কত না রতন !

অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব দৃশ্য !
সম্ভ্রমে প্রণমে বিশ্ব, ২৫
দেবতা আশীষচ্ছলে বরষে শিশির।
নদীমুখে কলগীতি,
সমুদ্র-হৃদয়ে স্ফীতি,
অগুরু-চন্দন-ধূপে অলস সমীর।

ঘরে ঘরে দীপ জ্বলে— ৩০
পুলিনে, তুলসী-তলে,
যেন শত চক্ষু মেলে' হেরিছে ধরণী !
মন্দিরে মঙ্গলারতি,
বালা পূজে সন্ধ্যাসতী,
পুরনারী ভক্তিভরে করে শঙ্খ-ধ্বনি। ৩৫

—অক্ষয়কুমার বড়াল

প্রার্থনা *

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবস-শর্ব্বরী,
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি' ; ৪
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হ'তে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্ব্বারিত স্রোতে
দেশে-দেশে দিশে-দিশে কর্ম্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায় ; ৮
যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি',
পৌরুষেরে করেনি শতধা, নিত্য যেথা
তুমি সর্ব্বকর্ম্ম-চিন্তা-আনন্দের নেতা ;— ১২
নিজ হস্তে নির্দ্দয় আঘাত করি', পিতঃ,
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত ॥

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৯

আষাঢ় *

নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে
তিল ঠাঁই আর নাহি রে !
ওগো, আজ তোরা যাস্‌নে ঘরের
বাহিরে।   ৪
বাদলের ধারা ঝরে ঝর-ঝর,
আউসের ক্ষেত জলে ভর-ভর,
কালিমাখা মেঘে ওপারে আঁধার
ঘনিয়েছে, দেখ্‌ চাহি' রে !   ৮
ওগো, আজ তোরা যাস্‌নে ঘরের
বাহিরে ॥

ওই ডাকে শোনো ধেনু ঘনঘন,
ধবলীরে আনো গোহালে।   ১২
এখনি আঁধার হবে, বেলাটুকু
পোহালে !
দুয়ারে দাঁড়ায়ে, ওগো দেখ্‌ দেখি—
মাঠে গেছে যারা তা'রা ফিরিছে কি,   ১৬
রাখাল বালক কি জানি কোথায়
সারাদিন আজি খোয়ালে !
এখনি আঁধার হবে, বেলাটুকু
পোহালে ॥   ২০

শোন শোন ওই পারে যাব ব'লে
কে ডাকিছে বুঝি মাঝিরে।
খেয়া-পারাপার বন্ধ হয়েছে
আজিরে! ২৪

পূবে-হাওয়া বয়, কূলে নেই কেউ,
দু'কূল বাহিয়া উঠে পড়ে ঢেউ,
দরদরবেগে জলে পড়ি' জল
ছলছল উঠে বাজি রে, ২৮
খেয়া-পারাপার বন্ধ হয়েছে
আজিরে॥

ওগো, আজ তোরা যাস্‌নে গো তোরা
যাস্‌নে ঘরের বাহিরে, ৩২
আকাশ আঁধার, বেলা বেশি আর
নাহিরে!

ঝরঝরধারে ভিজিবে নিচোল,
ঘাটে যেতে পথ হয়েছে পিছল, ৩৬
ঐ বেণুবন দুলে ঘনঘন
পথপাশে দেখ চাহি রে।
ওগো, আজ তোরা যাস্‌নে ঘরের
বাহিরে॥ ৪০

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬০

নিষ্ফল উপহার

নিম্নে যমুনা বহে স্বচ্ছ শীতল,
ঊর্দ্ধে পাষাণ-তট, শ্যাম শিলাতল ;
মাঝে গহ্বর, তাহে পশি জলধার
ছলছল করতালি দেয় অনিবার। ৪

বরষার নির্ঝরে অঙ্কিত-কায়
দুই তীরে গিরিমালা কত দূর যায় !
স্থির তারা, নিশিদিন তবু যেন চলে,
চলা যেন বাঁধা আছে অচল শিকলে ! ৮

মাঝে মাঝে শাল তাল রয়েছে দাঁড়ায়ে,
মেঘেরে ডাকিছে গিরি হস্ত বাড়ায়ে।
তৃণহীন সুকঠিন বিদীর্ণ ধরা,
রৌদ্র-বরণ ফুলে কাঁটাগাছ ভরা। ১২

দিবসের তাপ ভূমি দিতেছে ফিরায়ে,
দাঁড়ায়ে রয়েছে গিরি আপনার ছায়ে,
পথহীন, জনহীন, শব্দ-বিহীন ;
ডুবে রবি, যেমন সে ডুবে প্রতিদিন। ১৬

রঘুনাথ হেথা আসি যবে উতরিলা,
শিখ-গুরু পড়িছেন ভগবৎ-লীলা ;
রঘু কহিলেন নমি' চরণে তাঁহার,
"দীন আনিয়াছে, প্রভু, হীন উপহার!" ২০

বাহু বাড়াইয়া গুরু শুধায়ে কুশল
আশীষিলা মাথায় পরশি করতল।
কনকে হীরকে গাঁথা বলয় দু'খানি
গুরুপদে দিলা রঘু জুড়ি' দুই পাণি। ২৪

ভূমিতল হ'তে বালা লইলেন তুলে'
দেখিতে লাগিলা প্রভু ঘুরায়ে আঙুলে।
হীরকের সূচি-মুখ শতবার ঘুরি'
হানিতে লাগিল শত আলোকের ছুরি! ২৮

ঈষৎ হাসিয়া গুরু পাশে দিলা রাখি',
আবার সে পুঁথিপরে নিবেশিলা আঁখি।
সহসা একটি বালা শিলাতল হ'তে
গড়ায়ে পড়িয়া গেল যমুনার স্রোতে। ৩২

"আহা আহা"—চীৎকার করি' রঘুনাথ
ঝাঁপায়ে পড়িল জলে বাড়ায়ে দু'হাত।
আগ্রহে যেন তার প্রাণ-মন-কায়
একখানি বাহু হয়ে ধরিবারে যায়! ৩৬

বারেকের তরে গুরু না তুলিলা মুখ,
নিভৃত হৃদয়ে তাঁর জাগে পাঠ-সুখ।
কালো জল চুপে চুপে বহিল গোপন
ছলভরা সুগভীর চুরির মতন। ৪০

দিবালোক চলে' গেল দিবসের পিছু;
যমুনা উতলা করি' না মিলিল কিছু।
সিক্ত বসন লয়ে' শ্রান্ত শরীরে
রঘুনাথ গুরু কাছে আসিলেন ফিরে'। ৪৪

"এখনো উঠাতে পারি," করযোড়ে যাচে—
"যদি দেখাইয়া দাও কোন্‌খানে আছে।"
দ্বিতীয় বলয়খানি ছুঁড়ি' দিয়া জলে,
গুরু কহিলেন "আছে ওই নদীতলে!" ৪৮

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬১

জুতা আবিষ্কার

কহিলা হবু, "শুন গো গোবুরায়,
কালিকে আমি ভেবেছি সারারাত্র—
মলিন ধূলা লাগিবে কেন পায়
ধরণীমাঝে চরণ-ফেলা মাত্র ? ৪
তোমরা শুধু বেতন লহ বাঁটি',
রাজার কাজে কিছুই নাহি দৃষ্টি ;
আমার মাটি লাগায় মোরে মাটি,
রাজ্যে মোর এ কী এ অনাসৃষ্টি ! ৮
শীঘ্র এর করিবে প্রতিকার,
নহিলে কারো রক্ষা নাহি আর।"

শুনিয়া গোবু ভাবিয়া হ'ল খুন,
দারুণ ত্রাসে ঘর্ম্ম বহে গাত্রে। ১২
পণ্ডিতের হইল মুখ চুন,
পাত্রদের নিদ্রা নাহি রাত্রে।
রান্নাঘরে নাহিক চড়ে হাঁড়ি,
কান্নাকাটি পড়িল বাড়িমধ্যে, ১৬
অশ্রুজলে ভাসায়ে পাকা দাড়ি
কহিলা গোবু হবুর পাদপদ্মে,—
"যদি না ধূলা লাগিবে তব পায়ে,
পায়ের ধূলা পাইব কি উপায়ে ?" ২০

শুনিয়া রাজা ভাবিল দুলি' দুলি',
কহিল শেষে, "কথাটা বটে সত্য,
কিন্তু আগে বিদায় করো ধূলি,
ভাবিও পরে পদধূলির তত্ত্ব। ২৪
ধূলা-অভাবে না পেলে পদধূলা
তোমরা সবে মাহিনা খাও মিথ্যে,
কেন বা তবে পুষিনু এতগুলা
উপাধি-ধরা বৈজ্ঞানিক ভৃত্যে ? ২৮
আগের কাজ আগে তো তুমি সারো,
পরের কথা ভাবিও পরে আরো।"

আঁধার দেখে রাজার কথা শুনি',
যতনভরে আনিল তবে মন্ত্রী ৩২
যেখানে যত আছিল জ্ঞানী-গুণী—
দেশ-বিদেশে যতেক ছিল যন্ত্রী।
বসিল সবে চস্‌মা চোখে আঁটি',
ফুরায়ে গেল উনিশ পিপে নস্য ; ৩৬
অনেক ভেবে কহিল, "গেলে মাটি
ধরায় তবে কোথায় হবে শস্য !"
কহিল রাজা, "তাই যদি না হবে,
পণ্ডিতেরা রয়েছে কেন তবে ?" ৪০

সকলে মিলি' যুক্তি করি' শেষে
কিনিল ঝাঁটা সাড়ে-সতেরো লক্ষ,
ঝাঁটের চোটে পথের ধূলা এসে
ভরিয়া দিল রাজার মুখ বক্ষ। ৪৪
ধূলায় কেহ মেলিতে নারে চোখ,
ধূলার মেঘে পড়িল ঢাকা সূর্য্য,
ধূলার বেগে কাশিয়া মরে লোক,
ধূলার মাঝে নগর হ'ল উহ্য। ৪৮
কহিল রাজা, "করিতে ধূলা দূর,
জগত হ'ল ধূলায় ভরপুর!"

তখন বেগে ছুটিল ঝাঁকে-ঝাঁক
মশক্ কাঁখে একুশ লাখ ভিস্তি; ৫২
পুকুরে বিলে রহিল শুধু পাঁক,
নদীর জলে নাহিক চলে কিস্তি।
জলের জীব মরিল জল বিনা,
ডাঙার প্রাণী সাঁতার করে চেষ্টা; ৫৬
পাঁকের তলে মজিল বেচা-কিনা,
সর্দ্দিজ্বরে উজাড় হ'ল দেশটা।
কহিল রাজা, "এমনি সব গাধা—
ধূলারে মারি' করিয়া দিল কাদা!" ৬০

আবার সবে ডাকিল পরামর্শে,
বসিল পুন যতেক গুণবন্ত,
ঘুরিয়া মাথা হেরিল চোখে শর্ষে,
ধূলার হায় নাহিক পায় অন্ত ! ৬৪
কহিল "মহী মাদুর দিয়ে ঢাকো,
ফরাস পাতি' করিব ধূলা বন্ধ।"
কহিল কেহ "রাজারে ঘরে রাখো,
কোথাও যেন না থাকে কোন রন্ধ্র। ৬৮
ধূলার মাঝে না যদি দেন পা'
তা হ'লে পায়ে ধূলা তো লাগে না।"

কহিল রাজা, "সে কথা বড় খাঁটি,
কিন্তু মোর হতেছে মনে সন্ধ, ৭২
মাটির ভয়ে রাজ্য হবে মাটি
দিবসরাতি রহিলে আমি বন্ধ।"
কহিল সবে, "চামারে তবে ডাকি'
চর্ম্ম দিয়া মুড়িয়া দাও পৃথ্বী ! ৭৬
ধূলির মহী ঝুলির মাঝে ঢাকি',
মহীপতির রহিবে মহাকীর্ত্তি।"
কহিল সবে, "হবে সে অবহেলে,
যোগ্যমত চামার যদি মেলে।" ৮০

রাজার চর ধাইল হেথা হোথা,
ছুটিল সবে ছাড়িয়া সব কর্ম্ম।
যোগ্যমত চামার নাহি কোথা,
না মিলে এত উচিতমত চর্ম্ম। ৮৪
তখন ধীরে চামার-কুলপতি
কহিল এসে ঈষৎ হেসে বৃদ্ধ—
"বলিতে পারি করিলে অনুমতি,
সহজে যাহে মানস হবে সিদ্ধ। ৮৮
নিজের ছুটি চরণ ঢাকো, তবে
ধরণী আর ঢাকিতে নাহি হবে।"

কহিল রাজা, "এত কি হবে সিধে,
ভাবিয়া ম'ল সকল দেশসুদ্ধ!" ৯২
মন্ত্রী কহে "বেটারে শূল বিঁধে
কারার মাঝে করিয়া রাখো রুদ্ধ।"
রাজার পদ চর্ম্ম-আবরণে
ঢাকিল বুড়া বসিয়া পদোপান্তে। ৯৬
মন্ত্রী কহে "আমারো ছিল মনে,
কেমনে বেটা পেরেছে সেটা জান্‌তে!"
সেদিন হ'তে চলিল জুতা-পরা,
বাঁচিল গোবু, রক্ষা পেল ধরা। ১০০

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬২

বিদায়

তবে আমি যাই গো, তবে যাই।
ভোরের বেলা শূন্য-কোলে ডাক্‌বি যখন খোকা ব'লে,
ব'ল্‌বো আমি, নাই সে-খোকা নাই।
মা গো যাই॥ ৪

হাওয়ার সঙ্গে হাওয়া হ'য়ে যাবো মা, তোর বুকে ব'য়ে,
ধ'র্‌তে আমায় পারবিনে তো হাতে।
জলের মধ্যে হ'ব মা ঢেউ, জান্‌তে আমায় পার্‌বে না কেউ,
স্নানের বেলা খেল্‌ব তোমার সাথে॥ ৮

বাদ্‌লা যখন প'ড়্‌বে ঝ'রে রাতে শুয়ে ভাব্‌বি মোরে,
ঝর্‌ঝরানি গান গাব ঐ বনে।
জান্‌লা দিয়ে মেঘের থেকে চমক্‌ মেরে যাব দেখে,
আমার হাসি প'ড়্‌বে কি তোর মনে॥ ১২

খোকার লাগি' তুমি মা গো, অনেক রাতে যদি জাগো,
তারা হ'য়ে ব'ল্‌বো তোমায় "ঘুমো"।
তুই ঘুমিয়ে প'ড়্‌লে পরে জ্যোৎস্না হয়ে ঢুক্‌বো ঘরে,
চোখে তোমার খেয়ে যাবো চুমো॥ ১৬

স্বপন হ'য়ে আঁখির ফাঁকে, দেখ্‌তে আমি আস্‌ব মাকে,
যাব তোমার ঘুমের মধ্যিখানে,
জেগে তুমি মিথ্যে আশে হাত বুলিয়ে দেখ্‌বে পাশে,
মিলিয়ে যাব কোথায় কে তা জানে ॥ ২০

পূজোর সময় যত ছেলে আঙিনায় বেড়াবে খেলে,
ব'ল্‌বে খোকা নেই-যে ঘরের মাঝে।
আমি তখন বাঁশীর সুরে আকাশ বেয়ে ঘুরে ঘুরে
তোমার সাথে ফির্‌বো সকল কাজে ॥ ২৪

পূজোর কাপড় হাতে ক'রে মাসী যদি শুধায় তোরে,
"খোকা তোমার কোথায় গেল চ'লে ?"
বলিস্‌, খোকা সে কি হারায়, আছে আমার চোখের তারায়,
মিলিয়ে আছে আমার বুকে কোলে ॥ ২৮

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬৩

মাতৃ-হারা

(১)

সাঙ্গ হলে' দিনের খেলা, খেয়ে চারটি তাড়াতাড়ি,
সন্ধ্যাটি না হতে হতেই, গাঢ় ঘুমের ঘোরে,
ঘুমোচ্ছিস্ রে মাণিক আমার, মাতৃহারা ও-রে !
পাঁচ মিনিট না যেতে যেতেই, ঘুমিয়ে গেছিস্,
নেতিয়ে গেছিস্, ৪
বাছা আমার আদুরে !
—ওরে আমার যাদু রে !

(২)

কে দিল তোর মাথায় বালিশ ? কে দিল তোর
চাদর গায়ে ?
কে পাড়াল ঘুম ? ৮
ওরে আমার ভাঙ্গা-ঘরে-চাঁদের-আলো ! ওরে আমার
বৃন্তচ্যুত ভূলুণ্ঠিত মন্দার-কুসুম !
শুন্‌তো হুকুম, ক'র্‌ত পেয়ার,
যে জন, এখন নাই ত সে আর ; ১২
মায়া কাটিয়ে চলে' সে ত গেছে এখান থেকে ;
তোকে যাদু, আমার কাছে রেখে !

(৩)

যতদিন সে ছিল হেথায়, তোর জন্যই সে ছিল আকুল,
তুই বলে' সে সারা ; ১৬
এখন একবার চোখের দেখা চেয়েও দেখে না সে তোরে,
—ওরে মাতৃহারা !
কোথায় সে যে চলে' গেল
কিছুই না বলে' গেল ; ২০
এইটে কেবল বুঝিয়ে গেল সার—
যে, ফির্‌বে না সে আর।

(৪)

সে যদি তোর থাক্‌তো, খানিক আবদার ক'র্‌তিস্‌
শোবার আগে,
দাবি ক'র্‌তিস্‌ চুমা ; ২৪
টেনে নিত বুকের মাঝে, গাইত সে সুমৃদুস্বরে
"ঘুমা, যাদু, ঘুমা"।
নাই সে যদি, নিজেই নিয়ে
চাদর খানি—গায়ে দিয়ে, ২৮
বালিশ দিয়ে মাথায়—
ঘুমটি অম্‌নি ছেয়ে এল আঁখির দুই পাতায় !
পাঁচ মিনিট না যেতে যেতেই, ঘুমিয়ে গেলি, নেতিয়ে গেলি,
ছেঁড়া একটা মাদুরে, ৩২
ওরে আমার যাদু রে !

(৫)

বুঝিস্ না তুই নিজের দুঃখ, ওরে সুখী বালক—
তাই ত আছিস্ সুখে ;
বিজ্ঞ আমি, বুঝি সূক্ষ্ম, ৩৬
বুঝি বেশী, তাই এ দুঃখ
বেশী বাজে বুকে।
তুইও বুঝবি বড় হ'লে, মনে পড়বে যখন
ছেলেবেলার কথা— ৪০
মায়ের যত্ন, মায়ের সেবা, সর্ব্বদা, সর্ব্বথা।
নিজের মায়ে আদর করে' ডাক্‌বে যখন কেহ,
তখন রে তোর মনে পড়বে, বিশ্বজগৎ হ'তে
লুপ্ত মাতৃস্নেহ ! ৪৪

(৬)

এখন ওরে মূঢ় শিশু, এখন কি তোর কাছে
মায়ের মূল্য আছে ?
এখন রে তোর কাছে মা কি মাসী পিসী মামী,
একটুখানি আদর দিলেই একই রকম দামী। ৪৮
এখন, যখন জঠর জ্বলে, পেলেই হোল খাদ্য কিছু,
কাছে একজন শুলেই হোল রাতে ;
যে সে হোক না, ব'ল্‌লেই হোল ভূতের কিম্বা বাঘের গল্প,
খেলার সাথী পেলেই হোল সাথে ; ৫২
এখন কি তুই বুঝবি, ওরে মূঢ় !
সে সব যত প্রাণের কথা গূঢ় ?

(৭)

—হায়, যাদু, সকল দুঃখের বাড়া দুঃখ এই
নিজের দুঃখ বুঝতেও না-পারা, ৫৬
সেই দুঃখে দুঃখী তুই—ওরে মাতৃহারা!
তাই রে তোরে দেখে এমন ভূমিতলে একা অসহায়,
ওরে আমার হৃদয় ফেটে যায়!
ওরে আমার চক্ষে বহে ধারা, ৬০
—ওরে মাতৃহারা!

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

৬৪

সুখ-মৃত্যু

মরিবার ইচ্ছা নাহি, সত্য, না মরিতে চাহি;
তথাপি মরিতে হবে—সৃষ্টির নিয়ম!
জন্মিলে মরিতে হয়, তবে কেন এই ভয়?
এই শঙ্কা, এই দ্বিধা?—ভ্রম, ভ্রম, ভ্রম! ৪
মরিয়াছে পিতৃগণ; মরিয়াছে সর্ব্বজন—
বুদ্ধ ও বিক্রমাদিত্য—পুণ্যাত্মা, মহৎ;
আমি কি সামান্য তুচ্ছ?— গেল দেশ কত উচ্চ—
গ্রীস, আসীরিয়া, রোম, মিসর, ভারত! ৮

কালের প্রবাহে, কত জল-বুদ্‌বুদের মত,
উঠি নব জীব জাতি অদ্য অধোগামী !
এ পৃথিবী লুপ্ত হবে ; ওই সূর্য্য গুপ্ত হবে ;
আমার মরিতে ভয়—তুচ্ছ জীব আমি ? ১২

না, মরণে শঙ্কা নাই, আমি ত প্রস্তুত, ভাই !
যাঁ'দের ছাড়িয়া শেষে যাব এই ভবে,
তারাও আসিছে পিছে, কার জন্য শোক মিছে ?
পরে যাহা আছে, আছে ; ভাবিয়া কি হবে ? ১৬
আর যদি, পরমেশ ! এ জগতে এই শেষ,
এই ক্ষুদ্র জীবনের মৃত্যুই অবধি ;
যদি নাই পরলোক— তবে কে করিবে শোক,
মৃত্যুর অপর পারে আমি নাই যদি ? ২০
আর যদি আমি থাকি, তাহাতেই দুঃখ বা কি ?—
মৃত্যু যদি সুখশূন্য, মৃত্যু দুঃখহীন !
বিনা সুখ-দুঃখভার একাকার, নির্ব্বিকার,
নির্ভয়ে হইয়া যাব পরব্রহ্মে লীন। ২৪

তবে এক সাধ আছে— মরিব যখন, কাছে
রহে যেন ঘেরি প্রিয়া, পুত্র-কন্যাগণ ;
আর, বন্ধু যদি কেহ, করে ভক্তি, করে স্নেহ,
রহে যেন কাছে সেই প্রিয় বন্ধুজন। ২৮

খুলে দিও দ্বার !—ভেসে। পড়ে যেন মুখে এসে
নির্ম্মুক্ত বাতাস, আর আকাশের আলো ;
দেখি যেন শ্যাম ধরা শস্যভরা, পুষ্পভরা,
এতদিন যাহাদিগে বাসিয়াছি ভালো। ৩২
আসে যদি মৃদুমন্দ পবনে চামেলি-গন্ধ,
একবার বসন্তের পিকবর গাহে,
হয় যদি জ্যোৎস্না-রাত্রি,— আমিও পারের যাত্রী
যাইব পরম সুখে জ্যোৎস্নায় মিলায়ে ! ৩৬

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

৬৫

তা' সে হবে কেন !

(১)

তোমরা—দেশোদ্ধারটা কর্ত্তে চাও কি করে' মুখে বড়াই ?
—তা' সে হবে কেন !
তোমরা—বাক্যবাণে শুধু ফতে কর্ত্তে চাও কি লড়াই ?
—তা' সে হবে কেন ! ৪
তোমরা—ইংরাজ-গৌরবে ক্ষুব্ধ বলে' চাও কি যে, সে
তোমাদের ও করপদ্মে দেশটা সঁপে, শেষে
তল্পিতল্পা বেঁধে, নিজের চলে যাবে দেশে ? ৮
—তা' সে হবে কেন !

(২)

তোমরা—হিন্দু-ধর্ম্ম "প্রচার" কোরেই, হতে চাও যে ধন্য,
—তা' সে হ'বে কেন !
তোমরা—মূর্খ হ'য়ে হ'তে চাও যে বিশ্বে অগ্রগণ্য !
তোমরা—বোঝাতে চাও হিন্দুধর্ম্মের অতি সূক্ষ্ম মর্ম্ম— ১২
'ভীরুতাটা আধ্যাত্মিক, আর কুড়েমিটা ধর্ম্ম !'
অম্‌নি তাই সব বুঝে যাবে যত শ্বেতচর্ম্ম ?
—তা' সে হ'বে কেন !

(৩)

তোমরা—সাবেকভাবে সমাজটিকে রাখ্‌তে চাও যে খাড়া, ১৬
—তা' সে হ'বে কেন !
তোমরা—স্রোতটাকে ফিরাতে চাও যে দিয়ে মুখের তাড়া,
—তা' সে হ'বে কেন !
তোমরা—বিপ্র হয়ে ভৃত্য-কার্য্য করে' বাড়ী ফিরে, ২০
শাস্ত্র ভুলে, রেখে শুধু আর্কফলা শিরে—
দলাদলি করে' শুধু রাখ্‌বে সমাজটিরে ?
—তা' সে হ'বে কেন !

(৪)

তোমরা—চিরকালটা নারীগণে রাখ্‌বে পাঁচিল ঘিরে', ২৪
—তা' সে হবে' কেন !
তোমরা—গহনা ঘুষ্‌ দিয়ে বশে রাখ্‌বে রমণীরে ?
—তা' সে হ'বে কেন !

তোমরা—চাও যে তা'রা বদ্ধ থাকুক, এখন যেমন আছে, ২৮
রান্নাঘরের ধোঁয়ায় এবং আঁস্তাকুড়ের কাছে ;
এবং তোমরা নিজে যা'বে থিয়েটারে, নাচে ?
—তা' সে হ'বে কেন !

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

৬৬

কাঁঠালী চাপা

গড়নে গহনা বটে, রঙেতে সবুজ,—
ফুলের সবর্ণ নহ, বর্ণচোরা চাঁপা।
বৃথা তব গন্ধভারে গর্ব্বভরে কাঁপা,
ফিরেও চাহে না তোমা নয়ন অবুঝ ॥ ৪

নেত্রধর্ম্ম—খুঁজে ফেরা গোলাপ, অম্বুজ ;
উপেক্ষিতা আছ তুমি, হয়ে পাতা-চাপা।
তোমার কাঁঠালী-গন্ধ নাহি রহে ছাপা,—
ছুটে আসে, ভেদ করি' পাতার গম্বুজ ॥ ৮

ঠিক ক'রে হও নাই পাতা কিম্বা ফুল,—
দু'মনা করাই তব দুর্গতির মূল।

পত্রের নিয়েছ বর্ণ, ফল হতে গন্ধ,
আকৃতি ফুলের কাছে করিয়াছ ধার, ১২
সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়-লোভে হয়ে অন্ধ,—
স্বধর্ম্ম হারিয়ে হোলে সর্ব্বজাতি-বা'র।

—প্রমথ চৌধুরী

৬৭

বর্ষায়

গ্রামে ঢোকে জল, গাঙে নামে ঢল্,
আকাশের কোলে কোমল কাজল,
এসেছে বরষা—বড় চঞ্চল
বড় দুরন্ত মেয়ে ! ৪
ডুবে গেছে মাঠ, গঞ্জের ঘাট,
অশথের তলে বসে নাক' হাট,
সারা দিনরাত বৃষ্টির ছাঁট
ঝরিতেছে একঘেয়ে। ৮
ভাসিল পুকুর, আউসের ভুঁই,
পালায় কাত্‌লা কালবোস্ রুই,
আঙিনায় জল করে ছলছল,
কই যায় কাণে হেঁটে। ১২
কাঁটালি-চাঁপার তীব্র সুবাস
মাতাল করেছে বাদল-বাতাস ;
গাছভরা জাম সুচিকণ শ্যাম
রসে পড়ে যেন ফেটে ! ১৬
ভিজে ভিজে নীড় বুনিছে বাবুই,
ঝাপটে ঝটিকা ছুটিছে হাউই—
চলে' গেছে চিল, গগনের নীল
গলে' গেছে জল-ধারে। ২০

রাঙা আঁখি মেলি' আনারস-রাজ
পরিয়াছে শিরে মরকত-তাজ ;
নেবুর কুঞ্জে মধুর গন্ধ
চন্দন-দীঘি-পারে ! ২৪

—করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

৬৮

বাসনা *

ছুট্‌ব আমি সরল প্রাণে
পর্ণ-কুটীর হ'তে,
ধান-নাচানো মাঠের হাওয়ায়
ছুট্‌ব আলিপথে। ৪
বনের মাথায় আঁধার ফুঁড়ে,
শুকতারাটি জাগ্‌বে দূরে,
কান জুড়াবে পাখীর গানে
সুরের মিঠে স্রোতে। ৮

এলিয়ে দেব নগ্ন বাহু
গাঙের রাঙা জলে,
ঝাঁপিয়ে পড়ে' উজান যাব
ঢেউয়ের টলমলে ; ১২

তুচ্ছ করে' জোয়ার ভাঁটা,
এপার ওপার সাঁতার-কাটা,
নাচ্‌বে আলো জলের বুকে
নীল আকাশের তলে। ১৬

বুক ফুলায়ে হাল ধরিব,
পাল তুলিব না'য়ে,
মাঝ্‌-গঙ্গায় জাল ফেলিব
উদাস আদুল গায়ে ; ২০
গাঙ্‌চীলেরা ঝাঁকে ঝাঁকে
উড়্‌বে ভাঙা পাড়ের বাঁকে,
ডাক্‌বে চাতক 'ফটিক জল'
মেঘের ছায়ে ছায়ে। ২৪

বর্ষা যখন ছড়িয়ে দেবে
মোতির 'সাত-নরী',
কদম-কেশর শিউরে উঠে'
পড়্‌বে ঝরি' ঝরি'। ২৮
মাঠের কোণে যাবে দেখা
বৃষ্টি-ধারার 'চিকে' ঢাকা
কেয়াঝাড়ের মাথার 'পরে
নারিকেলের সারি। ৩২

শিল কুড়িয়ে বাঁধ্‌ব 'মোয়া',
লাঙল দেব ভূঁয়ে,
কড়্ কড়্ কড়্ ডাক্‌বে দেয়া',
আস্‌ব আমন রুয়ে'। ৩৬
আকাশ-ভাঙা মুষল-ধার,
বাঁশের ঝাড়ে কি তোলপাড় !
পাকুড় তেঁতুল ঝাউয়ের ঝাড়
পড়্‌বে নুয়ে' নুয়ে' ! ৪০

অবাক্ হয়ে' দাওয়ায় বসে'
দেখ্‌ব দুপুর বেলা,
পরিষ্কার ওই আকাশ-আলোয়
পাখীর সাঁতার-খেলা ; ৪৪
কাঠঠোক্‌রা ঠোঁটের ঘায়ে,
গাছের হেলা' গুঁড়ির গায়ে
সুড়ঙ্গটি কর্‌ছে গভীর—
পাখায় রঙের মেলা। ৪৮

কামার-শালে বস্‌ব গিয়ে
রৌদ্র এলে পড়ি',
কয়লাগুলো রাঙিয়ে দিয়ে
টান্‌ব যাঁতার দড়ি ; ৫২

ঝুলের কাছে জম্‌বে ধোঁয়া,
কাঁপিয়ে ‘নেয়াই’ পিট্‌ব লোহা,
ছিটিয়ে দেব আগুন-যূঁই—
আলোর ছড়াছড়ি ! ৫৬

শুন্‌তে যাব ভারত-কথা,
রামায়ণের গান,
সীতার দুখে চোখের জলে
গল্‌বে মনঃপ্রাণ ; ৬০
বনবাসের করুণ কথা
শুন্‌তে বুকে বাজ্‌বে ব্যথা,
ফির্‌ব ঘরে দুঃখভরে
ক্ষুব্ধ ম্রিয়মাণ । ৬৪

মেয়েটি মোর আগ্‌-বাড়ায়ে
দাঁড়িয়ে রবে দ্বারে,
দোপাটি-ফুল খোঁপায় পরে’
সাঁজের আঁধিয়ারে ; ৬৮
কাজল-দেওয়া চক্ষু দু’টি
আদর-দোলে উঠ্‌বে ফুটি’
‘ফণী-মন্‌সা’র বেড়ায়-ঘেরা
‘দুর্গা-দীঘি’র ধারে । ৭২

সারাদিনের শ্রান্তিভরা
শিথিল আঁখির পাতে
স্বপ্নহারা ঘুমের আরাম
ভোগ করিব রাতে। ৭৬
না ফুটিতেই ঊষার আঁখি,
না ডাকিতেই ভোরের পাখী,
ঝঙ্কারিব 'জয় জগদীশ'
প্রাণের 'একতারা'তে। ৮০

—করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

৬৯

ওয়াল্‌টেয়ারে

সাম্‌নে হেরি সুনীল বারি
তালীবনের ফাঁকে,
গেরুয়া-রঙ্‌ ভাঙা মাটি
ঢালু পথের বাঁকে। ৪
ঝর্ণা-ঝালর পড়্‌ছে ঝরি'
শ্যামল তরু-পর্ণ 'পরি,
আলোক-লতা অলক-জালে
কালো পাথর ঢাকে। ৮

নীল-লহরীর মাথায় অথির
ফেনার যূথীরাশি
দেয় গো চুমা লাল বালিতে—
দেখ্‌রে হেথায় আসি' ; ১২
বুলিয়ে তূলি গিরির গায়ে
ঘোর বেগুনী-রঙ্‌ ফলায়ে
সাগর-ধোয়া রবির করে
ঝর্‌ছে তরল হাসি ! ১৬

পুরাণো কোন্ গানের কলি
ঢেউয়ের কলস্বরে
জলের দোলায় ঘুমিয়ে পড়ে
ধূসর শিলার 'পরে— ২০
দূর-প্রসারী লবণ-বারি,
ভাস্‌ছে সাগর-মরাল-সারি,
গাহন করে পাষাণ-করী—
শীকর-ঝারি ঝরে। ২৪

কবে গো রাম রঘুমণি
হারিয়ে জানকীরে
আলাভোলা এলেন হেথায়
রত্নাকরের তীরে ? ২৮

যে দিকে হায় ফিরান নয়ন,
ভূধর, সলিল, আকাশ, কানন—
বিরস মলিন সব সুষমা,
অমা-তিমির ঘিরে ! ৩২

এখনো এই মধুর ভূমে
সুদূর বিধুরতা
গোপন আছে সাগর-সুরে,
করুণ সে বারতা। ৩৬
উলঙ্গ ওই তামিল-বালক
কুড়ায় রঙীন পাখীর পালক,
চাপিনু তায় বুকের মাঝে—
কইনু নীরব কথা। ৪০

এ জন্মে আর হয় তো কভু
হবে না মোর আসা,
থুয়ে গেলাম পাথর ফুঁড়ে
আমার ভালবাসা— ৪৪
তরু-বাকল-পরগাছায়
বাসনা মোর ঘুর্‌বে হেথায়,
ঊষার সরম-অরুণিমায়
মিট্‌বে প্রাণের আশা। ৪৮

—করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বপ্ন-দেশে *

আজ ফাগুনী-চাঁদের জোছনা-জুয়ারে
ভুবন ভাসিয়া যায়,
ওরে স্বপনদেশের পরী-বিহঙ্গী,
পাখা মেলে' উড়ে' আয় ! ৪
এই শ্যামল কোমল ঘাসে,
এই বিকচ কুন্দরাশে,
এই বনমল্লিকা-বাসে,
এই ফুর্‌ফুরে মলয়ায়— ৮
তোর তারালোক হ'তে কিরণ-সূতায়
ধীরে ধীরে নেমে আয় !

দেখ্, ঘাসের ডাঁটায় ফড়িং ঘুমায়
সবুজ-স্বপন-সুখে, ১২
দেখ্, পদ্মকোরকে অচেতন অলি
শেষ মধুকণা মুখে !
হেথা ঝিঁঝির ঝিঁঝিট-তান,
দেখ্, নিশিশেষে অবসান, ১৬
ছোট টুন্‌টুনিদের গান
এবে বিরত ক্লান্ত বুকে—

দেখ্,　মোহ-মূর্চ্ছিত মুখর ধরণী,
　　সব ধ্বনি গেছে চুকে ! ২০

তোরে　শিরীষফুলের পাপ্‌ড়ি খসায়ে
　　পরাগ করিব দান,
তোরে　রজনীগন্ধা-গেলাস ভরিয়া
　　অমিয়া করাব পান। ২৪
শেষে　ঘুম যদি তোর পায়,
হোথা　ঘুমাবি হিন্দোলায়,
মোরা　মৃদু দোল দিব তায়
　　গাহি' মৃদু-গুঞ্জন গান— ২৮
চারু　ঊর্ণনাভের ঝিকিমিকি জালে
　　কেশরের উপাধান।

শেষে　জোনাকীর আলো নিভাবে যখন
　　ঊষার কুয়াশাসারে, ৩২
মোরা　স্বপন-শয়ন ভাঙি' দিব তোর
　　পাপিয়ার ঝঙ্কারে।
যদি　ফিরে' যেতে মন চায়,
যাস্　ঝিরি-ঝিরি ঊষা-বায়,
সাথে　নিয়ে যাস্ এই রজনীর স্মৃতি
　　ধরণীর পরপারে।

—যতীন্দ্রমোহন বাগচী

৭১

অন্ধ বধূ

পায়ের তলায় নরম ঠেক্‌ল কি ?
আস্তে একটু চল্‌ না, ঠাকুর-ঝি—
ওমা, এযে ঝরা-বকুল ! নয় ?
তাইত বলি, বসে' দোরের পাশে, ৪
রাত্তিরে কাল—মধুমদির বাসে,
আকাশ-পাতাল—কতই মনে হয় !

জ্যৈষ্ঠ আসতে ক'দিন দেরী, ভাই,—
আমের গায়ে বরণ দেখা যায় ? ৮

—অনেক দেরী ? কেমন করে' হবে !
কোকিল-ডাকা শুনেছি সেই কবে,
দখিন হাওয়া—বন্ধ কবে, ভাই !
দীঘির ঘাটে নতুন সিঁড়ি জাগে— ১২
শেওলা-পিছল—এম্‌নি শঙ্কা লাগে,
পা-পিছ্‌লিয়ে তলিয়ে যদি যাই !

মন্দ নেহাৎ হয় না কিন্তু তায়—
অন্ধ-চোখের দ্বন্দ্ব চুকে' যায় ! ১৬

কত লোকেই যায় ত' পরবাসে—
কাল-বোশেখে কে না বাড়ী আসে ?
 চৈতালি-কাজ কবে যে সেই শেষ !
পাড়ার মানুষ ফিরল সবাই ঘর, ২০
তোমার ভায়ের সবই স্বতন্তর—
 ফিরে'-আসার নাই কোন উদ্দেশ !

—ঐ যে হেথায় ঘরের কাঁটা আছে,
ফিরে' আস্‌তে হবে ত তার কাছে ! ২৪

এবার এলে, হাতটি দিয়ে গায়ে
অন্ধ আঁখি বুলিয়ে বারেক পায়ে—
 বন্ধ-চোখের অশ্রু রুধি' পাতায়,
জন্ম-দুখীর দীর্ঘ-আয়ু দিয়ে ২৮
চিরবিদায় ভিক্ষা যাব নিয়ে—
 সকল বালাই বহি' আপন মাথায় !—

দেখিস্‌ তখন, কাণার জন্য আর
কষ্ট কিছু হয় না যেন তাঁর। ৩২

তার পরে—এই শেওলা-দীঘির ধার—
সঙ্গে আস্‌তে বল্‌বনাক আর,

শেষের পথে কিসের বল’ ভয় ?
এইখানে এই বেতের বনের ধারে, ৩৬
ডাহুক-ডাকা সন্ধ্যা-অন্ধকারে—
সবার সঙ্গে সাঙ্গ পরিচয় !

শেওলা-দীঘির শীতল অতল নীরে—
মায়ের কোলটি পাই যেন ভাই ফিরে’ ! ৪০

—যতীন্দ্রমোহন বাগচী

৭২

চাষার ঘরে

প্রভাত হইতে ভদ্র-পাড়ায় ঘুরে’ ঘুরে’ সারা বেলা,
হজম করিয়া হরেক-রকম ভদ্র-আনার ঠেলা—
মুখোস-পরানো মোলাম মিথ্যা, বিনীত অহঙ্কার,
গরিবের ’পরে সহৃদয় ঘৃণা, ভণ্ডামি করুণার,— ৪
সন্ধ্যাবেলায় শূন্য জঠরে এলাম রে তোর দ্বারে,
ওরে চাষা, তোর আগড়টা খোল্, ঠাঁই দে দাওয়ার ধারে।
তোরি ঘরে আজ রাতটা কাটাব, ক’য়ে দুটো সোজা কথা ;
ঠিক জানি, তুই চিরদুখী-বুকে বুঝিবি আমার ব্যথা ; ৮
না যদি বুঝিস্, তাও তো বুঝিব, রহিবে না কোন গোল,
নহে সে মিথ্যা মাথা-নাড়া শুধু—ভদ্র-আনার ভোল !

থাক্ থাক্ ভাই, ব্যস্ত হোস্‌নে, কাঁথাতেই হবে বেশ,
খড়ের বুঁদীটা ওই তো রয়েছে, ঘুম পেলে দেব ঠেস্। ১২
এই শীতে আর পা-ধোবার জলে কোন দরকার নাই ;
থাক্ রে পাগ্‌লা, হয়েছে প্রণাম, বোস্ দেখি কাছে, ভাই !
—খাবার যোগাড়—এখনি কি তার ? হোক্ না খানিক রাত,
হ্যাঁ হ্যাঁ তাই হবে, তোর ঘরে খেলে যাবেনাকো
আর জাত ! ১৬

—দাঁড়িয়ে কেরে ও ? তোরি ছেলে নাকি ?
মদ্‌না না ওর নাম ?
তোরি মত দেখি যোয়ান হয়েছে ! করে তো রে কাজ-কাম ?
ক্ষেতের কর্ম্মে ভারি দড় নাকি ! আহা ! ভারি খুসী শুনে'—
কি বল্লি ?—এই কুড়িতে পড়িবে সাম্‌নের ফাল্গুনে ! ২০

সারাদিন ভাই, কিছু খাই নাই—সত্যি কথাই বলি,
বড়লোক যারা—খেতে বলে কেউ ? মিছে এত বড় হ'লি !
চা ও খানদুই বিস্‌কুট্ নামে সঙ্গে তাহারি চাট্—
তাই দিয়ে বটে রাখে কেউ-কেউ ভদ্র-আনার ঠাট্ ! ২৪
বাজে কথা যাক্ ;—ক'বিঘা চোতেলি করেছিস্ এই সন্ ?
পাটে কত পেলি, নয়ালির ধান ঘরে এল ক' কাহন ?
মহাজন-দেনা-রাজার খাজনা—হয়েছে তো সব শোধ ?
বেশ বেশ ভাই, বড় খুসী তোর দেখে' বিবেচনা-বোধ ! ২৮

ওরে ও মদ্‌না, একটা কল্‌কে তাম্‌াক পারিস্‌ দিতে ?
—দিয়েছিস্‌ নাকি ! এ যে দেখি তুই বাপেরেও
গেলি জিতে' !

ছ্যাখ্‌, মানুষের কষ্ট থাকে না, হয় যদি লোক খাঁটি,
সোনার ফসল ফলায় যখন পায়ের তলার মাটি ! ৩২
মাটির-ই যদি না এ-হেন মূল্য, মানুষের দাম নাই ?
এই সংসারে এই সোজা কথা সব-আগে বোঝা চাই।
বিশ্বপিতার মহা-কারবার এই দিন্‌-দুনিয়াটা,
মানুষ-ই তাঁহার মহা-মূলধন, কর্ম্ম তাহার খাটা ; ৩৬
তাঁরি নাম নিয়ে খাটিবে যে জন, অন্ন তো তোর মুখে,—
বিধাতার সেই সাচ্চা বাচ্চা কখনো পড়েনা দুখে।
তবে যে হেথায় দেখিবারে পাই গরিবের দুর্গতি,
অর্থ তাহার—চেনে না সে তার শক্তির সংহতি। ৪০

পায়ের তলার ধূলা—সেও, যদি কেউ পদাঘাত করে,
নিমেষে তাহার প্রতিশোধ লয় চড়ি' তার শিরোপরে।
মানুষ কি সেই ধূলি চেয়ে হীন, সহিবে যে অপমান ?
আত্মার সেই মহাদুর্গতি নহে দেবতার দান ! ৪৪
নাই ভগবান, নাইক ধর্ম্ম যাদের শিক্ষামূলে,
ছিন্নমস্তা শিক্ষা সে শুধু শয়তানি ইস্কুলে !—
দূর করি' সেই ঝুটো সভ্যতা যত ফুঁকো শিক্ষার,
দূর করি' সেই ভেক্‌-নেওয়া যত অপমান ভিক্ষার, ৪৮

আপনার মত আপন শিক্ষা নিজে নিতে হবে জিনে',
মুক্তির পথ মিলিবে তবে তো দেশজোড়া দুর্দ্দিনে।

ডাকিছে শেয়াল, রাত্রি দুপুর হ'ল বুঝি এইবার ;
খাটুনির দেহ, এইবার ভাই বিশ্রাম দরকার। ৫২
সৌরভ যেন পাই বা কিসের—চিঁড়ে-কোটা বুঝি হয় !
ঢেকির শব্দ—তাই ত রে ঠিক ! সমস্ত বাড়ীময়
নূতন ধানের মধুর গন্ধ মাতায়ে তুলিছে মন—
আর কি চাইরে ? কোন আয়োজনে নাই কিছু প্রয়োজন। ৫৬
অতখানি দুধ !—কি হবেরে ভাই ? খানিকটা রাখ্ তুলে',
হজম-ই হয় না খাঁটি দুধ, সে যে বহুদিন গেছি ভুলে'।
এখো-গুড় নাকি ! বাড়ীতে হয়েছে ? তিন মণ দশ সের !
সবি ত বাড়ীর ! হায়, এ কি দান গরিব গৃহস্থের ! ৬০

—যতীন্দ্রমোহন বাগচী

৭৩

ঝর্ণা *

ঝর্ণা! ঝর্ণা! সুন্দরী ঝর্ণা!
তরলিত চন্দ্রিকা! চন্দন-বর্ণা!
অঞ্চল সিঞ্চিত গৈরিকে স্বর্ণে,
গিরি-মল্লিকা দোলে কুন্তলে কর্ণে, ৪
তনু ভরি' যৌবন, তাপসী অপর্ণা!
ঝর্ণা!

পাষাণের স্নেহধারা! তুষারের বিন্দু!
ডাকে তোরে চিত-লোল উতরোল সিন্ধু। ৮
মেঘ হানে জুঁইফুলী বৃষ্টি ও-অঙ্গে,
চুমা-চুমকীর হারে চাঁদ ঘেরে রঙ্গে,
ধূলা-ভরা দ্যায় ধরা তোর লাগি ধর্ণা!
ঝর্ণা! ১২

এস তৃষ্ণার দেশে এস কলহাস্যে—
গিরি-দরী-বিহারিণী হরিণীর লাস্যে।
ধূসরের ঊষরের কর তুমি অন্ত,
শ্যামলিয়া ও-পরশে কর গো শ্রীমন্ত; ১৬
ভরা ঘট এস নিয়ে ভরসার ভর্ণা,
ঝর্ণা!

শৈলের পৈঠায় এস তনুগাত্রী !
পাহাড়ের বুক-চেরা এস প্রেমদাত্রী ! ২০
পান্নার অঞ্জলি দিতে দিতে আয় গো,
হরিচরণ-চ্যুতা গঙ্গার প্রায় গো,
স্বর্গের সুধা আনো মর্ত্ত্যে সুপর্ণা !
ঝর্ণা ! ২৪

মঞ্জুল ও-হাসির বেলোয়ারি আওয়াজে
ওলো চঞ্চলা ! তোর পথ হ'ল ছাওয়া যে !
মোতিয়া-মতির কুঁড়ি মূরছে ও-অলকে,
মেখলায়, মরি মরি, রামধনু ঝলকে ! ২৮
তুমি স্বপ্নের সখী বিদ্যুৎপর্ণা !
ঝর্ণা !

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

৭৪

চার্ব্বাক ও মঞ্জুভাষা

বনপথে চলেছে চার্ব্বাক,
সূর্য্যতাপে স্পন্দিত সে বন ;
ক্লান্ত আঁখি, চিন্তিত, নির্ব্বাক,
বিনা কাজে ফিরিছে ভুবন। ৪

হ্রদের দক্ষিণ কূলে ভিড়ি'
শ্যাম-লেখা শোভিছে শৈবাল,
মরালীর পক্ষে চঞ্চু রাখি'
আঁখি মুদে চলেছে মরাল। ৮

তীরে তীরে ঘন সারি দিয়ে
দেবদারু গড়েছে প্রাচীর,
বনস্থলী-মধুচক্র ভরি'
রশ্মি-মধু ঝরিছে মদির। ১২

চলিয়াছে চার্ব্বাক কিশোর,
ভ্রূকুঞ্চিত, দৃঢ় ওষ্ঠাধর ;
শিশিরের পদ্মকলিসম
রুদ্ধ প্রাণে দ্বন্দ্ব নিরন্তর। ১৬

"কে বলে বিধাতা আছে, হায়,
কে বলে সে জগতের পিতা,
পিতা কবে সন্তানে কাঁদায়,—
ক্ষুধায় কাঁদিলে দেয় তিতা! ২০

"পিতা যদি সর্ব্বশক্তিমান
পুত্র কেন তাপের অধীন ?
পিতা যদি দয়ার নিধান
পুত্র কেন কাঁদে চিরদিন ? ২৪

"বালকের অ-খল হৃদয়ে
আমিও করেছি আরাধন,
ধ্রুব কি প্রহ্লাদ বুঝি কভু
জানে নাই ভকতি তেমন! ২৮

"ফল তার ?—পদে পদে বাধা
আজনম,—বুঝি আমরণ!
মরণের পরে কিবা আর ?
নাহি—নাহি—নাহি কোন জন।" ৩২

অকস্মাৎ চাহিল চার্ব্বাক—
পশ্চিমে পড়েছে হেলে রবি,
রশ্মি-রসে ডুবু-ডুবু বন,
আবির্ভূতা বনে বনদেবী! ৩৬

মঞ্জুভাষা, রূপে বনদেবী,
শিরে ধরি' পাষাণ কলস,
আসে ধীরে আশ্রম-বাহিরে,
গতি ধীর-মন্থর, অলস। ৪০

পর্ণরাশি-মর্ম্মর-মঞ্জীর
পদতলে মরিছে গুঞ্জরি';
অযতনে কুন্তলে বল্কলে
লগ্ন তার নীবার-মঞ্জরী। ৪৪

লতিকার তন্তু সে অলক,
মঙ্গল-প্রদীপ আঁখি তার;
পরিপূর সংযত পুলকে
কপোল সে পুষ্প মহুয়ার। ৪৮

ওষ্ঠে তার জাগ্রত কৌতুক,
অধরেতে সুপ্ত অভিমান;
বাহু-লতা চন্দনের শাখা,
বর্ণ তার চন্দ্রিকা সমান। ৫২

চাহিয়া সহসা বালা ডাকিল চার্ব্বাকে—
"ওগো! শোনো শোনো!
শুনিনু এনেছ তুমি মৃগ-শিশু এক,
আছে কি এখনো?" ৫৬

মন-ভুলে চেয়েছিল মুখপানে তার
বিস্ময়ে চার্ব্বাক,
নীরব হইল বালা ; কি দিবে উত্তর ?
বিষম বিপাক ! ৬০

কহে শেষে ক্ষীণ হেসে গদ্গদ বচন—
"সুন্দর হরিণ,
চিত্রিত শরীর তার সোনার বরণ ;—
যেয়ো একদিন ! ৬৪

আজ যাবে ?"—মুখ চেয়ে জিজ্ঞাসে চার্ব্বাক
ভরসা ও ভয়ে ;
মঞ্জুভাষা কহে, "না, না, আজ ?—আজ থাক্ !"
—আধেক বিস্ময়ে ! ৬৮

সহসা সংবরি' আপনায়,
কহে বালা চাহি মুখপানে,
"শুনিনু মা-হারা মৃগ-শিশু,
মৃত মৃগী কিরাতের বাণে ; ৭২
ইচ্ছা করে পালিতে তাহায়,—
শিশু সে যে মা-হারা হরিণ !
পড় তুমি,—অবসর না থাকে তোমার,—
বলিলে পালিতে পারি আমি সারাদিন। ৭৬

বল, আমি মা হ'ব তাহার।"
"তাই হোক্" কহিল চার্ব্বাক,
"আমার স্নেহের ধনে তব স্নেহ-ধার
দিয়ো তুমি।" কহি' যুবা হইল নির্ব্বাক্। ৮০

কৌতুকে চাহিয়া মুখপানে
মঞ্জুভাষা মঞ্জুলীলাভরে
চ'লে গেল মরাল-গমনে
জল নিতে ক্রৌঞ্চ-সরোবরে। ৮৪

আশার বাতাসে করি ভর
ফিরে এল চার্ব্বাক কুটীরে,
ভাষাহীন আশার আবেশে
সুখভরে চুমে মৃগটিরে। ৮৮

"এ আনন্দ কে দিলে আমায় ?—
আশা-সুখে মন পরিপূর !
এতদিন চিনি নি তোমায় ;
আজ বটে দয়ার ঠাকুর !" ৯২

রাত্রি এল ; শয্যাতলে জাগিয়া চার্ব্বাক,
আশা-সুখে ধন্য মানে জন্ম আপনার ;
নির্গুণ মহেশে যেই করিয়াছে হেলা,
আনন্দ-মূর্ত্তিতে হিয়া পূর্ণ আজি তার ! ৯৬

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

৭৫

ছিন্ন মুকুল

সব-চেয়ে যে ছোট পীঁড়িখানি
সেইখানি আর কেউ রাখে না পেতে,
ছোটো থালায় হয় নাকো ভাত বাড়া,
জল ভরে না ছোট্ট গেলাসেতে ; ৪
বাড়ীর মধ্যে সব-চেয়ে যে ছোটো
খাবার বেলায় কেউ ডাকে না তাকে,
সব-চেয়ে যে শেষে এসেছিল
তারি খাওয়া ঘুচেছে সব-আগে। ৮

সব-চেয়ে যে অল্পে ছিল খুসী,
খুসী ছিল ঘেঁষাঘেঁষির ঘরে,
সেই গেছে, হায়, হাওয়ার সঙ্গে মিশে
দিয়ে গেছে জায়গা খালি ক'রে ! ১২
ছেড়ে গেছে পুতুল, পুঁতির মালা,
ছেড়ে গেছে মায়ের কোলের দাবি ;
ভয়-তরাসে ছিল যে সব-চেয়ে
সেই খুলেছে আঁধার ঘরের চাবি ! ১৬

চ'লে গেছে একলা চুপে চুপে,—
দিনের আলো গেছে আঁধার ক'রে ;
যাবার বেলা টের পেলে না কেহ,
পারলে না কেউ রাখ্‌তে তারে ধ'রে। ২০
চ'লে গেল,—পড়্‌তে চোখের পাতা,—
বিসর্জ্জনের বাজ্‌না শুনে বুঝি !
হারিয়ে গেল—অজানাদের ভিড়ে,
হারিয়ে গেল,—পেলাম না আর খুঁজি'। ২৪

হারিয়ে গেছে—হারিয়ে গেছে, ওরে !
হারিয়ে গেছে বোল্‌-বলা সেই বাঁশী,
হারিয়ে গেছে কচি সে মুখখানি,
দুধে-ধোয়া কচি দাঁতের হাসি। ২৮
আঁচল খুলে হঠাৎ স্রোতের জলে
ভেসে গেছে শিউলি ফুলের রাশি ;
ঢুকেছে হায় শ্মশান ঘরের মাঝে,
ঘর ছেড়ে তাই হৃদয় শ্মশান-বাসী। ৩২

সব-চেয়ে যে ছোটো কাপড়গুলি,
সে গুলি কেউ দেয় না মেলে ছাদে ;
যে শয্যাটি সবার চেয়ে ছোট
আজ্‌কে সেটি শূন্য প'ড়ে কাঁদে। ৩৬

সব-চেয়ে যে শেষে এসেছিল
সেই গিয়েছে সবার আগে স'রে,
ছোট্ট যে জন ছিল রে সব-চেয়ে
সেই দিয়েছে সকল শূন্য ক'রে ! ৪০

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

৭৬

বর-ভিক্ষা *

(জাপানী কবিতা)

চিত্তহারিণী জাপানী বালিকা
ওহারু তাহার নাম,
বুকে তার চেরী-ফুলের স্তবক
রক্তিম অভিরাম ! ৪
জানু পাতি' বালা পতি-বর মাগে
প্রজাপতি-মন্দিরে ;
থরে থরে ফুটে চন্দ্রমল্লি
ওহারুর তনু ঘিরে। ৮

"দাও, প্রজাপতি ! দাও মোরে পতি,
দাও মোরে হেন বর,
গোপন সানুর মর্ম্মরসম
যার কণ্ঠের স্বর— ১২

সেই সানুদেশে চুপে চুপে পশে
বাসন্তী চাঁদ একা !”
ওহারুর বুকে চারু চেরী-ফুল,
চন্দ্রমল্লি লেখা ! ১৬

“দাও হেন স্বামী যে আমার পানে
চাহিবে সহজ সুখে,—
যে-চোখে শ্যামল প্রান্তর চায়
ঊষার অরুণ মুখে ! ২০
ভালবাসা যার কানন উদার—
পাখী-ডাকা, ছায়া-ঢাকা ।”—
ওহারুর বুকে চন্দ্রমল্লি
মুখে চেরী-ফুল আঁকা ! ২৪

“দাও হেন বর, হাসে ভাষে যার
প্রাণে সান্ত্বনা আসে,
কাব্য-ভুবনে জোছনার মত
রহিবে যে পাশে পাশে ; ২৮
স্নেহ হবে যার মধুর উদার
নিদাঘের শ্যাম-ছায়া ।”—
চন্দ্রমল্লি ওহারুর প্রাণে,
চেরী-চারু তার কায়া । ৩২

"দাও হেন পতি যাহার মূরতি
হৃদে অহরহ রয়,
জনমের আগে সাথী যে ছিল গো,
মরণে যে পর নয়,— ৩৬
জন্ম-তোরণে জন-অরণ্যে
হারায়ে ফেলেছে যায় !"
ওহারুর বুকে চন্দ্রমল্লি
চেরী-ফুল মূরছায়। ৪০

"দাও সে যুবকে আছে যার বুকে
অঙ্কিত মোর নাম,
যদিও বলিতে পারিনে এখন
কবে তাহা লিখিলাম ! ৪৪
কোন্ সে জনমে, কোন্ সে ভুবনে,
কোন্ বিস্মৃত যুগে !"—
চেরী-ফুল সনে চন্দ্রমল্লি
জাগে ওহারুর বুকে ! ৪৮

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

৭৭

যদি

(১)

যদি তুমি বশে রেখে দিতে পার
চঞ্চল তব চিত্তকে,
ন্যাস বলে যদি ভেবে নিতে পার
তুমি তব সব বিত্তকে, ৪
সন্তোষে যদি বহে' যেতে পার
হয়েছে যে ভার অর্পিত,
সম্পদে যদি বহিরন্তরে
নাহি হও তুমি গর্ব্বিত, ৮
প্রেমে আপনার করে' নিতে পার
যদি এ নীরস পৃথ্বীকে,
বিফলতা মাঝে বরে' নিতে পার
যদি চিরাগত সিদ্ধিকে ; ১২

(২)

সমভাবে যদি সহে' যেতে পার
তুমি সম্মান লাঞ্ছনা,
বঞ্চিত হয়ে যদি তুমি কভু
অপরে না কর বঞ্চনা, ১৬

ভোগে উন্মুখ, ত্যাগে উদ্‌গ্রীব,
সত্যেতে চির-বিশ্বাসী,
ধরণীর রস মধুপের মত
যদি নিতে পার নিঃশেষি', ২০
অভাবেও যদি ভাবের অলকা
গড়ে নিতে পার বক্ষেতে,
সুখের মাঝারে বিভুর লাগিয়া
যদি ধারা বহে চক্ষেতে ; ২৪

(৩)

না হয়ে ঘৃণিত ঘৃণা সহ যদি,
নিন্দা না কর নিন্দুকে,
বড় করে' যদি নিজ চোখে দেখ
নিজ ক্ষীণ দোষ-বিন্দুকে, ২৮
ছোট করে' যদি দেখ তুমি শুধু
আপন সুনাম সুখ্যাতি,
আপনার যদি করে' নিতে পার
অপরের ক্লেশ-দুঃখাদি, ৩২
মুক্ত গৃহেতে ঘুমাইতে পার
যদি বিদ্রোহ-বিগ্রহে,
বিবেকের বুকে জুড়াইতে পার
যদি অপমান-নিগ্রহে ; ৩৬

(৪)

অত্যাচারীকে বাধা দিতে পার
　　পাহাড়ের মত নির্ভয়ে,
আতুরের তুমি পান্থ-পাদপ—
　　যদি করুণার ক্ষীর বহে, ৪০
এক স্থরে যদি বেঁধে নিতে পার
　　ভাব ভাষা আর কর্ম্মকে,
ধরা হ'তে যদি বড় ক'রে তুমি,
　　দেখ মনে-প্রাণে ধর্ম্মকে ;— ৪৪
বুঝিবে তখন মানুষ হয়েছ,
　　ঝরিছে করুণা মস্তকে,
পরশ-মাণিক এসেছে সমুখে
　　পেতে দিও দুটি হস্তকে। ৪৮

—কুমুদরঞ্জন মল্লিক

৭৮

ভক্তির যুক্তি

শুভ ফাল্গুনে দেখা হ'ল মোর
এক কৃষকের সাথে,
পুলকে দেখিছে ক্ষেতের ফসল
হুঁকাটি লইয়া হাতে। ৪

দেখিয়া আমারে নোয়াইয়া মাথা
কহিল, ঠাকুর, শোনো—
তুমি পণ্ডিত, আমি ত মূর্খ,
জ্ঞান নাই মোর কোনো। ৮

পাড়ায় আজিকে তর্ক হয়েছে
একটা বিষয় নিয়ে,
এই দুনিয়ার মালিক যে জন—
পুরুষ বটে, কি মেয়ে? ১২

ধর্ম্মরাজের দেয়াসী মহেশ
বলিয়াছে জটা নাড়ি'—
ধরার কর্ত্তা জগদীশ্বর
হইতে পারে কি নারী? ১৬

আমি ত' অবাক! প্রসব করেছে
এই যে বিপুল ধরা
শ্যামা মা আমার, এ কথা জানে না—
মাথায় গোবর ভরা! ২০

জগত-জননী মা না হত যদি
দোপাটী পে'ত কি ফোঁটা?
গোলাপ পে'ত কি রাঙ্গা চেলী তার—
কদলী গরদ গোটা? ২৪

শিখী কোথা পেত ময়ূরকণ্ঠী,
রেশমী পোষাক টিয়া?
ঝুঁটি কোথা পেত ছোট বুলবুলি
—বাঁধা লাল-ফিতা দিয়া! ২৮

ছেলেমেয়েদের খেতে দিতে পারে,
পারে সে সোহাগ নিতে—
টিপ্ কাজলেতে সাজাইতে পারে,
—দেখিনি ত' হেন পিতে! ৩২

সুমুখেতে দেখ দুষ্টু বোল্‌তা
সোনালী ঘুন্সী-পরা,
বকের কামিজ কিবা ইস্তিরি,
যায় না ময়লা করা! ৩৬

ডোবার যে পানা—তাহারও পোষাক,
তাহাতেও ফুল-কাটা ;
ওর-ও গায়ে দেখ সবুজ দোলাই—
ওই যে খেজুর কাঁটা ! ৪০

ভূতলে গগনে গিরি নদী বনে
দেখুক চাহিয়া কেহ—
চারিদিক দিয়া গড়ায়ে পড়িছে
মায়ের গভীর স্নেহ ! ৪৪

তুমিই, ঠাকুর, কর মীমাংসা—
বলিল সে হাসিমুখে ;
আমি তার সেই কর্কশ কর
টানিয়া নিলাম বুকে। ৪৮

বলিলাম, জেনো—ধর্ম্মক্ষেত্র
এই সে তোমার মাঠ,
নীরবে হেথায় তুমিই করেছ
বুকের চণ্ডীপাঠ ! ৫২

—কুমুদরঞ্জন মল্লিক

৭৯

সমাপ্তি

ধূলোট হয়ে গেছে, ভাঙ্গিয়া গেছে মেলা,
পাতের ঠোঙা লয়ে' কাকেরা করে খেলা।
ভাসান হয়ে গেছে, বিজন পূজাবাড়ি,
জাগিছে উৎসব-স্মৃতিটি বুকে তারি। ৪
ফুরায়ে গেল ধীরে বিবাহ-উৎসব,
নীরব নহবৎ, নীরব হুলুরব।
যেতেছে পায়ে পায়ে মুছিয়া আলিপনা,
বিদায় লোকজন, বিরল আনাগোনা। ৮
এইতো শেষ, ওগো, এই ত সমাপন,
হৃদয় খালি ক'রে কাঁদায় প্রাণমন!
সহে না প্রাণে ওগো, আসিয়া চলে-যাওয়া,
পাওয়ার চেয়ে ভাল ছিল যে পথ-চাওয়া! ১২
এ যেন প্রভাতের মলিন রাকা-শশী, পূর্ণিমা
সুখের চেয়ে এতে দুখ যে মাখা বেশী!

—কুমুদরঞ্জন মল্লিক

৮০

যথাগত

চূত-মুকুলের কানে চুপি চুপি কহিতেছে পিক,
'কণ্ঠ মোর খুলে যাক্,—দাও মধু, দাও সমধিক !
কণ্ঠ যবে খুলে যাবে, বঁধু, তব মধু করি, পান—
সে শুধু গাহিবে, সখি ! অহর্নিশি তব জয়গান ।' ৪

কণ্ঠ যবে খুলে গেল, মঞ্জু কুঞ্জে তুলিয়া কম্পন—
বসন্তের জয়গীতি পিককণ্ঠ করিল কীর্ত্তন ।
মুকুল কহিল কাঁদি, 'রে বঞ্চক, রে কালো কোকিল,
আচারে প্রচারে তব কি বিচিত্র দেখাইলি মিল !' ৮

কোকিল কহিল কাঁদি', 'তব মধু-দিব্য-উদ্দীপনা—
আজি সত্য হোক্ জয়ী—বসন্তের উঠুক বন্দনা !'

—মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়
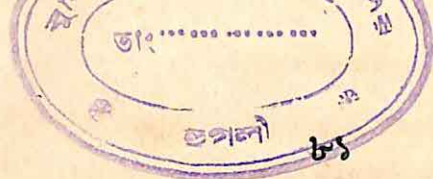
মন্দ ছেলে

মন্দ ছেলে বোলে আমার রট্‌লো পাড়ায় অখ্যাতি,
নিজের খেয়াল ফন্দি নিয়ে থাকতাম মেতে দিন রাত-ই।
এপার ওপার হ'তাম দীঘি সাঁতার দিয়ে এক দমে,
চ'লতাম পথে শুধু-মাথায় বিষ্টি যখন ঝম্‌ঝমে! ৪
বোশেখ মাসে দুপুর-বেলায় রোদে যখন কাঠ ফাটে,
রক্ত-মুখে ঘুরছি তখন এ মাঠ থেকে ঐ মাঠে।
জিম্‌ন্যাষ্টিক, আর ফুটবলেতে আমিই ছিলাম আগুয়ান,
সন্ধেবেলায় বাজিয়ে বাঁশি গাইতাম রবিবাবুর গান। ৮
দেখ্‌তাম চেয়ে জেলের ডিঙি হলুদবরণ পাল তুলে,
চাঁদের আলোয় যাচ্ছে ভেসে—উঠ্‌তো আমার বুক দুলে।
আলো হাওয়া বন্ধ কোরে, ঘরের কোণে, দোর দিয়ে—
ভালো-ছেলে পড়্‌ছে তখন শুক্‌নো-পাতা বই নিয়ে। ১২
একদিন হঠাৎ পড়ল ধরা মাষ্টার মেরে রতন শেঠ,
বাঁচিয়ে আমি দিলাম তাকে, আপ্‌নি হয়ে 'রাষ্টিকেট্‌'।

এখন আমি ঘুরে বেড়াই যেমন সেপাই নাম-কাটা,
সঙ্গে নিয়ে চওড়া বুক আর শক্ত আমার হাত-পা'টা। ১৬
অঙ্ক কসিস্‌ ভালো-ছেলে, গাঁট্টা কস্‌বি আয় দেখি!
অত বোঝাই করলে মাথা, হাত পা' তোদের খেল্‌বে কি!

আকাশ-বাতাস ডাক দিয়েছে বুকের ভিতর বইছে ঝড়,
আমার বুকে বুক মিলিয়ে বই ছেড়ে আয়, বেরিয়ে পড়্। ২০
মূর্খ হয়ে থাকবো আমি, করবি তোরা 'এম্-এ' পাশ,—
ভাবিসনে কো সেই আফ্‌শোসে ফেল্‌ছি আমি দীর্ঘশ্বাস।
এত বিদ্যে করলি জমা বুকের রক্ত জল-করা—
দাসত্ব ত' করবি শেষে, চাকরি—সেত' পা'য়-ধরা! ২৪
তোদের প্রাসাদ, গাড়ি-জুড়ি, হাজার টাকা মাইনে রে—
স্বাধীন যদি থাকতে পারি, চাইনে আমি চাইনে রে!

—কিরণধন চট্টোপাধ্যায়

৮২

সভ্যতার প্রতি

ধন্য তোরা ওরে মানুষ, ধন্য তোদের কীর্ত্তি-কলাপ,
সভ্যতার আর রাখ্‌লিনেকো বাকি;
কিন্তু একি দেখচি চেয়ে—এমন সবুজ সোনার বিশ্ব
আগা-গোড়াই রক্তে মাখামাখি! ৪

মস্ত একটা কসাইখানা বিপুল বৃহৎ হত্যাক্ষেত্র
কাক-শকুনের লীলাভূমি কোরে
তুল্লি গড়ে'—হায়রে মানুষ, এই পৃথিবীর সমস্তটা
শতাব্দীর পর শতাব্দীটা ধোরে! ৮

বর্ব্বরেরা রাগের মাথায় জ্বলে' উঠে' আগুন-সম
সটান ছুরি বসিয়ে দিত রুখে,
রাষ্ট্রনীতির সমাজনীতির ধর্ম্মকথা ক'য়ে তারা
সয়তানিটা পুষ্‌তো নাকো বুকে। ১২

আকাশ থেকে টিপ করে ঠিক মাথার উপর ছুঁড়তে বোমা
কি কোরে হয়—জানতো নাকো তারা,
শক্ত ব্যাধির বীজাণু সব মিশিয়ে দিয়ে নদীর জলে
জান্‌তো নাকো কায়দা শত্রু-মারা। ১৬

যন্ত্রপাতি দিচ্ছে যোগান্ বৈজ্ঞানিকের দলেরা সব,
জ্ঞানীরা সব তত্ত্বকথা ক'য়ে
মানুষ-মারার গাইছে সাফাই নির্লজ্জের মতন বসে'—
একশ' মুখে বক্তৃতায় ও বো'য়ে! ২০

হাতে মেরেই এক রকমে নিষ্কৃতিটা দিতিস্ যদি,
বাঁচ্‌তো তাতে অনেক চোখের জল,
বিশ্বব্যাপী কান্না এযে তুল্লি তোরা ভাতে মেরে,
ত্রাহি ত্রাহি ডাকছে ভূমণ্ডল! ২৪

চর্ব্ব্য-চোষ্যে পূর্ণ উদর—ঘূর্ণি-বায়ুর মতন তোরা
হাঁকিয়ে মোটর করিস্ ছুটোছুটি,
নিরীহ-প্রাণ অসংখ্য লোক চাকার তলায় প'ড়ে তোদের
দিবারাত্র খাচ্চে লুটোপুটি। ২৮

আয়ু যাদের ফুরিয়ে গেছে মরণ তাদের কে আট্‌কাবে ?
মরবে এটায় না হয় আর-একটাতে,—
পথ চল্‌তে অশিক্ষিত অসাবধানী গ্রাম্য যারা
তাদের উচিত মৃত্যু অপঘাতে ! ৩২

এই যে নিত্য যাচ্ছে মারা অসংখ্য লোক অনাহারে,
কাড়্‌চে মায়ে ছেলের মুখের গ্রাস ;
এই যে নিত্য মর্‌চে রোগে একটি ফোঁটা ওষুধ বিনা,
অসংখ্য লোক খাচ্চে নাভি-শ্বাস ; ৩৬

এই যে মুটে-মজুর দর্জ্জি-ধোপা চাষা-তাঁতি
কামার-কুমোর শ্রমজীবির দল,
আহার-বিহার বিলাস-দ্রব্য জোগায় তোদের ভারে ভারে,
বুকের কাঁচা রক্ত কোরে জল,— ৪০

নিজেরা হায় পায় না খেতে দু'টি বেলা পেট-ভরা ভাত
ভগবানে ডাক্‌ছে ত্রাহি ত্রাহি—
সভ্যতার এই শতাব্দীতে এই যে ভীষণ অত্যাচারটা,
ইহার জন্য নয় কি তোরা দায়ী ? ৪৪

সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার অলীক স্বপন দেখ্‌ছে যত
কাব্যপ্রিয় অন্ধ কাল্পনিক ;
আস্‌মান-জমি রইছে ফারাক কল্পনা ও বাস্তবেতে—
কালও যেমন আজও তেম্‌নি ঠিক । ৪৮

অতএব এ মিথ্যে বিলাপ ; পৈশাচিকী নৃত্যলীলা
জগৎ জুড়ে হউক অভিনয়,
অত্যাচারে উৎপীড়নে যাক্ এ বিশ্ব ছারেখারে—
হউক দুষ্ট সয়তানেরি জয় ! ৫২

উন্নতি আর সভ্যতা কি এরেই বলে, ওরে মানুষ ?
যুগ-যুগান্তর পরিশ্রমের ফল
ষোল-আনাই ভেজাল মেকি ?—গোয়ালিনীর দুধের মত
সেরেফ খাঁটি শাদা রঙের জল ! ৫৬

সভ্যতার এই খাঁচার ভিতর হাঁপিয়ে ওঠে পরাণ-পাখী
বর্ব্বরতার মুক্ত বায়ুর তরে,
বিষিয়ে ওঠে সমস্ত প্রাণ কলের যত ধূলোয় ধোঁয়ায়,
কৃত্রিমতায় জ্যান্ত মানুষ মরে। ৬০

—কিরণধন চট্টোপাধ্যায়

৮৩

কৃষ্ণা *

কে তাপস প্রতিহিংসা-যজ্ঞে
কৃষ্ণবর্ত্মে ঢালিল হবি ?
কন্যা কৃষ্ণা জাগিয়া বসিল
শিখা-শতদলে জন্ম লভি'। ৪
আকাশে হইল দৈববাণী—
জতুগৃহে ওই সন্ধ্যা জ্বলিল,
সাবধান যত অসাবধানী !

এল দলে দলে অযুত নৃপতি ৮
স্বয়ংবরের সে সভাতলে,
তুমি দিলে মালা—চীরবাসে ঢাকা
লক্ষ্যবেদ্ধা ভিখারী-গলে !
তব দয়িতের ছদ্ম-বীর্য্যে ১২
বিস্মিত হ'ল বিশ্ববাসী,
তুমি বিস্মিত হয়েছিলে কিনা—
সে কথা জানে না বেদব্যাস-ই।

রাজসূয়ে যারা কোরেছিল রাণী, ১৬
জুয়া হারি' তোমা বেচিল তারা ;
হে শিখারূপিণী ! না জানি, কেমনে
সেদিন হওনি ধৈর্য্যহারা !

সেদিন সহসা দিব্যদৃষ্টি ২০
ফুটিল তোমার নয়ন-পাতে,
দেখিলে চাহিয়া কোন ভেদ নাই
যুধিষ্ঠিরের শকুনি সাথে !
কর্ণে পার্থে কি পার্থক্য ? ২৪
কি ভেদ দ্রোণে ও দৌবারিকে ?
ধর্ম্ম সে শুধু নরের জন্য—
ফিরেও চাহেনা নারীর দিকে।
তব চক্ষের বিদ্যুজ্জ্বালা ২৮
কৃষ্ণ-মেঘের বক্ষে ফুটে ;
দিক্‌চক্রে কি ঘূর্ণি জাগিল ?
সারা অম্বর চরণে লুটে !

ঘুরে' যায় চাকা, দূরে যায় দেখা— ৩২
প্রলয়-শীর্ষে ছুটেছ, রাণি !
পাঁচ-তুরঙ্গী মনোরথে তব
পাঁচ-অঙ্গুলে বল্গা টানি'।
অক্ষৌহিণী অক্ষৌহিণী ৩৬
কুরুক্ষেত্রে বাহিনী পড়ে,
পড়িল ভীষ্ম, পুড়ে গেল দ্রোণ,
ডুবিল আরুণি, শল্য মরে।

মরে কুরু, মরে পাণ্ডবদল, ৪০
মরে পাঞ্চাল নির্বিচারে,
বালকেরে ঘিরে' মারে সাত বীরে
নিবারণ সেথা কে করে কারে ?
সেই নরমেধে যজ্ঞ-অগ্নি ৪৪
জ্বলিতেছ, তুমি যাজ্ঞসেনী,—
উড়াইয়া শিরে, শিখার শিখরে,
পুঞ্জধূমের মুক্তবেণী !
যত নারী যেথা হ'ল লাঞ্ছিতা, ৪৮
প্রায়শ্চিত্ত করিল কুরু,—
রক্তসন্ধ্যা গড়ায় আকাশে,
কে লুটে আঁধারে ভগ্ন-উরু !

সেই সন্ধ্যায় ফিরিলে যখন ৫২
শূন্য তোমার দেউল-তলে,—
কোথা ধূপ-মালা, উপচার-থালা ?
শুধু সে পঞ্চপ্রদীপ জ্বলে।
মন্দির ছাড়ি' দাঁড়ালে দুয়ারে ৫৬
চাহিয়া সে শীত-নিশীথ-নভে,—
দূরে দূরে যারা জ্বলিছে নীরবে
হাতছানি তারা দিল কি সবে ?

বাহিরিলে মহাপথে, হে তাপসি, ৬০
ললাটে লিখিয়া কিসের লিখা ?
বিশ্বনারীর লাঞ্ছনা, না ও
যজ্ঞশেষের ভস্ম-টিকা ?

বহুযুগান্তে গগনপ্রান্তে ৬৪
যুগের শঙ্খ বাজিছে ও কি !
তোমারে জাগাতে কে জ্বালে অনল,
হে কৃষ্ণা, অয়ি কৃষ্ণসখি !

—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

৮৪

কচি ডাব *

'ডাব চাই' ডাব, কচি ডাব ?'—
আমার বাসার ধারে
হাঁকে বৃদ্ধ বাঁকা ঘাড়ে,
সে পথে তখন লোকাভাব। ৪

হাঁকে বৃদ্ধ 'ডাব, কচি ডাব ?'—
পাগল ! আজি এ সাঁঝে
সঙ্কীর্ণ গলির মাঝে
উদরে উদরে অন্নাভাব ;— ৮

সেইখানে এই শীতে
কি বাতিক প্রশমিতে
কে তোমার খাবে কচি ডাব ?

কাঁদিয়া কহিল বুড়া— ১২
'তুমি মোর বাপ খুড়া,
ঝাঁকাটায় হাত যদি দাও,
বারেক নামায়ে বোঝা
মাজাটা করিব সোজা, ১৬
ডাব তুমি নাও, বা না নাও।'

বাহিরিয়া দ্বার খুলি'
দু'হাত ঝাঁকায় তুলি'
নামাইয়া দিনু তার ভার ; ২০
ব'সে পড়ি ভাঙ্গা ধাপে
থর-থর বুড়া কাঁপে,
নগ্ন বুকে নুয়ে পড়ে ঘাড়।

ক্ষণেক নীরব থাকি' ২৪
ক্ষীণকণ্ঠে মোরে ডাকি'
কহে বৃদ্ধ—'তবে বাবু, যাই' ;—
ডাব ক'টি নামাইয়া
ন্যায্য দাম হাতে দিয়া ২৮
আমি তার মুখপানে চাই।

গণ্ড ভরি' আঁখি-নীরে,
খালি ঝাঁকা তুলি' শিরে
গলি বেয়ে চলি' গেল বুড়া,— ৩২
ঘরে ঢুকি' দ্বার রুধি'
অন্ধকারে চক্ষু মুদি'
কোলে তুলে নিয়ে তানপুরা,

বেসুরে ধরিনু গান,— ৩৬
হায়, হত ভগবান!
মোর ভাগ্যে এহেন দুর্ভোগ!
অপরের কাব্য-ভালে
মিলাও ত কালে কালে ৪০
অনুকূল কত-না সুযোগ!

সহসা, ঝনাক্ ঝান্—
তানপুরে কাটে তান,
ছিঁড়ে গেল সব ক'টা তার; ৪৪
আমার শ্রবণ-মূলে
অকস্মাৎ গেল দুলে,
কোন্ রুদ্র নৃত্যের ঝঙ্কার!

দারুণ শীতের সাঁঝ, ৪৮
হে আমার নটরাজ,

কোন্ রূপে এসেছিলে দ্বারে ?
অশ্রুর সাগরমন্থ—
হে আমার নীলকণ্ঠ ! ৫২
ভাগ্যে ফিরাইনি একেবারে !

শীতাতপে দিগম্বর,
দিশাহীন পথচর,
দেহ টলে ক্ষুধার নেশায় ; ৫৬
অন্তর-শ্মশানে চিতা
সারি সারি নির্ব্বাপিতা,
তাহারি বিভূতি ফুটে গায়।

সর্ব্বাঙ্গে হাড়ের মালা, ৬০
শিরায় ফণীর জ্বালা,
গণ্ডে ঝরে জাহ্নবী উতলা ;
কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী-শেষে,
তোমারি ললাটে এসে ৬৪
অস্ত গেছে শেষ শশিকলা !

তোমার মাথার ভার
ধ'রেছি যে একবার,
তাহে মোর মিটিয়াছে সাধ। ৬৮
দিয়েছি তামার চাকি,—
সে মোর হয়নি ফাঁকি,
সোনায় ঘটিত অপরাধ।

—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

৮৫
শিউলির বিয়ে

বিয়ের ফুলটি ফোটার আগেই গায়ে হলুদ যার,
সবাই তারে ফেল্‌বে চিনে'—শিউলি যে নাম তার।
ডাল্‌টি কিছু উঁচুই বটে, কুলীন বাপের মেয়ে,—
স্বভাবটি তাঁর রুক্ষ যেমন, গরিব সবার চেয়ে! ৪
বেল-মালতী, জুঁই-চামেলি—এরা সমান ঘর,
কাজেই এদের—যেমনটি চাও, জুট্‌বে তেমন বর।
শিউলি থাকে একটি টেরে গন্ধটুকুন ঢেকে,
শ্বেত-করবী দেখ্‌ত তারে পাতার আড়াল থেকে। ৮
প্রজাপতি—ঘটক তিনি—করেন যাওয়া-আসা,
বলেন, 'বিয়ের বয়েস হ'ল, রূপে-গুণে খাসা,
পাল্‌টি-ঘরের একটি যে বর—পাড়ায় থাকে সে,
বল' যদি, দিন করি এই মাসের একুশে। ১২
বাপ তো তোমার রাজিই আছে—সেয়ানা তুমি, তাই
'গায়ে হলুদ' দেওয়ার পরেও মত্‌টি নেওয়া চাই!'

শিউলি বলে, 'তাই যদি হয়, ঘটক, তুমি যাও,
আমি যে আজ স্বয়ম্বরা—পাড়ায় বলে' দাও।' ১৬
শুনে' সবাই ছি-ছি করে—'এমন দেখিনি!
কুলীন বলে' লজ্জা-সরম একটু রাখে নি!'

সন্ধেবেলায় ফুল-বাবুরা বল্‌লে মীটিঙ্‌ করে'—
শিউলিরা সব হ'লেন তবে আজ থেকে 'এক-ঘরে'। ২০
হয়েছে যার গায়ে হলুদ—বর যদি না জোটে,
জব্দ হবেন বাপ-বেটিতে, থাক্‌বে না জাত মোটে!
শিউলি বলে, "ভয় কি বাবা! ভাব্‌না কিসের শুনি?
ভোর না হ'তেই বিদেয় হব,—না হয় ত' এখ্‌খুনি!" ২৪

* * *

দখিন-হাওয়া বল্‌লে তারে, "উড়িয়ে নে যাই চল্‌—
গোলাপী-রং পরীর দেশে ঢাল্‌বি পরিমল;
মেঘের থামে মণির মালায় তারার বাতি জ্বেলে
গাঁথ্‌বে তোমায় চিকণ হারে, নীলার থালায় ঢেলে! ২৮
শুক্‌তারাটি ঘুমায় যখন রাত্রি-জাগার পর,
শিয়রে তার ঝালর হয়ে ঝুল্‌বি মনোহর!
আল্‌গা তোমার বোঁটার বাঁধন খুল্‌ব নাকি, সই?"
শিউলি বলে, 'কেমন করে' আকাশ-কুসুম হই!' ৩২

জ্যোৎস্না এল জরীর চাদর ধূলোয় লুটিয়ে,
বকুল-চাঁপা-হাস্নুহানার গন্ধ ছুটিয়ে;
সাদা-মেঘের টোপর মাথায়, জর্দ্দা চেলীর পাড়ে
চওড়া কালো ফিতের বাহার বনের ছায়ায় বাড়ে! ৩৬
এসেই মুখে একটি মুঠো মাখিয়ে দিয়ে আলো,
বল্‌লে, "তোমার নেই পাউডার?—দেখায় সে কি ভালো?

রূপের স্বপন দেখ্‌বে যদি বন্ধ কর আঁখি,—
তার চেয়ে এই চাদর দিয়ে মুখটি তোমার ঢাকি। ৪০
নিশুত্ রাতের নিরালাতে চাইবে যখন ফের,
রুক্ষ-কঠিন শাখার ব্যথা আর পাবে না টের।
আকাশ থেকে আস্‌বে নেমে পরী-কুটুম্বিনী,
বনে বসে'ই পার্‌বে হ'তে স্বপন-বিহঙ্গিনী।"— ৪৪
একটি কথা কয় না দেখে' জ্যোৎস্না গেল ফিরে,
শিউলি ভাবে—'চাইনে স্বপন, ভুল্‌তে ধরণীরে'।

আঁধার যখন আব্‌ছা হ'ল পূব-আকাশের পানে,
পাখীর ন'বৎ উঠ্‌ল বেজে ঘুমেরি মাঝখানে,— ৪৮
শিউলি শুনে শিউরে ওঠে, বুকের তলায় তার
কিসের যেন স্থখটি জাগে—গায় কি চমৎকার!
গাইছে—"ওগো ফুলের মেয়ে, জানি তোমার পণ,
কোন্ জনারে সকল শোভা কর্‌বে সমর্পণ। ৫২
ধূলোর উপর কে পেতেছে বুকের আসনখানি!
আগুন-তাপেও কে করেছে সবুজের আমদানি!
মাড়িয়ে চলে সবাই, তবু মাথায় করে শেষে—
দেব্‌তাকে দেয় শীষটি যে তার, পুণ্য আশিস্ যে সে! ৫৬
মেঘের মতন, শূন্য-পথের নয় সে উদাসী,
চপল হাওয়ার ইয়ার সে নয়, গন্ধ-বিলাসী।
রূপটি যে তার প্রাণের আরাম, দুর্ব্বাদলশ্যাম—
জানি, তোমার বুকের মাঝে লেখা যে তার নাম।" ৬০

শিউলি বলে' 'থাম্ না তোরা, ছুটি পায়ে পড়ি,
এখ্‌খুনি সব উঠ্‌বে জেগে, বল্‌বে—গলায় দড়ি !—
সইতে আমি পার্‌বো না সে,—তবু, দোয়েল ভাই,
কুলীন হ'য়েও কেমন করে' এমন ঘরে যাই ! ৬৪
বুঝ্‌ছি প্রাণে—মন টেনেছে ধূলোমাটির পানে,
দখিন-হাওয়া, আকাশ পেলেও থাক্‌ব না এইখানে।
ঝিঁঝিঁর ডাকে শুনেছিলাম করুণ কাঁদন তার—
সারাদিনের অনেক ব্যথার একটি সে ঝঙ্কার ! ৬৮
তাইত আমি মনে-মনেই হ'লাম স্বয়ম্বর,
এক নিমিষেই আপন হ'ল—ছিল যে-জন পর !
তবু আমার এম্‌নি কপাল !—দেখ্‌তে না পাই তাকে,
জোচ্ছনা আর অন্ধকারে লুকিয়ে সে যে থাকে !··· ৭২
বল্‌না তোরা—ভোর হ'ল কি ? মিহিন্ কুয়াসায়
ছাদ্‌না-তলা দেয় কি ঢেকে ওড়্‌নাখানির প্রায় ?
সেই লগনে তোরা সবাই তুলিস্ কলস্বর,—
ততক্ষণ এই চোখের শিশির ঝরুক তাহার 'পর।' ৭৬

* * *

সকাল বেলায় ঘুমটি ভেঙে সবাই দেখে আসি'—
সবুজ ঘাসের বুকের উপর শিউলি-ফুলের হাসি !

—মোহিতলাল মজুমদার

৮৬

রাখালরাজ

অবোধ কানু, কার মায়াতে ভুলে,
গোকুল ছেড়ে চলে' গেলি, ভাই ?
সেথায় কেবল হাতী ঘোড়ার মেলা,
তোর ত সেথা খেলার সাথী নাই ! ৪
কোথায় সেথা দূর্ব্বাভরা গোঠ,
রাখালদলে খেলার হেন জোট,
ননীর মত নরম সাদা দেহ—
কোথায় সেথা দুগ্ধে-ভরা গাই ? ৮
রাখালরাজা, রাজ্য তোর এ ফেলে,
কেমন করে আছিস্ সেথা ভাই ?

ময়ূর-নাচা, এমন পাখী-ডাকা
হরিণ-চরা কোথায় সেথা বন ? ১২
মাটি-ছোঁয়া কোথায় তরুশাখা—
ঝুল্‌বি কোথা, দুল্‌বি সারাক্ষণ ?
কোথায় সেথা ফুলের ছড়াছড়ি,
কোথায় দিবি সদাই গড়াগড়ি ? ১৬
গুঁজ্‌তে কাণে কোথায় পাবি ফুল,
—বনমালা, পরতে সুশোভন ?
ময়ুর-নাচা এমন পাখী-ডাকা
হরিণ-চরা কোথায় সেথা বন ? ২০

ক্লান্তি হ'লে বস্‌বি কোথায়, ভাই,—
শীতল হেন কোথায় তরুছায়া ?
কোথায় সেথা কালিন্দীর নীরে
কল্‌কলিয়ে সাঁতার কেটে যাওয়া ? ২৪
সেথায় কিরে গভীর কালিদহে
কমল কুমুদ নিত্য ফুটে রহে ?
শুকাইতে গায়ের স্বেদকণা
কোথায় সেথা মধুর মৃদু হাওয়া ? ২৮
ক্লান্তি হ'লে বস্‌বি কোথা, ভাই,
—কোথায় সেথা এমন তরুছায়া ?

তুল্‌বে কেবা বেলের কাঁটা দিয়া
কুশের কাঁটা বিঁধলে রাঙা পায় ? ৩২
পড়্‌লে খসে' নূপুর, ধড়া-চূড়া,
আবার কেবা পরিয়ে দেবে তায় ?
তমাল-তলে বস্‌লে মেলি' পা',
বাছুর তব চাট্‌বে না ত গা', ৩৬
দুপুর-রোদে ধেনুর পিছে ঘুরি'
কাহার দেহে এলিয়ে দিবি গা'য় ?
ক্ষুধা পেলে আন্‌বে কেবা ফল,
ঘাম্‌লে ও মুখ মুছিয়ে দিবে, হায় ? ৪০

—কালিদাস রায়

৮৭

আকিঞ্চন

দুঃখ যদি দিতে হয় দাও তবে, দয়াময়,
নিয়ে গিয়ে এমন ভুবনে—
যেখানে আনন্দ-গান উৎসবের কলতান
সারাদিন না পশে শ্রবণে। ৪
যেথা নিত্য নাহি হেরি, সতত আমারে ঘেরি'
উল্লাসের চল-নৃত্য চলে ;
যেখানে সম্ভোগ-সুখ গবাক্ষে বাড়ায়ে মুখ
ব্যঙ্গ নাহি হানে পলে পলে। ৮
যেখানে ফোটে না ফুল, সুকণ্ঠ বিহঙ্গকুল
গাহে না এমন মধু-গান,
চাঁদের আদর পেয়ে সোহাগে গিরির মেয়ে
নাচিয়া তুলে না কলতান। ১২

সুখ যদি দিতে হয় দাও তবে, দয়াময়,
নিয়ে গিয়ে এমন জগতে—
যেখানে না শুনি যেন করুণ-কাতর হেন
আর্ত্তনাদ হায় পথে পথে ! ১৬
সেথা যেন চারিধারে গৃহগুলি হাহাকারে
উল্লাসের ধিক্কার না হানে ;
যেন কাঙালিনী মেয়ে দ্বারে নাহি রয় চেয়ে
আমাদের উৎসবের পানে। ২০

হ'য়ে তরু-বুকহারা মুকুলিত লতিকারা
সেথা যেন ভূমে না লুটায়।
ফুল যেন নাহি ঝরে, নদী যেন নাহি মরে,
ঋতুরাজ পাখা না গুটায়। ২৪

—কালিদাস রায়

৮৮

বাঙ্গালীর সাধ *

'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'

তরী হ'তে অবতরি' চলিলেন মহেশ্বরী
ভবানন্দ-ভবনের পানে,
নৌকা বাঁধি' বটতলে ঈশ্বরী পাটনী চলে
পিছে পিছে সজল নয়ানে। ৪
সূর্য্য বসিয়াছে পাটে লোক নাহি চলে বাটে,
দূর গ্রামে বেজে উঠে শাঁখ,
দিনের আলোক, বায়ে উড়ায়ে পাখার ঘায়ে
উড়ে যায় বলাকার ঝাঁক। ৮
"নৌকা ফেলি' কেন মিছে আসিস্ রে পিছে পিছে?"
জননী ফিরিয়া ক'ন ডেকে—
তোর তরী হ'তে নামি' পারের কড়ি ত' আমি
এসেছি সেঁউতি 'পরে রেখে।" ১২

ঈশ্বরী পাটনী কয়, "দাও মাগো পরিচয়,
তুমি ত সামান্য মেয়ে নও,—
হেরি' কার শ্রীচরণ ধন্য হলো এ জীবন,
জানিতে বাসনা—কও, কও।" ১৬
দেবী কহিলেন হাসি' গাঙ্গিনী-তীরেই আসি'
দিয়াছি ত নিজ পরিচয়,
বিশেষণে সবিশেষ বুঝায়ে বলেছি বেশ,
যাতে তোর দূর হলো ভয়।" ২০
পাটনী কহিল, "তাতে বুঝেছি স্বামীর সাথে
কলহ করিয়া অভিমানে,
তুমি কুলীনের মেয়ে সতীনের দাগা পেয়ে
চলেছ মা আশ্রয়-সন্ধানে। ২৪
বলনি ত আর কিছু, চলিয়াছি পিছু পিছু,
কে মা তুমি, জানিবারে চাই ;
সাধন-ভজনহীন আমি এ পাটনী দীন,
নিজ ভাগ্যে প্রত্যয় না পাই।" ২৮
হাসিয়া জননী ক'ন "ডাকে মোরে ত্রিভুবন
জননী বলিয়া,—শোন্ তবে,
তুষ্ট আমি তোর 'পর যাহা ইচ্ছা মাগ বর,
যা চাহিবি তাই তোর হ'বে।" ৩২
পাটনী চিনিয়া মায় অলক্ত-রঞ্জিত পায়
প্রণমি কহিল জোড়হাতে,

"যদি কৃপা হলো হেন, আমার সন্তান যেন
চিরদিন থাকে দুধে ভাতে।" ৩৬
বক্র শীর্ণ আলি-পথ চলিয়াছে সর্পবৎ,
দুই পাশে শ্যাম ধান্য-ভার,
দাঁড়াইয়া তার মাঝে দেবী অন্নপূর্ণা রাজে,
নেয়ে পড়ি' পদতলে তাঁর। ৪০

দেবী কহিলেন, "নেয়ে, এমন সুযোগ পেয়ে
এই শুধু করিলি প্রার্থনা!
এ-ত' অতি তুচ্ছ কথা, এরি তরে কাতরতা?
আর কিছু নাহি কি কামনা? ৪৪
মুক্তি চাস্? মোক্ষ চাস্? চাস্ চির-স্বর্গবাস?
শত পুত্র চাস্ যদি পাবি।
পরমায়ু বর্ষ-শত, রাজ্য ধনরত্ন যত,
কিবা চাস্—বল্, পুন ভাবি'।" ৪৮
জোড়হাতে নেয়ে কয়, "মরিতে করি না ভয়,
মোক্ষ, মুক্তি?—কাজ নাই তা'তে।
রাজ্যধন নেব কেন? আমার সন্তান যেন
চিরদিন থাকে দুধে ভাতে।" ৫২

অন্নপূর্ণা ক'ন, "নেয়ে, সোনা ফেলে এলি ধেয়ে,
যে সোনা এসেছি নায়ে রাখি,

সে সোনা সামান্য নয় যাবে তা'তে দৈন্য-ভয়—"
নেয়ে কয় ছলছল আঁখি— ৫৬
"সোনা নিয়ে কি মা হবে ? জমিদার কেড়ে লবে,
লুটে লবে চোরে বা ডাকাতে।
বর দাও মোরে হেন, আমার সন্তান যেন
চিরদিন থাকে দুধে ভাতে।" ৬০
অন্নদা তথাস্তু বলি অদৃশ্য হ'লেন ছলি'—
নেয়ে চায় অবাক নয়ানে ;
স্বপ্নভঙ্গে চলে ধেয়ে, হৃষ্টচিত্তে বর পেয়ে,
আপনার কুটীরের পানে। ৬৪

—কালিদাস রায়

৮৯
বাঙ্‌লা মা *

আমার শ্যাম্‌লা-বরণ বাঙ্‌লা-মায়ের
রূপ দেখে যা, আয়রে আয়।
গিরি দরী বনে মাঠে প্রান্তরে রূপ ছাপিয়ে যায় ॥
ধানের ক্ষেতে বনের ফাঁকে ৪
দেখে যা মোর কালো মাকে,
ধূলি-রাঙা পথের বাঁকে
বৈরাগিণী বীণ্‌ বাজায় ॥
ভীরু মেয়ে পালিয়ে বেড়ায় পল্লীগ্রামে এক্‌লাটি, ৮
বিজন মাঠে গ্রাম সে বসায় নিয়ে কাদা খড় মাটি।
কাজল মেঘের ঝারি নিয়ে করুণার সে বারি ছিটায় ॥

কাজ্‌লা-দীঘির পদ্মফুলে যায় দেখা তার পদ্ম-মুখ,
খেলে বেড়ায় ডাকাত-মেয়ে বনে ল'য়ে বাঘ ভালুক ; ১২
ঝড়ের সাথে নৃত্যে মাতে, বে'দের সাথে সাপ নাচায় ॥
নদীর স্রোতে পাথর-নুড়ির কাঁকণ চুড়ি বাজ্‌ছে যে তার,
দাঁড়ায় সাঁঝের অলিন্দে সে টীপ্‌টি প'রে সন্ধ্যাতারার ;
ঊষার গাঙ্গে ঘট ভরিতে যায় সে মেয়ে ভোর-বেলায় ॥ ১৬
হরিৎশস্যে লুটায় আঁচল, ঝিল্লীতে তার নূপুর বাজে ;
ভাটীর স্রোতে গায় ভাটিয়াল, গায় সে বাউল মাঠের মাঝে,
গঙ্গা-তীরে শ্মশান-ঘাটে কেঁদে কভু বুক ভাসায় ॥

—নজরুল ইস্‌লাম

দারিদ্র্য

হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান্ !
তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রীষ্টের সম্মান
কণ্টক-মুকুট-শোভা ! দিয়াছ তাপস,
অসঙ্কোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস। ৪

দুঃসহ দাহনে তব হে দর্পী তাপস,
অম্লান স্বর্ণেরে মোর করিলে বিরস,
অকালে শুকালে মোর রূপ-রস-প্রাণ—
শীর্ণ করপুট ভরি' সুন্দরের দান ৮

যতবার নিতে যাই—হে বুভুক্ষু, তুমি
অগ্রে আসি কর পান ! শূন্য মরুভূমি
হেরি মম কল্পলোক ! তরল গরল
কণ্ঠে ঢালি' তুমি বল, "অমৃতে কি ফল ? ১২

"জ্বালা নাই, নেশা নাই, নাই উন্মাদনা,—
রে দুর্ব্বল ! অমরার অমৃত-সাধনা
এ দুঃখের পৃথিবীতে তোর ব্রত নহে !
তুই নাগ, জন্ম তোর বেদনার দহে। ১৬

কাঁটা-কুঞ্জে বসি তুই গাঁথিবি মালিকা,
দিয়া গেনু ভালে তোর বেদনার টীকা !"

মৃত্যুপথ-যাত্রিদল তোমার ইঙ্গিতে
গলায় পরিছে ফাঁস হাসিতে হাসিতে। ২০

নিত্য-অভাবের কুণ্ড জ্বালাইয়া বুকে
সাধিতেছ মৃত্যু-যজ্ঞ পৈশাচিক সুখে!
লক্ষ্মীর কিরীট ধরি' ফেলিতেছ টানি'
ধূলিতলে, রুদ্ধ রোষে করাঘাত হানি'। ২৪

ওরে মোর সর্ব্বনাশা দারিদ্র্য অসহ!—
পুত্র হ'য়ে জায়া হ'য়ে কাঁদো অহরহ
আমার দুয়ার ধরি'! কে বাজাবে বাঁশী?
কোথা পাব অনিন্দিত সুন্দরের হাসি? ২৮
আজো শুনি আগমনী গাহিছে সানাই,
ও যেন কাঁদিছে শুধু—নাই, কিছু নাই!

—নজরুল ইস্‌লাম

৯১

রৌদ্র-দগ্ধের গান

এবার আমার জ্যোতির্গেহে তিমির-প্রদীপ জ্বালো।
আনো অগ্নি-বিহীন দীপ্তি-শিখার তৃপ্তি অতল কালো।
তিমির-প্রদীপ জ্বালো॥

নয়ন আমার তামস-তন্দ্রালসে
ঢুলে পড়ুক ঘুমের সবুজ রসে, ৫
রৌদ্র-কুহুর দীপক-পাখা পড়ুক টুটুক খ'সে,—
আমার নিদাঘ-দাহে অমা-মেঘের নীল অমিয়া ঢালো।
তিমির-প্রদীপ জ্বালো॥

মেঘে ডুবাও সহস্র-দল রবি-কমল-দীপ,
ফুটাও আঁধার-কদম-ঘুম্-শাখে মোর স্বপনমণি-নীপ। ১০
নিখিল-গহন-তিমির-তমাল-গাছে
কালো কালার উজল নয়ন নাচে,
আলো-রাধা যে-কালোতে নিত্য মরণ যাচে—
ওগো আনো আমার সেই যমুনার জল-বিজুলির আলো।
তিমির-প্রদীপ জ্বালো॥ ১৫

দিনের আলো কাঁদে আমার রাতের তিমির লাগি'
সেথায় আঁধার-বাসর-ঘরে তোমার সোহাগ আছে জাগি'।

ম্লান ক'রে দেয় আলোর দহন-জ্বালা,
তোমার হাতের চাঁদ-প্রদীপের থালা,
শুকিয়ে ওঠে তোমার তারা-ফুলের গগন-ডালা। ২০
ওগো অসিত-অমার নিশীথ-নিতল শীতল কালোই ভালো।
তিমির-প্রদীপ জ্বালো ॥

—নজরুল ইস্‌লাম

৯২

'ফিরে আয়, নন্দা !'*

গিয়েছিনু কাঞ্চনপল্লী ;
পিসীমারে গড় করি' হাতে নিতে ছাতা ছড়ি,
পিসী কন, 'সত্যিই চল্‌লি !'
আমি কহিলাম ধীরে, 'দেখ, মেঘ এল ঘিরে, ৪
রাস্তা ত' নয়, পিসি, অল্প ?'
"সত্যি তা বটে, তবে আবার আসিবি কবে—
শোনাবি সবটা তোর গল্প ?"

দু'ধারে গভীর বন বায়ু করে শন্ শন্, ৮
নাই কোথা মানুষের চিহ্ন,
সম্মুখে যতই চলি গাছে গাছে গলাগলি,
কাঁটায় হইল দেহ ছিন্ন।

আর পথ নাহি পাই চকিতে থামিয়া যাই, ১২
নামিছে রজনী অতি বন্ধ্যা—
সহসা শুনিনু সুর, মনে হ'ল নহে দূর,
'আয় ফিরে, ফিরে আয়, নন্দা !'

কোন দিকে নাই কিছু শুধু গাছ উঁচু-নীচু, ১৬
ভয়ে ছম্ ছম্ করে গাত্র,
শুনিনু পাতিয়া কান বন-পথে ছোটে বান,
বায়ু করে শন্ শন্ মাত্র।
হঠাৎ তড়িতালোকে কি যেন পড়িল চোখে, ২০
ছুটিনু তাহাই করি' লক্ষ্য,
নাকে মুখে চোখে কানে বন-পথ বাধা হানে
মেলিয়া দুইটি কাঁটা-পক্ষ।

বুঝিলাম অনুভবে শিবের দেউল হবে, ২৪
চারিদিক জনহীন স্তব্ধ,
রহি' রহি' শোনা যায়, বায়ু করে 'হায় হায়',
জল ছোটে কল-কল শব্দ।
দেউল আশ্রয় করি' একা জাগি বিভাবরী, ২৮
যাপিব কি সে নিশির পর্ব্ব—
হৃদয় কাঁপিল ভয়ে, নিরজন দেবালয়ে
ভাঙিল আমার যত গর্ব্ব।

কত কি উদিল মনে, ধীরে ধীরে আঁখি-কোণে ৩২
নেমে এল ভয়হরা তন্দ্রা—
চমকিয়া জাগি ত্রাসে, কে ডাকে দেউল-পাশে,
'আয় ফিরে, ফিরে আয়, নন্দা !'

বাহিরিয়া বার বার দেখিলাম চারিধার, ৩৬
নাহি জন-মানবের চিহ্ন,
চামচিকা উড়ে উড়ে মাথার উপরে ঘুরে,
বিজলী তিমির করে ছিন্ন।
সভয়ে রহিনু বসি', ভূতের আগারে পশি' ৪০
ঘুম দিতে নাহি হ'ল ভরসা ;
বসি' বসি' গণি মনে এক, দুই, অকারণে—
না জানি কখন হবে ফর্সা !
দেখিলাম তরু-শিরে ঝড় থেমে এল ধীরে, ৪৪
বৃষ্টির বেগ হ'ল মন্দা ;
কাঁপায়ে মন্দির-মেঝে কাতরে কাঁদিল কে যে,—
'আয় ফিরে, ফিরে আয়, নন্দা !'

জাগিল ভোরের আলো, নিমিষে মিলালো কালো— ৪৮
বনভূমি করে শুচি-হাস্য,
তখন পড়িল মনে কে ডাকিল বনে বনে—
মনে মনে করি টীকা-ভাষ্য।

পুন এনু রাজ-পথে, ঘরে ফিরি' কোনোমতে ৫২
ঘুম দিয়া দূর করি ক্লান্তি।
ভাবিয়া করিনু স্থির, এ ব্যাপার রজনীর—
আমারি মনের হবে ভ্রান্তি।
আজো তবু পড়ে মনে নিতান্তই অকারণে, ৫৬
বরষা-নিবিড় যবে সন্ধ্যা—
করুণ ব্যথিত সুরে আজো শুনি কাছে দূরে,
'আয় ফিরে, ফিরে আয়, নন্দা !'

—সজনীকান্ত দাস

৯৩

রাখাল ছেলে *

"রাখাল ছেলে, রাখাল ছেলে, বারেক ফিরে চাও,
বাঁকা গাঁয়ের পথটী বেয়ে কোথায় চ'লে যাও ?"

"ওই যে দেখ নীল-নোয়ান' সবুজ-ঘেরা গাঁ,
কলার পাতা দোলায় চামর, শিশির ধোয়ায় পা ! ৪
সেথায় আছে ছোট্ট কুটীর সোনার পাতায় ছাওয়া,
সাঁঝ-আকাশের ছড়িয়ে-পড়া আবীর-রঙে নাওয়া ;
সেই ঘরেতে একলা ব'সে ডাক্‌ছে আমার মা—
সেথায় যাব, ও ভাই এবার আমায় ছাড় না।" ৮

"রাখাল ছেলে, রাখাল ছেলে, আবার কোথা ধাও,
পূব-আকাশে ছাড়ল সবে রঙীন মেঘের নাও।"

"ঘুম হ'তে আজ জেগেই দেখি শিশির-ঝরা ঘাসে
সারা রাতের স্বপন আমার মিঠেল রোদে হাসে। ১২
আমার সাথে কর্‌তে খেলা প্রভাত-হাওয়া, ভাই,
শর্‌সে ফুলের পাপড়ি নাড়ি' ডাক্‌ছে মোরে তাই।
চল্‌তে পথে মটরশুঁটি জড়িয়ে দু'খান পা—
বল্‌ছে যেন, 'গাঁয়ের রাখাল একটু খেলে যা!' ১৬
সারা মাঠের ডাক এসেছে—খেল্‌তে হবে, ভাই,
সাঁঝের বেলা কইব কথা, এখন তবে যাই!"

"রাখাল ছেলে, রাখাল ছেলে, সারাটি দিন খেলা—
এযে বড় বাড়াবাড়ি, কাজ আছে যে মেলা।" ২০

"কাজের কথা জানিনে ভাই, লাঙল দিয়ে খেলি,
নিড়িয়ে দেই ধানের ক্ষেতের সবুজ রঙের চেলী।
ঝাউএর ঝাড়ে বাজায় বাঁশী পউষ-পাগল বুড়ী,—
আমরা সেথা চষ্‌তে লাঙল মুর্শীদা-গান জুড়ি। ২৪
খেলা মোদের গান-গাওয়া, ভাই, খেলা লাঙল-চষা,
সারাটা দিন খেলতে পারি, জানিইনেকো বসা।"

—জসীম উদ্দীন

৯৪

কমলারাণীর দীঘি

কমলারাণীর দীঘি ছিল এইখানে,
ছোট ঢেউগুলি গলাগলি ধরি' ছুটিত তটের পানে।
আধেক কলসী জলেতে ডুবায়ে পল্লী-বধূর দল
কমলারাণীর কাহিনী স্মরিত—আঁখি হ'ত ছলছল। ৪
আজ সেই দীঘি শুকায়েছে, এর কর্দ্দমাক্ত বুকে
কঠিন পায়ের আঘাত হানিয়া গরুগুলি ঘাস টুকে।
জলহীন এই শুষ্ক দেশের তৃষিত জলের তরে,
কোন্ সে নৃপের পরাণে উঠিল করুণার জল ভ'রে। ৮
সে করুণা-ধারা মাটির পাত্রে ভরিয়া দেখার তরে
সাগর-দীঘির মহা কল্পনা জাগিল মনের ঘরে।
লক্ষ কোদালি হইল পাগল, কঠিন মাটিরে খুঁড়ি'
উঠিল না হায় কল-জলধারা গহন পাতাল ফুঁড়ি'। ১২
দাও, জল দাও, কাঁদে শিশু মা'র শুষ্ক কণ্ঠ ধরি',
ঘরে ঘরে কাঁদে শূন্য কলসী বাতাসে বক্ষ ভরি'।
লক্ষ কোদালি আরো জোরে চলে, কঠিন মাটির থেকে
শুষ্ক বালুর ধূলি উড়ে যায় উপহাস যেন হেঁকে। ১৬

* * *

কোথায় রয়েছ ভাট ব্রাহ্মণ, কোথায় গণক দল!
জল্‌দী করিয়া গুণে দেখ, কেন দীঘিতে ওঠে না জল?

আকাশ হইতে গুণিয়া দেখিও শত তারা-আঁখি দিয়া,
পাতালে গুণিও বাসুকি-ফণার মণি-দীপ জ্বালাইয়া। ২০
ঈশানে গুণিও ঈশানী-গলের নর-মুণ্ডের সনে,
দক্ষিণে গ'ণো,—শাহ্ মান্দার যেথা সুন্দরবনে।
আকাশ গণিল, পাতাল গণিল, গণিল দশটি দিক,
দীঘিতে কেন যে জল উঠে নাক' বলিতে নারিল ঠিক। ২৪
নিশির শয়নে জোড়-মন্দিরে স্বপন দেখিছে রাণী,
কে যেন আসিয়া শুনাইল তারে বড় নিদারুণ বাণী।
"সাগর দীঘিতে তুমি যদি, রাণী, দিতে পার প্রাণ দান,
পাতাল হইতে শত-ধারা মেলি' জাগিবে জলের বান।" ২৮
স্বপন দেখিয়া জাগিল রে রাণী, পূবের গগন-গায়
রক্ত লেপিয়া দাঁড়াইল রবি সুদূরের কিনারায়।
"শোন শোন, ওহে পরাণের পতি, ছাড় গো আমার মায়া,
উড়ে চ'লে যায় আকাশের পাখী প'ড়ে রয় শুধু ছায়া।" ৩২

পেটরা খুলিয়া তুলে নিল রাণী অষ্ট অলঙ্কার,
রাসমণ্ডল-শাড়ীর লহরে দেহটি জড়াল তার।
কৌটা খুলিয়া সিঁদূর তুলিয়া পরিল কপাল ভরি',
দুর্গাপ্রতিমা সাজিল বুঝি বা দশমীর বাঁশী স্মরি'। ৩৬
ধীরে ধীরে রাণী দাঁড়াইল আসি সাগর-দীঘির মাঝে,
লক্ষ লক্ষ কাঁদে নরনারী দাঁড়ায়ে তটের কাছে।

পাতাল হইতে শতধারা মেলি' নাচিয়া আসিল জল,
রাণীর দুখানি চরণে পড়িয়া হেসে ওঠে খলখল। ৪০
খাড়ু-জলে রাণী খুলিয়া ফেলিল পায়ের নূপুর তার,
কোমর-জলেতে ছিঁড়িল যে রাণী কোমরে চন্দ্রহার।
বুক-জলে রাণী কণ্ঠ হইতে গজমতি হার খুলে'—
কোলের ছেলেটি জয়ধর কোথা—দেখে রাণী আঁখি তুলে'। ৪৪
গলা-জলে রাণী খোঁপা হ'তে তার ভাসাল চুলের ফুল,
চারিধার হ'তে কল-জলধারা ভরিল দীঘির কূল।
সেই ধারাসনে মিশে গেল রাণী, আর আসিল না ফিরে,
লক্ষ লক্ষ কাঁদে নরনারী আকাশ বাতাস চিরে'। ৪৮

* * *

কমলারাণীর এই সেই দীঘি,—কার অভিশাপে আজ
খুলিয়া ফেলেছে অঙ্গ হইতে জল-কুমুদীর সাজ!
পাড়ে পাড়ে আজ আছাড়ি' পড়ে না চঞ্চল ঢেউদল,
পল্লীবধূর কলসীর ঘায়ে দোলে না ইহার জল। ৫২
কমলারাণীর কাহিনী এখন নাহিক' কাহারো মনে,
রাখালের বাঁশী হয় না করুণ নিশীথ-উদাস বনে।
শুধু এই গাঁর নূতন বধূরে বরিয়া আনিতে ঘরে
পল্লীবাসীরা বরণ-কুলাটি রেখে যায় এর' পরে। ৫৬
গভীর রাত্রে সেই কুলাখানি মাথায় করিয়া নাকি
আলেয়ার মত কে এক রূপসী হেসে ওঠে থাকি' থাকি'!

—জসীম উদ্দীন

রূপাই

১

এই গাঁয়ের এক চাষার ছেলে, লম্বা মাথার চুল,—
কালো মুখেই কালো ভ্রমর ! কিসের রঙীন ফুল ?
কাঁচা-ধানের পাতার মত কচি মুখের মায়া,
তা'র সাথে কে মাখিয়ে দেছে নবীন তৃণের ছায়া। ৪
জালি-লাউয়ের ডগার মত বাহু দু'খান সরু ;
গা'খানি তা'র শাঙন-মাসের যেমন তমাল-তরু।
বাদল-ধোয়া মেঘে কে গো মাখিয়ে দেছে তেল,
বিজ্‌লী-মেয়ে লাজে লুকায় ভুলিয়ে আলোর খেল। ৮
কচি ধানের তুল্‌তে চারা হয়ত' কোনো চাষী
মুখে তাহার ছড়িয়ে গেছে কতকটা তা'র হাসি।

'কালো চোখের তারা দিয়েই সকল ধরা দেখি,
কালো দ'তের কালি দিয়েই কেতাব কোরাণ লেখি।' ১২
জনম কালো, মরণ কালো, কালো ভুবনময় ;
চাষীদের ওই কালো ছেলে সব ক'রেছে জয় !
সোনায় যে-জন সোনা বানায়, কিসের গরব তা'র ?—
রঙ পেলে ভাই গড়্‌তে পারি রামধনুকের হার। ১৬
কালোয় যে জন আলো বানায়, ভুলায় সবার মন,
তারি পদ-রজের লাগি লুটায় বৃন্দাবন।

সোনা নহে, পিতল নহে, নহে সোনার মুখ,—
কালো-বরণ চাষীর ছেলে জুড়ায় যেন বুক। ২০
যে-কালো তা'র মাঠেরি ধান, যে-কালো তা'র গাঁও,
সেই কালোতে সিনান করি উজল তাহার গাও।

আখ্ড়াতে তার বাঁশের লাঠি অনেক মানে মানী,
খেলার দলে তারে নিয়েই সবার টানাটানি। ২৪
'জারী'র গানে তাহার গলা উঠে সবার আগে,
"শাল-সুন্দীবেত" যেন ও, সকল কাজেই লাগে।
বুড়োরা কয়,—"ছেলে নয়, ও 'পাগাল' লোহা যেন!
রূপাই যেমন বাপের বেটা, কেউ দেখেছ হেন? ২৮
যদিও রূপা নয়কো রূপাই,—রূপার চেয়ে দামী,
এক কালেতে ওরই নামে সব গাঁ হবে নামী।"

—জসীম উদ্দীন

৯৬

কারায় শরৎ

আজ তোমাদের চারিপাশে সবুজ মাঠের ঘাসে ঘাসে
শরৎ-রবির সোণার আলো ঝরিছে,
আজ প্রভাতে এতক্ষণে রোদ পড়েছে কাশের বনে,
শিউলিতলা সরস ফুলে ভরিছে। ৪

মেঘ্‌লা-দিনের ওড়না ফেলি' চাইছে ভুবন নয়ন মেলি',
রাঙা-মাটি রঙিন আলোয় বাঁচিল ;
আমার শুধু চোখের কাছে আজকে ক'টা পাঁচিল আছে,
সোনার আলোয় ভরেছে সেই পাঁচিল-ও। ৮

আশ্বিনে এই নূতন রোদে মাত্‌ল যে মন কোন্ আমোদে,
কোন্ প্রাণে আজ উঠল যে গান গাহি' রে,
কেমন ক'রে বুঝাই, প্রাতে পেলাম দু'হাত-আঙ্গিনাতে—
মাঠ ভ'রে যা পাওনি তুমি বাহিরে। ১২

আজকে আমার সকল দিকে ঘিরেছে এই ধরণীকে
শ্যাওলা-ধরা পাঁচিল যত পুরানো,
কেউ বা কালো, কেউ বা মেটে লম্বা বা কেউ, কেউ বা বেঁটে;
তাই দেখে আজ যায় না নয়ন ফিরানো ! ১৬

এই পাঁচিলে এম্‌নি ভাবে কতই গেছে কতই যাবে
শরৎ-রবি সোনার তুলি বুলায়ে,
দূরের স্বপন পাখায় মাখি' বস্‌ল হেথায় কতই পাখি,
বস্‌বে কতই বন্দী-হৃদয় ভুলায়ে ! ২০

এই পাঁচিলে কতই রেখায় বাদল-বারির হাতের লেখায়
কতই ছবি কতই আছে রচনা,
ক্বচিৎ কভু হেথা হোথা বুঝেছিলাম তাদের কথা,
তাদের প্রসাদ—তাদের প্রাণের যাচনা। ২৪

আজকে তাদের প্রলাপরাশি বক্ষে আমার ঢুক্‌ল আসি'
দস্যুসম সহসা দ্বার ভাঙিয়া,
আজ পূজা চায় সবাই যেন, শেওলা জলে পান্না হেন,
রাঙা-ইঁটও উঠ্‌ল দ্বিগুণ রাঙিয়া ! ২৮

এই উঠানে, এ জেলখানায় দেখছি আলো দিব্যি মানায়,
দুদিন আগে একথা কই ভাবিনি ;
সকল দিনের দৈন্য নাশি' শরৎ এল মধুর হাসি',
সোনার বান আজ এল ভুবনপ্লাবিনী ! ৩২

ইঁটের পরে ইঁটকে গেঁথে মানুষ রাখে পিঞ্জরেতে
এমন করেই মানুষকে ভাই শুকায়ে,
হঠাৎ আবার সেই কারাতে শরৎ তারে এম্‌নি প্রাতে
দেয় নিখিলের রঙিন চিঠি লুকায়ে। ৩৬

সহসা সেই শুভক্ষণে সব-কিছু হয় মধুর মনে,
একটুতে হয় অনেকখানি দেখা সে,
কঠিন সে হয় কোমল বড়ো, পুরাণো হয় নূতনতরো,
রঙিয়ে ওঠে সকল ফিকে-ফ্যাকাসে। ৪০

আশ্বিনে সেই দিন এসেছে, আলোর নদীর কূল ভেসেছে,
আজ তবে আর আমার কিসের ভাবনা ?
নিখিলে রং ছড়িয়ে যাবে— তোমরা কি তার সবটা পাবে,
হেথায় আমি একটুও কি পাব না ! ৪৪

বাইরে আলো, দুষ্ট ছেলে— মাঠে মাঠে বেড়ায় খেলে—
ধরার নয়ন ভরে স্বপন-আবেশে,
হেথায় আলো, লক্ষ্মী-মেয়ে— করুণ চোখে রয় সে চেয়ে,
যায় কি পারা থাকতে ভাল না বেসে ! ৪৮

—প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

৯৭

মজঃফরপুরে ভূমিকম্প

সহসা শরীর টলিয়া উঠিল, হাতের কলম কাঁপিল কেন ?
মাথা ঘোরে কি ও, এ কী মুশ্‌কিল, চেয়ার টেবিলও কাঁপিছে যেন!
ও কী কোলাহল—"পালাও, পালাও", হুড়্‌মুড়্ ক'রে ছুটিছে সবে,
সহসা পবন হোলো উতরোল ঘণ্টা-কাঁসর-শঙ্খ-রবে। ৪

"ভূঁই ডোল্‌, ভেইয়া, ভূঁই ডোল্‌" ওরে ভূমিকম্প-এ সর্ব্বনাশ !
বাসুকি-নাগের শির টলিতেছে, কোথা প্রাণ ল'য়ে পালাতে চাস্ ?
ঘরের বাহির হইতে-সে ঘর ধূলিসাৎ হোলো একটি পলে,
চারিদিকে বাড়ী চুরমার হয়, মাতালের মতো বাকিরা টলে ! ৮

পায়ের নিচেতে চির-স্নেহময়ী মাটীর ধরণী ধরে না ভার—
চির-শ্যামলিয়া সর্ব্বংসহা মাতা যে ভরসা দেয় না আর !
কাঁপে থরথর যত জীব-জড়—মাটির খেলেনা কাঁপিছে যত;
আকাশের আলো নিচে নেমে এসে কাঁপে থরথর
ভীরুর মত। ১২
ধূলামাটি-গাঁথা রাজার প্রাসাদ, হাজার রম্য অট্টালিকা—
তা'রা অসহায় ধূলিতে লুটায়, খণ্ডিবে কেবা ললাট-লিখা !

ছুটে যাই মাঠে, ও কী ও সহসা মাটি ফেটে ওঠে ঘোলাটে জল !
গন্ধকভরা গন্ধ-ফোয়ারা উচ্ছলি' ওঠে অনর্গল। ১৬

দেখিতে দেখিতে প্লাবি' প্রান্তর, প্লাবিয়া মোদের চতুর্দ্দিক—
ছুটে এল জল, ধ্বংসপাগল,—হেরি মৃত্যুরে নির্নিমিখ।
হেরি ধরণীর বক্ষ বিদারি' লক্ষধারায় অশ্রু ছুটে ;
রুদ্ধ বেদনা ধূম্র হইয়া শতেক রন্ধ্রে ঊর্দ্ধে উঠে! ২০

যতদূর যায় আঁখির দৃষ্টি, ধ্ব'সে পড়ে বাড়ি উড়ায়ে ধূলি,
গর্জ্জিয়া জল ধেয়ে ছুটে যায় সর্পের মতো চক্র তুলি'।
ইঁটের কাঠের স্তূপ হয়ে ওঠে নরনারী-শিশু-কবর শেষে ;
ভাসাইয়া লয় ভাঙা খোড়ো চাল ওধারেতে জল অট্টহেসে'। ২৪
গোরু চ'লে যায় একদিকে, আর বাছুর চলেছে অন্যধারে,
কাতর হাম্বা-ধ্বনি ডুবে যায়, ধ্বংসলীলার হুহুঙ্কারে।

মাটি ফেটে ওঠে অনল-হল্‌কা, কাদা ওঠে আর উঠিছে ধূম—
কাদা ও মাটির দ্বীপের উপরে কেহ বা ঘুমায় করাল ঘুম। ২৮
শিশুকোলে মাতা করে হাহাকার, আর দুটি ছেলে ইঁটের তলে ;
পিতার বক্ষে কোথাও বালিকা মাতারে খুঁজিছে নয়নজলে।
'ওগো ছোটো খোকা বিছানায় আছে' ব'লে যে জননী
ঢুকিল ঘরে,—
খোকারে স্বামীর হাতে না দিতেই, তার শিরে ছাদ
ভাঙিয়া পড়ে। ৩২
রুগ্ন ছেলেটি দোতালায় শুয়ে, হাড় ও চামড়া হয়েছে সার—
সকলে ছুটিয়া মাঠে জড়ো হোলো—সে ও তার মাতা
হোলো না বা'র।

প্রাণাধিক প্রিয়া, ছেলেমেয়ে আর, বাঁচাইতে গিয়ে কেহ বা হোথা
সবাকার সাথে বসত-ভিটাতে চিরদিন তরে রহিল পোঁতা। ৩৬

কাঁদিবার লাগি' কোথাও বা জাগি' রহিল না বেঁচে জনপ্রাণী,
ধুয়ে মুছে সব সাফ্ ক'রে নিল ধ্বংসদেবের রুদ্রপাণি।
বিকৃত অঙ্গ ব্যথায় বিকল—অর্দ্ধ-প্রোথিত ধ্বংস-স্তূপে,
কাঁদিছে হেথায় নর-নারায়ণ অতি অসহায় মানবরূপে। ৪০
করে হাহাকার শ্মশানমাঝারে অভাগা আতুর দুঃস্থদল,
হিমে হি-হি করে শূন্য-উদরে, পান করে লোনা চোখের জল।
যারা বাঁচিলেও বাঁচিতে পারিত কেবা তাহাদের টানিয়া তোলে ?
শকট-বোঝাই রাশি রাশি শব স্থান পাইতেছে নদীর কোলে। ৪৪

ধরণীর বোঝা ধরিতে পারে না, ক্লান্ত বাসুকি পাপের ভারে,
তাই বুঝি তার ফণা সহস্র হেলায়ে ধরায় ঈষৎ নাড়ে !
মাটি ফুঁড়ে ওঠে তারই নিশ্বাস, বিষধূমরাশি ছড়ায় নভে,
গন্ধক-জল হয়তো তরল তাহারি ফণার গরল হবে। ৪৮
ওই হাহাকার ওঠে ব্যোমপথে লক্ষ মানব-কণ্ঠ-চেরা,
রম্যনগরী চারিদিকে আজ শ্মশান—সলিল-সমাধি-ঘেরা !

—রামেন্দু দত্ত

৯৮

আক্‌বর

হে সম্রাট্‌, ব'সে আছি আজি তব সমাধির পাশে,
একান্ত বিজন।
দূর হ'তে অরণ্যের অন্ধকার ভেদি' ভেসে আসে
বিহগ-কূজন। ৪

নীরব মধ্যাহ্ন-বেলা, শব্দহীন নিঃসাড় ভুবন,
কেহ কোথা নাই ;
অকস্মাৎ মর্ম্মরিল তরুশাখে মন্থর পবন—
চমকিয়া চাই। ৮

জীবনের গতি হেথা আসিয়াছে মন্দ হ'য়ে ধীরে,
নাহিক স্পন্দন ;
বন্দী হ'য়ে কেঁদে ফিরে সমাধির পাষাণ-প্রাচীরে
স্মৃতির ক্রন্দন ! ১২

কত দিবসের ব্যথা, জীবনের আবেগ উত্তাল
গিয়াছে নিভিয়া ;
স্মৃতির কন্দরে মম শতাব্দীর অন্ধকার-জাল
উঠে শিহরিয়া ! ১৬

তোমার হৃদয় ভরি' জেগেছিল কি মহা স্বপন!—
এ ভারত-ভূমি,
এক ধর্ম্ম, এক রাজ্য, এক জাতি, একনিষ্ঠ মন,—
বেঁধে দিবে তুমি! ২০

সমাজ-আচার-ভেদ, ধর্ম্মভেদ ভুলে যাবে সবে;
রহিবে স্মরণ—
এক মহাদেশে বাস, চিরদিন এক সাথে হবে
জীবন মরণ! ২৪

হায়! স্বপ্ন টুটে যায় কঠিন ধরার ধূলা লাগি',
দেখি আঁখি মেলি'—
ক্রূর সর্পসম হিংসা হিয়া-তলে রহিয়াছে জাগি',
উঠিছে উদ্বেলি'। ২৮

বিদ্বেষ সমুদ্রসম আস্ফালিয়া করিছে গর্জ্জন
ছাইয়া হৃদয়;
নীরব আকাশ-তলে প্রতি পলে বাজিছে ক্রন্দন,
রক্তধারা বয়! ৩২

ধরণীর শ্যাম শোভা ক্লিষ্ট আজি রক্তের ধারায়,
ভা'য়ের শোণিতে;
আকাশের শান্ত সৌম্য নীরবতা শুধু ভেঙ্গে যায়
সংগ্রাম-ধ্বনিতে! ৩৬

স্বার্থে স্বার্থে দ্বন্দ্ব লাগে, রক্ত ঝরি' পড়ে অহর্নিশি,
উঠে শূন্য-পানে
ক্রন্দন-গর্জ্জন-রোল, অভিশাপ-হাহাকার মিশি',
কাহার সন্ধানে ? ৪০

তোমার সমাধি-পাশে বসি' আজি পড়ে মোর মনে
তোমার কীরিতি ;
নিখিল ভারত ভরি' উঠেছিল ধ্বনিয়া গগনে
মিলনের গীতি ! ৪৪

তোমার মহৎ হিয়া পুনর্ব্বার আসুক ফিরিয়া
আমাদের মাঝে ;
আত্মদ্বন্দ্ব-সর্ব্বনাশ আমাদের রেখেছে ঘিরিয়া
অপমানে লাজে ! ৪৮

হে মহৎ, তব বাণী নিখিল ভারত ভরি' আজি
জাগুক আবার ;
উঠুক মিলন-মন্ত্র সাম্যবাদ কম্বুকণ্ঠে বাজি'
টুটিয়া আঁধার ! ৫২

হিংসা-দ্বেষ—মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মতো—শঙ্কাভরে
হোক্ শান্ত হোক্ ;
আঁধারের প্রাণী যত ফিরে যাক্ আঁধার বিবরে,
নামুক আলোক ! ৫৬

—হুমায়ুন কবির

৯৯
হারানো টুপি

(১)

টুপি আমার হারিয়ে গেছে
হারিয়ে গেছে ভাই রে,
বিহনে তার এই জীবনে
কতই ব্যথা পাই রে ! ৪
হাস্‌বে লোকে শুনলে পরে
হারাল সে কেমন ক'রে,
কেমন ক'রে বৈশাখী ঝড়
উড়িয়ে দিল মোর সে টুপি, ৮
বুঝেছি হায় টুপির লোভে
দেব্‌তাদেরই এ কারচুপি।

(২)

থাক্‌ত টুপি দুপুর রোদে
ছায়ার মতোই মাথায় মম, ১২
কখনো বা বাতাস পেতাম
ঘুরিয়ে তারে পাখার সম।
বক্ষে তাহার নিতুই প্রাতে
ফুল রেখেছি আপন হাতে, ১৬

সে ছিল মোর ফুলদানি আর
ফুলের সাজি একসাথে হায়,
জানিনে আজ কোথায় গেছে
কোন্ দেশে সে কোন্ অলকায়! ২০

(৩)

হয়তো এখন পবনদেবের
মাথায় আছে সেই টুপি মোর,
এদিকে তার বিচ্ছেদে হায়
আমার চোখে ঝরতেছে লোর! ২৪
ভুলতে নারি টুপির প্রীতি,
জাগছে হৃদে শুধুই স্মৃতি,—
বিদেশ গেলে বালিশ হোত
হায় সে টুপি মোর শিয়রে, ২৮
চলতে পথে সেলাম পেতাম
থাকলে টুপি মাথার 'পরে।

(৪)

তিনটি টাকায় কিনেছিলাম
"চাঁদ্নি" হতে সেই টুপিরে, ৩২
তিনশ' টাকা দিবই আজি
পাই যদি ফের তারেই ফিরে'।

চার মিনিটে 'চসার' প'ড়ে
শেষ করেছি টুপির জোরে,— ৩৬
পরীক্ষাতে প্রথম হতাম
থাক্‌লে টুপি মাথার 'পরে ;
দুখের দিনের বন্ধু টুপি—
কোথায় গেলি আজকে, ওরে ! ৪০

(৫)

আজিও হায় নিমন্ত্রণে
গেলে সভার মধ্যিখানে,
সব ভুলে' যে প্রথম আমি
তাকাই লোকের মাথার পানে। ৪৪
দেখি কেবল চুপি চুপি
কার শিরে রয় আমার টুপি,—
মিলে না খোঁজ, সভার থেকে
ফিরে আসি শুষ্ক মুখে, ৪৮
নূতন টুপি কিন্‌ব না, ভাই,
পণ করেছি মনের দুখে।

—কাজী কাদের নওয়াজ

১০০

গান ও প্রাণ

নিশি হল ভোর ;
জনম লভিছে দিন
নবীন আশায়,
ক্ষণিক ঢাকিছে তারে ৪
কুয়াসা পাখায় ;
ফুল ত উঠেছে ফুটি,
গন্ধে মনোচোর—
নিশি হ'ল ভোর। ৮

এবে চাই প্রাণ !
দাও লক্ষ দুঃখ শোক,
লক্ষ লাজ ভয়,
দাও দৈন্য প্রতিদিন ১২
নব বিঘ্নময়,—
তুচ্ছ বলি সবে আমি
করিব গেয়ান,
শুধু চাই প্রাণ ! ১৬

রেখে দিনু গান।
প্রাণ আছে ?—আছে গান,
আছে কথা, কাজ।
প্রাণ নাই ?—বৃথা কর্ম্ম, ২০
—ফানুসের সাজ !
গান সেথা শক্তিহীন
কথারি তুফান,—
চাহিনা চাহিনা গান, ২৪
দাও দাও প্রাণ !

কুমুদনাথ লাহিড়ী

সম্পূর্ণ

'কাব্য-মঞ্জুষা'র

উন্মোচনী

(ছাত্রগণের জন্য)

কবিতার কথা

কবিতা কাহাকে বলে—

কবির প্রাণে, প্রকৃতির নানা দৃশ্য, অথবা মনুষ্য-জীবনের নানা ঘটনা যে সকল ভাবের উদ্রেক করে, তাহাকে ছবির মত প্রত্যক্ষ এবং গানের মত মধুর করিয়া যে ছন্দোবদ্ধ বাক্যে তিনি প্রকাশ করেন—সাধারণতঃ তাহাকেই আমরা কবিতা বলি। এইরূপ রচনা পাঠ করিলে আমাদের প্রাণেও সেই সকল ভাবের সঞ্চার হয়—কবির প্রাণের সেই আনন্দ-বিষাদ, আশা-উৎসাহ, বিস্ময়-কৌতুক আমরাও অনুভব করি; এবং, যে কবিতার যে ভাব,—তাহা যদি খুব সুস্পষ্ট, সুন্দর ও যথাযথ ভাবে ভাষায় ও ছন্দে প্রকাশ পাইয়া থাকে, তবে সেই কবিতা উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়।

পদ্য ও গদ্য—

ছন্দ ও মিল থাকিলেই, রচনাকে পদ্য-রচনা বলা যায়, এবং তাহা যে গদ্য নয় তাহাও আমরা বুঝি। কিন্তু ছন্দ ও মিল থাকার জন্য রচনাকে 'পদ্য' নাম দেওয়া গেলেও, তাহা কবিতা না হইতেও পারে; কারণ, যাহাতে কোন একটি ভাব বা কল্পনা সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠে নাই, তাহা যেমন ভাল কবিতা নয়—তেমনই, যাহার বিষয় এমন যে, গদ্যেই তাহা প্রকাশ করা যাইত—তাহাকে কবিতা নাম দেওয়া যায় না। এইজন্য, 'পদ্য' ও 'কবিতা' এই দুইটি শব্দের অর্থ যে এক নয়, তাহা মনে রাখা দরকার; কোন কিছু পদ্যে অথবা গদ্যে লেখা হইয়াছে, এইরূপ বলা যায় মাত্র; অর্থাৎ, ও দুইটা নাম রচনারীতির নাম মাত্র। ইংরাজীতেও পদ্যের নাম—Verse, কবিতার নাম—Poem। এখন দেখিতে হইবে, রচনা এই দুই রকমের হয় কেন? তোমরা ছেলেবেলা হইতে ইংরাজী ও বাংলা অনেক

কবিতা, এবং গদ্য-রচনাও পড়িয়াছ; অতএব, এই দুই ধরণের রচনার পার্থক্য কি, তাহা নিশ্চয় লক্ষ্য করিয়াছ। কবিতা পড়িয়া আমরা আনন্দ পাই—যেমন আনন্দ আমরা গান শুনিয়া বা ছবি দেখিয়া পাই; গদ্য বলিতে যাহা বুঝি তাহাতে ঠিক এইরূপ আনন্দ পাই না, জ্ঞানের বা শিক্ষালাভের আনন্দ পাই। গদ্য আমাদিগকে বিদ্বান ও বুদ্ধিমান করিয়া তোলে, কবিতা আমাদিগকে ভাবুক ও সহৃদয় করে।

কবিতা কেমন করিয়া পড়িতে হয়—

অতএব, আমরা গদ্য যে উদ্দেশ্যে পড়ি, কবিতা সেই উদ্দেশ্যে পড়ি না; এজন্য কবিতা পড়িবার নিয়মও স্বতন্ত্র। প্রথমতঃ, ছন্দ রহিয়াছে বলিয়া উহা আবৃত্তি করিয়া পড়িতে হয়; নতুবা ছন্দের প্রয়োজন কি? ছন্দের কথা পরে বলিব; এক্ষণে শুধু ইহাই বলা আবশ্যক যে, কবিতার ভাব-অর্থ বুঝিবার আগে তাহাকে কাণে শুনিতে হইবে। কাণে শুনিতে শুনিতেই ভাবটি মনের মধ্যে প্রবেশ করে—অন্ততঃ, কবিতাটির ভাব-অর্থ বুঝিবার মত অবস্থা ঐ ভাষার আওয়াজ শুনিয়াই মনের মধ্যে জাগে। কবিতা আবৃত্তি করিতে যে ভাল লাগে, তাহার কারণ কেবল ছন্দই নয়—ভাষা ও শব্দের গুণে ছন্দ আরও সুন্দর হইয়া উঠে। অতএব, কবিতা ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে, ভাল করিয়া পড়িতে হইবে। এখানে ভাল করিয়া পড়ার নামই ভাল করিয়া বোঝা; কারণ, কবিতার ভাবটাই আসল; যত অর্থ, বা যত শিক্ষার বিষয় তাহাতে থাকুক—সেই সকলের মূলে যে ভাবটি আছে কেবল তাহাই আমাদের প্রাণে সঞ্চারিত হওয়া চাই। এজন্য কথার শুধু অর্থ ই নয়—কথার সৌন্দর্য্যও বুঝিতে পারা চাই। কথার সৌন্দর্য্য যে কত রকমের হইতে পারে, তাহা ভাল কবিতা পড়িলেই আমরা বুঝিতে পারি। কবিরা বড় সাবধানে শব্দ প্রয়োগ করেন—কারণ, ছন্দের সঙ্গে মিলিয়া

তাহার আওয়াজটি মধুর হওয়া চাই ; আবার, এক একটি কথাতেই, বা খুব সুনির্ব্বাচিত অল্প কথাতেই, ভাবটি খুব যথার্থ ও সুন্দরভাবে প্রকাশিত হওয়া চাই ; কথা যত অল্প হয়, তাহার ভাব ততই গভীর হইয়া থাকে। অতএব, তোমরা বুঝিতে পারিতেছ, গদ্য পড়িবার সময়ে ভাষার যে দিকটিতে লক্ষ্য রাখিতে হয়, কবিতা পড়িবার সময় ঠিক সেই দিক নয়—আর এক দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয় ; কথার কেবল অর্থ নয়, তাহার ধ্বনির সৌন্দর্য্য, এবং তাহার ভাবের অপূর্ব্বতা আরও ভাল করিয়া অন্তরে গাঁথিয়া লইতে হয়। কবিতা পড়িবার সময়ে, প্রথমেই কথার অর্থের জন্য অভিধান দেখিবে না—কাণে ও মনে যে কথাটি, যে লাইন বা লাইনগুলি, পড়িবামাত্র ভাল লাগিয়াছে, তৎক্ষণাৎ সেগুলিকে পেন্সিল দিয়া চিহ্নিত করিবে ; পরে, ভাল লাগার কারণ বুঝিয়া সেই কথাগুলি অভ্যাস করিবে। দেখিবে, একটি শব্দের পাশে আর একটি শব্দ এমনভাবে রহিয়াছে যে, তাহাতেই কথাগুলি শুনিতে যেমন মিষ্ট, অর্থ তেমনই সুন্দর হইয়াছে ; হয়ত বা, কথাটি একটি নূতন অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে—তাহাতেই কথাটি এমন মনে লাগিতেছে। এমনই করিয়া কবিতার ভাষা ও ভাব—উভয়ের সৌন্দর্য্য বুঝিবার চেষ্টা করিবে ; নূতন ও সুন্দর কথাগুলি কণ্ঠস্থ করিবে ; যে লাইনগুলি খুব ভাল লাগিয়াছে তাহাও স্মরণ রাখিতে চেষ্টা করিবে। কবিতাটির মূল ভাব কি, তাহা তোমরা নিজেরাই একরূপ বুঝিবে—যেটুকু বুঝিতে পারো, আপাতত তাহাই যথেষ্ট ; তারপর, আবশ্যক হয়, শিক্ষকের কাছে আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝিয়া লইবে। মোটের উপর, কবিতাটি বার বার পড়িয়া নিজেই যতটা পারো বুঝিতে চেষ্টা করিবে, প্রথমেই তাহার অর্থ সম্বন্ধে ভীত বা চিন্তিত হইবে না ; কেবল, পড়িবার আগে যদি কেহ কবিতাটি ভাল করিয়া পাঠ করিবার কৌশলটি দেখাইয়া দেন, সেইটুকু মাত্র সাহায্য পাইলে খুব ভাল হয়। আমি তোমাদিগকে

একটা বিষয়ে সাহায্য করিব, কবিতার মধ্যে যদি কোন লাইন, কোন কথা বা শব্দ, বিশেষ লক্ষ্য করিবার এবং মনে রাখিবার মত হয়, তবে তাহা দেখাইয়া দিব।

কবিতা কয় প্রকার –

সব কবিতা যে এক শ্রেণীর নয়, তাহা পড়িলেই বুঝিতে পারিবে। কোন কবিতায় কবি কেবল কোন বস্তুর রূপ বর্ণনা করিতেছেন; কোনটিতে এমন একটি ঘটনা বা চরিত্র বর্ণনা করিতেছেন যাহা আমাদের চিত্তে কৌতুক, বিস্ময় অথবা প্রশংসার ভাব জাগায়; কোনটিতে একটি প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি আঁকা হইয়াছে; কোনটিতে, কেবল বাহিরের সৌন্দর্য্যই নয়—সেই দৃশ্য দেখিয়া কবির অন্তরে যে বিশেষ ভাবটি জাগিয়াছে, তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে। কোন কবিতায়, কবি মনুষ্য-জীবনের মহৎ আদর্শে আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করিতেছেন; কোনটিতে ন্যায়-অন্যায়, মঙ্গল-অমঙ্গল সম্বন্ধে আমাদের মনকে সজাগ করিয়া, উপমা ও দৃষ্টান্ত দ্বারা নানা উপদেশ দিতেছেন। এইরূপ নানা-রকমের কবিতাকে আমরা মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ভাগ করিতে পারি। প্রথম,—যে সকল কবিতা খুব বড় এবং যাহাতে একটা গল্প বলা হইতেছে। এ ধরণের কবিতাকে 'মহাকাব্য', অথবা 'কাহিনী-কাব্য' বলা যায়। এ পুস্তকের সকল কবিতাই ছোট—অর্থাৎ খণ্ড কবিতা; খণ্ড কবিতার আর এক নাম 'গীতিকবিতা'। এই 'গীতিকবিতা' আর এক শ্রেণীর কবিতা। গীতিকবিতার লক্ষণ এই যে, তাহাতে বাহিরের ঘটনা বা বস্তু, বা মানুষের বাহিরের পরিচয়টাই বড় নয়,—সেই সকলের মধ্যে কবি যাহা অনুভব করেন, কিম্বা, বাহির হইতে নয়, কবির নিজেরই অন্তরে যে সকল ভাবের উদয় হয়,—সেই সকল ভাবই, সুন্দর ছন্দে, মধুর আবেগের সহিত ব্যক্ত করিয়া

থাকেন। কোন একটি ঘটনা বা চরিত্র লইয়া, ছোট গল্পের মত করিয়া, এক রকম গীতিকবিতাও লেখা হয়; সেখানেও গল্পটা বড় নয়, গল্পের ভাব এবং ছন্দ ও সুরটাই বড়; তাই সেরূপ গীতিকবিতাকে—'গীতি-কথা' নাম দেওয়া যাইতে পারে। এই পুস্তকে তেমন কবিতাও দেখিতে পাইবে। যে সকল কবিতায় নীতি-উপদেশ আছে, তাহাও গীতিকবিতার আকারে রচিত হয় বটে, কিন্তু তাহাকে 'নীতি-কবিতা' নাম দিলেই ভাল হয়; সেরূপ কবিতা পড়িলেই চিনিতে পারিবে। সর্ব্বশেষে, আর এক রকমের কবিতার উল্লেখ করা দরকার—এই পুস্তকে তেমন কবিতা দুই চারিটি আছে; ইহাদিগকে ভগবদ্ভক্তিমূলক, বা ভক্তিমূলক কবিতা বলা যাইতে পারে। ইহাও রীতিমত গীতি-কবিতা; কারণ, ইহাতেও কবির অন্তরের একটি গভীর ভাব ব্যক্ত হয়; তফাৎ এই যে, সেই ভাব সাধারণ কবিতার ভাব নয়; সে ভাব খুব উচ্চ এবং পবিত্র হইলেও, অন্য সকল ভাবের মত সহজেই সকলের প্রাণে জাগে না। আশা করি, সংক্ষেপে এই যাহা বলিলাম, ইহা হইতেই, কোন্ কবিতা কোন্ শ্রেণীর—তাহা বুঝিতে পারিবে, এবং তাহাতে যেমন, প্রত্যেক শ্রেণীর বিচার তাহার দিক দিয়া করিতে পারিবে, তেমনই, তোমাদের কাহার কোন্ রকম কবিতা ভাল লাগে, তাহাও জানিতে পারিবে।

বাংলা কবিতার ছন্দ

এইবার, কবিতা পড়িবার আগে যাহা জানা সবচেয়ে বেশি দরকার, সেই ছন্দের কথা বলিব। এখানে আমি ছন্দের রীতিমত ব্যাকরণ লিখিব না; যাহাতে তোমরা কবিতাগুলির ছন্দ ঠিক রাখিয়া পড়িতে পার, তাহার জন্য যতদূর সম্ভব সহজ ভাষায় এবং সংক্ষেপে, বাংলা ছন্দের একটু পরিচয় দিব; তোমরাও খুব মনোযোগ দিয়া পড়িবে।

প্রত্যেক কবিতার প্রথম লাইনটি পড়িতে গেলেই দেখিবে—কথাগুলি একটানা পড়া যায় না, মধ্যে মধ্যে ছেদ দিয়া পড়িলে পড়ার আর কোন অসুবিধা হয় না। কিন্তু দুই চারিটি পুরানো ছন্দের কবিতা ছাড়া, আধুনিক কালে—রবীন্দ্রনাথের যুগে—বাংলা কবিতায় যে সব নূতন ছন্দের আমদানি হইয়াছে তাহাতে, ঐ প্রথম লাইনের ছেদগুলি সব সময়ে সহজে ধরা যায় না, তাই অনেকে কবিতা ঠিকমত পড়িতেই পারে না। আমি এই ছেদগুলি কোন্ কোন্ ছন্দে—কেন কোথায় পড়ে, তাহাই বুঝাইয়া দিব, তাহা হইলেই কবিতার ছন্দ বুঝিয়া পড়িতে পারিবে।

ছন্দ বলিতে এক রকম মাপ (measure) বোঝায়। গদ্যের লাইনের কোন মাপ নাই, কবিতার লাইনের মাপ আছে। আমাদের কবিতার ছন্দের মাপ হয়—অক্ষর গুণিয়া। কবিতার এক একটি লাইনকে 'চরণ' বলে; প্রত্যেক চরণের ঐরূপ মাপ থাকে, যেমন—১০, ১২, ১৪, ১৮, ২২ অক্ষরের চরণ। বাংলা পুরাণো ছন্দের মধ্যে দুইটিই প্রধান—'পয়ার' ও 'ত্রিপদী'। 'পয়ার' এই রকম—

মহাভারতের কথা | অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে | শুনে পুণ্যবান॥

ইহার প্রত্যেক লাইন বা চরণে ১৪ অক্ষর আছে ; লাইনের মধ্যে একটি মাত্র ছেদ আছে—৮ অক্ষরের পরে। এই ছেদই সেই ছন্দ পড়িবার ছেদ ; ইহার নাম 'যতি', অর্থাৎ থামিবার জায়গা—ইংরাজীতে 'Caesura' বলে। কিন্তু আসলে থামিতে হয় লাইনের শেষে—মাঝের ঐ থামাটুকু ছন্দ পড়িবার জন্য দরকার। এ ছন্দে, ঐ দুই লাইনে এক একটি কবিতা সম্পূর্ণ হয়- দুই লাইনে মিল থাকাও চাই ; প্রথম লাইনের শেষে অল্প, এবং দ্বিতীয় লাইনের শেষে—পূর্ণ বিরাম বা Pause। বড় কবিতা লিখিতে হইলে, এই রকম জোড়ায় জোড়ায় লাইন গাঁথিয়া গেলেই হয়। 'ত্রিপদী'তে দুইটি ছেদ থাকে, অর্থাৎ, পয়ারের যেমন প্রত্যেক চরণে দুইটি পদ থাকে, 'ত্রিপদী'তে তেমনই তিনটি পদ থাকে। পদগুলি পৃথক করিয়া লেখা থাকে বলিয়া পড়াও খুব সহজ ঃ—

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল ॥

কিম্বা—

যত আনি তত নাই না ঘুচিল খাই খাই
কিবা সুখ এ ঘরে থাকিয়া।
এত বলি দিগম্বর আরোহিয়া বৃষোপর
চলিলেন ভিক্ষার লাগিয়া ॥

এক দাঁড়ি ও দুই দাঁড়ি দেখিয়া বুঝিতে পারিবে, ইহার চরণ দুইটি কত বড়—ঐ দাঁড়ি মিলের চিহ্নও বটে। মধ্যে যে দুইটি করিয়া ছেদ আছে, তাহাতে প্রত্যেক পদের অক্ষর, এবং চরণের মোট অক্ষর গুণিয়া দেখ ; আরও দেখ, ইহার চরণে, প্রথম দুইটি পদে মিল থাকে ; আবার, না

থাকিতেও পারে। যাহা হউক, এই দুই ছন্দের 'ছেদ' অতিশয় স্পষ্ট, এবং ইহার মাপের নিয়মও খুব সহজ, অতএব এই পুরাণো ছন্দ সম্বন্ধে আর কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই—তোমরা ছন্দ সম্বন্ধে কিছু না জানিয়াও এরূপ কবিতা অনায়াসে পড়িতে পারিবে।

কিন্তু আধুনিক কবিতার নূতন ছন্দ পড়িবার সময়ে তাহার চরণের ছেদগুলি সব সময়ে সহজে ধরা যায় না, কারণ, এখানে যতি ছাড়াও আর এক রকমের নিয়মিত ছেদ আছে; এই ছেদ খুব অল্প হইলেও, কবিতা আবৃত্তির পক্ষে লক্ষ্য রাখা দরকার। তাই ইহার ছেদের নিয়ম জানিয়া রাখা ভাল। পুরাণো ছন্দের চরণে ছেদ পড়ে এক একটি 'পদে'র পরে, তাহাকেই 'যতি' বলে। এ ছন্দের চরণে, সেইরূপ যতি ছাড়া, প্রতি 'পর্ব্বে'র পরে একটু ছেদ পড়ে। পর্ব্ব ও পদে তফাৎ কি? দুই-ই—ছন্দ-অনুসারে চরণের যে ভাগ হয়—সেই ভাগ; 'পয়ার' ও 'ত্রিপদী'র পদ-ভাগ দেখিয়াছ, এই নূতন ছন্দের ভাগ কিরূপ, অর্থাৎ ছেদগুলি কোথায় পড়ে, দেখ—

(১) চিত্তহারিণী | জাপানী বালিকা ‖ ওহারু তাহার | নাম
(২) নন্দপুর | চন্দ্র বিনা ‖ বৃন্দাবন | অন্ধকার
(৩) ছায়া নামে | তমালের | বনে বনে

এইরূপ ভাগকে 'পর্ব্ব' নাম দিয়াছি। পদ ও পর্ব্বে তফাৎ কি তাহা লক্ষ্য কর। পদগুলি পর্ব্বের চেয়ে বড় হইতে পারে, এবং সেগুলি ঠিক এই রকম সমান মাপের—যেন ছক্-কাটা—হয় না। পদে যেমন ৬, ৮, ১০ অক্ষর থাকে—একই চরণে এই রকম ছোট-বড় পদও থাকে; পর্ব্বে ২, ৪, ৫ অক্ষর থাকে, কিম্বা, ২+৩, ৩+৪—এইরূপ যোগ দেওয়া অক্ষর-সংখ্যাও থাকে, কিন্তু পর্ব্বগুলি সব এক মাপের হইয়া থাকে। এজন্য কেবল একটি পর্ব্বের মাপ জানা থাকিলেই হইল, ঠিক

সেই মাপে ভাগ করিয়া, অর্থাৎ ছেদ দিয়া, পড়িলেই ছন্দটি ধরা যায়। এখানেও চরণের মধ্যে যেখানে বড় ছেদ বা যতি আছে, সেখানে আমি (॥) এইরূপ ডবল দাঁড়ি-চিহ্ন দিয়াছি। আরও একটি কথা আছে; পর্ব্বের অক্ষর গণিবার সময়ে যুক্ত-অক্ষরকে দুই অক্ষর ধরিতে হইবে,—যদি তাহা শব্দের মধ্যে বা শেষে থাকে, যেমন, 'নন্দপুর'—চার অক্ষর নয়, পাঁচ অক্ষর; 'চিত্তহারিণী'—পাঁচ অক্ষর নয়, ছয় অক্ষর। আরও দেখিবে, এ ছন্দে, প্রায়ই চরণের শেষের পর্ব্বটি পূরা না হইয়া খণ্ড-পর্ব্ব হয়—যেমন উপরের ঐ প্রথম উদাহরণে দেখিতেছ।

অতএব, এ পর্য্যন্ত দুই জাতের ছন্দ দেখিলে—(১) পদ-ভাগের ছন্দ, এবং (২) পর্ব্ব-ভাগের ছন্দ। কিন্তু আরও এক জাতের ছন্দ আছে—সেও পর্ব্বভাগের ছন্দ বটে, কিন্তু তাহার নিয়ম অন্যরূপ। প্রত্যেক পর্ব্বে চারিটি অক্ষর থাকে—এখানে অক্ষরের হিসাব হয় কেবল স্বরান্ত বর্ণগুলি লইয়া, গণিবার সময়ে হসন্ত-বর্ণ বাদ দিতে হয়, যেমন—

পায়ের তলায় | নরম ঠেক্‌ল | কি ?
শুন্‌তে যাব | ভারত কথা ॥ রামায়ণের গান
সাঙ্গ হ'লে | দিনের খেলা ॥ খেয়ে চারটি | তাড়াতাড়ি

পর্ব্বের অক্ষর সোজাসুজি গণিতে গেলে দেখিবে—কোনটায় ৪, কোনটায় ৫, আবার কোনটায় ৬ অক্ষর আছে; কিন্তু হসন্ত বর্ণগুলি যদি বাদ দাও, তবে দেখিবে, সর্ব্বত্র চারিটি অক্ষরই আছে, যেমন—পায়ে (র্) তলা (য়্); শু (ন্) তে যাব; নর (ম্) ঠে (ক্) ল; দিনে (র্) খেলা। এ পর্ব্বের যুক্ত-অক্ষরও দুই অক্ষর নয়। এ ছন্দকে 'ছড়ার ছন্দ' নাম দিলেই ভাল হয়; কারণ, যত পুরাণো ছড়া এই ছন্দেই রচিত হইত, যেমন—

বিষ্টি পড়ে | টাপুর টুপুর ॥ নদী এল | বান

এ ছন্দের জাত যে সম্পূর্ণ পৃথক, তার কারণ, ইহার ভাষাটা সাধু ভাষা নয়, চল্‌তি ভাষা। এজন্য দেখিবে, পড়িবার সময়ে প্রত্যেক পর্ব্বের প্রথম অক্ষরটিতে একটা ঝোঁক বা উচ্চারণের জোর পড়ে—ইংরেজী accent-এর মত ; যেমন—

বিষ্‌টি পড়ে | টাপুর টুপুর | নদী এল | বান

সাঙ্গ হ'লে | দিনের খেলা | খেয়ে চারটি | তাড়াতাড়ি

—প্রত্যেক পর্ব্বের গোড়ায় এই রকম একটু জোর দিয়া পড়িলে ছন্দটি কাণে বেশ বাজিয়া উঠিবে। এ ছন্দেও 'খণ্ড পর্ব্ব' থাকে। তাহা হইলে, বাংলা ছন্দ পড়িবার সময়ে ঐ পদ আর পর্ব্ব-ভেদ মনে রাখিয়া, সেই অনুসারে চরণগুলির ছেদ ঠিক রাখিয়া পড়িতে হইবে।

দেখা গেল, বাংলা ছন্দ তিন জাতের—(১) **পদভাগের ছন্দ ;** যেমন পুরাণো 'পয়ার' 'ত্রিপদী' প্রভৃতি ; (২) **পর্ব্বভাগের ছন্দ ;** (৩) **ছড়ার ছন্দ ;** ইহাও পর্ব্বভাগের ছন্দ বটে, কিন্তু এ ছন্দ চল্‌তি-ভাষার ছন্দ বলিয়া, ইহার পর্ব্বগুলির আকৃতি ও প্রকৃতি অন্যরূপ। নীচে ঐ তিন বিভিন্ন ছন্দের কয়েকটি চরণ তুলিয়া দিতেছি—দেখ দেখি, কোন্‌টির কি ছন্দ ?—

(১) ভোরের বেলা শূন্য কোলে, ডাকবি যখন খোকা ব'লে

(২) সোনার ফসল ফলায় যখন পায়ের তলার মাটি

(৩) মাটির ভয়ে রাজ্য হবে মাটি,
দিবসরাতি রহিলে আমি বন্ধ।

(৪) কৌতুকে ঘোমটা হ'তে
মুচকিয়া মৃদু হাসি
নব-বধূ চারিদিকে চায়।

(৫) ফুরায়ে গেল ধীরে বিবাহ উৎসব,

নীরব নহবৎ নীরব হুলুরব।

—এই শেষের লাইন-দুইটির ভাগ কিরূপ হইবে? সে ভাগ—পদের না পর্ব্বের? অক্ষর সমান আছে কি?

আর এক প্রকার ছন্দের একটু পরিচয় দিব। এ ছন্দ বাংলা ছন্দ নয়—সংস্কৃতের অনুকরণে, অতি প্রাচীন হইতে আধুনিক কবিতায় পর্য্যন্ত, মাঝে মাঝে দেখা দিয়াছে। ইহার নাম মাত্রা-ছন্দ; অর্থাৎ, ইহাতে অক্ষর না গণিয়া মাত্রা গণিতে হয়। মাত্রা কি? প্রত্যেক অক্ষরের উচ্চারণ-কাল এক এক মাত্রা; এখানে অক্ষর অর্থে স্বরান্ত বর্ণ, বা Syllable; যদি তাহার পরে যুক্ত অক্ষর থাকে, কিম্বা তাহাতে আ-কার, ঈ-কার, এ-কার প্রভৃতি দীর্ঘস্বর যুক্ত থাকে, তবে সে অক্ষরকে দুই মাত্রা ধরিতে হইবে; পড়িবার সময়ে ঐ দুই-মাত্রার অক্ষরগুলি বেশ টানিয়া উচ্চারণ না করিলে ছন্দ মিলিবে না। কিন্তু বাংলায়, এইরূপ দীর্ঘস্বর থাকিলেই, অক্ষরটির মাত্রা সব সময় ডবল হয় না—ছন্দের প্রয়োজন বুঝিয়া অক্ষরগুলি হ্রস্ব-দীর্ঘ করিয়া পড়িতে হয়; যেমন—

তোহে জনমি পুন | তোহে সমাওত। (৮|৮)

সাগরলহরী স—মানা॥ (৮|৪)

এই ভাষাও বাংলাভাষা নয়, তবু বাংলার সামিল হইয়া গিয়াছে। এখানে তিনটি পদ লইয়া ঐ একটি পূরা চরণ; পদগুলির মাত্রা-পরিমাণ পর পর এইরূপ দাঁড়ায়:—৮+৮+১২; কারণ, প্রত্যেক অক্ষর—এক মাত্রা, এবং যেগুলির উপরে চিহ্ন দেওয়া আছে, সেগুলি ডবল মাত্রার অক্ষর। এইবার গণিয়া দেখ, ঠিক ঐ হিসাব মিলিবে। আর একটি ঐ ছন্দ—

যুগ-যুগ | বাহী ‖ প্রবাহ | তোমারি

দেখিল | কত শত | ঘটনা (৩)

কিম্বা—

রে সতী | রে সতী ॥ কাঁদিল | পশুপতি
পাগল | শিব প্রম | থেশ ।

এখানেও পর্ব্বের মত ভাগ পাওয়া যাইতেছে—প্রত্যেক পর্ব্বে চারিটি করিয়া মাত্রা আছে। রবীন্দ্রনাথের—

জনগণ-মন-অধিনায়ক ভারত-ভাগ্য-বিধাতা

—এইরূপ মাত্রা-ছন্দের কবিতা।

আধুনিক যুগে, ইংরাজীর অনুকরণে বাংলা কবিতার ছন্দ-রচনায় একটি নূতন ভঙ্গি দেখা দিয়াছে। চার বা চারের অধিক—সমান বা অসমান—চরণ লইয়া, যে এক একটি পৃথক ভাগে ছন্দ রচনা করা হয়, তাহাকে ইংরাজীতে Stanza বলে—বাংলায় **স্তবক** নাম দেওয়া হইয়াছে। এ ছন্দে সময়ে সময়ে পদগুলিকেও চরণের মত করিয়া সাজানো হয়। চরণগুলি, সমান হোক বা ছোট-বড় হোক, সাজাইবার নানা রীতি আছে—এই রীতিও মিলগুলির উপরে নির্ভর করে। উপরে যে তিন রকম ছন্দের কথা বলিয়াছি, ওই তিন ছন্দেই স্তবক রচনা করা যায়। একটি উদাহরণ দিলেই স্তবকের আকার ও প্রকার বুঝিতে পারিবে।—

হা-হা করে হাওয়া, দীপ নিবে যায়, সাথীহীন অমারাতি,
বাহিরে বিজনে হাস্নুহানায় জ্বলিছে জোনাকি-পাঁতি।
সে মহাশূন্য ভরি উঠে মোর নিরাশার উল্লাসে,
কেঁদে উঠি কলহাসে!
আঁধার নয়নে চমকিয়া ওঠে মেরু-দামিনীর ভাতি!

ইহাতে পর্ব্বভাগ-ছন্দের পাঁচটি পংক্তি বা চরণ আছে; চতুর্থ চরণটি ছোট, বাকিগুলি সমান। ১ম, ২য় ও ৫ম চরণে এক মিল আছে;

৩য় ও ৪র্থ চরণে আর এক মিল আছে। মিল অনুসারে চরণগুলি এইরূপ সাজানো আছে—ক ক খ খ ক। মিলের এই গাঁথুনি বড় স্তবকে আরও কৌশলপূর্ণ হয়, তাহাতে স্তবকের গৌরব বাড়ে। এইরূপ স্তবক রচনা কেবল ছন্দের একটা কৌশলই নয়,—কবিতার ভিতরকার ভাবটিকে যেন পর্দ্দায় পর্দ্দায়, বা পাপড়িতে পাপড়িতে খুলিয়া ধরিবার জন্য কবিরা স্তবক ছন্দে কবিতা রচনা করেন। অনেক কবিতারই স্তবক ভাগ হয় না; অর্থের দিক দিয়া কবিতাটিকে কয়েকটি সমান ভাগে ভাগ করা হয় মাত্র—গদ্যের যেমন প্যারাগ্রাফ; কিন্তু চরণগুলি প্রায় একই রকম, এবং মিলের কোন গাঁথুনি নাই। ইহা ছাড়া, ইংরাজী হইতে আরও যে দুইটি ছন্দ-রূপ বাংলা কবিতায় আসিয়াছে—সেই **অমিত্রাক্ষর** ছন্দ, ও **সনেট**-এর পরিচয় পরে যথাস্থানে দিয়াছি।

কবিতার ছন্দের সঙ্গে, মিলের সম্বন্ধেও কিছু জানিয়া রাখা উচিত। প্রাচীন ভাষাগুলির (সংস্কৃত, গ্রীক, ল্যাটিন) ছন্দে মিল নাই। আধুনিক ভাষাগুলির ধ্বনি-প্রকৃতি অন্যরূপ বলিয়া, ছন্দে মিল না থাকিলে শুনিতে ভাল হয় না। ফারসি ভাষার ছন্দে মিলের খেলা সবচেয়ে বেশি। দুইটি শব্দের ধ্বনি যদি প্রায় সমান হয়, তবেই তাহাদিগকে স-মিল শব্দ (rhyming words) বলে। ছন্দে মিল করিতে হইলে, দুই বা ততোধিক চরণের শেষ শব্দ স-মিল হওয়া চাই। কিন্তু মিল ভাল হইতে হইলে শব্দের কেবল শেষ অক্ষরের ধ্বনি সমান হইলেই চলিবে না, যেমন—চলে + ফেলে; দাহে + স্নেহে; আলোকে + সমুখে; বালক + আলোক। ভাল মিল হইবে এইরূপ;—চলে + বলে; দেহে + স্নেহে; আলোক + ভূলোক; বালক + পালক। অর্থাৎ, কেবল শেষের অক্ষরটির (syllable) মিল নয়—তাহার পূর্ব্ব অক্ষরের অন্ততঃ স্বরবর্ণটিরও মিল চাই, যেমন এইগুলিতে হইয়াছে;—চলে + বলে (অলে + অলে); দেহে + স্নেহে

(এহে + এহে) ; আলোকে + ভূলোকে (লোকে + লোকে) ; [এখানে শুধু স্বরবর্ণ নয়, আগের ব্যঞ্জনবর্ণটিরও (ল-এর) মিল রহিয়াছে] ; বালক + পালক—আরও ভাল মিল, কারণ, এখানে প্রায় তিনটি বর্ণেরই মিল হইয়াছে (আলক + আলক) ; এইরূপ মিল গীতিকবিতার পক্ষে বড়ই উপযোগী। কবিরা অনেক সময়ে মিল লইয়া একটু খেলাও করেন—চরণের শেষে মিলযুক্ত দুই-তিনটি শব্দও বসাইয়া দেন ; ইহাকে ইংরাজীতে double rhyme, triple rhyme বলা যায়। যেমন—

গুটিগুটি আসে বৈয়াকরণ। (বৈয়া + করণ)
ধূলিভরা দুটি লইয়া চরণ॥ (লৈয়া + চরণ)

মিলের বেশি বাড়াবাড়িও ভাল নয়। তাহাতে, কথার খেলা, বা শব্দালঙ্কার, কবিত্বকে ছাড়াইয়া যায়, যেমন—'শেফালিকা-তলে + কে বালিকা চলে' ; এখানে, ভাব বা অর্থ অপেক্ষা মিলেরই সৌন্দর্য্য বেশি।

কবিতা-পাঠ

['কাব্য-মঞ্জুষা' পড়িবার সময়ে আমি তোমাদিগকে সেইটুকু মাত্র সাহায্য করিব, যেটুকু বুদ্ধিমানের পক্ষেও আবশ্যক হইতে পারে। প্রত্যেক কবিতার বিষয়, এবং তাহার ভাব ও ভাষার একটু পরিচয় দিব—তাহাতে তোমরা কবিতাটি পড়িবার পূর্ব্বে একটু প্রস্তুত হইয়া লইতে পারিবে। কবিতার মধ্যে, যে সকল অপ্রচলিত শব্দ আছে, যে সকল শব্দ কেবল কবিতাতেই ব্যবহৃত হয়, অথবা যে শব্দ সকল সমাজে প্রচলিত নাই—অর্থ-সহ তাহাদের একটি তালিকা (Glossary) পুস্তকের শেষে দেখিতে পাইবে। ভাল ভাল কথা, এবং সুন্দর ও অর্থপূর্ণ লাইনও আমি দেখাইয়া দিয়াছি। যেখানে কোন কারণে বুঝিবার ভুল হইতে পারে, বা একটু বিশেষ ব্যাখ্যার প্রয়োজন, কিম্বা, যেখানে কোন একটি শব্দের ব্যবহার ভাল করিয়া লক্ষ্য করা উচিত—সেই সকল স্থানে আমার সাহায্য পাইবে। কিন্তু যেখানে নিজেদের চেষ্টায়, অভিধান প্রভৃতির সাহায্যে অর্থ বুঝা যায়, সেখানে আমি কিছুই করিব না ; কারণ, আমি অলস ছাত্রের জন্য কোনরূপ ব্যাখ্যা-পুস্তক লিখিতেছি না। আর একটি কথা। রামায়ণ ও মহাভারতের কোন ঘটনা যদি কোন কবিতার বিষয় হইয়া থাকে, সেখানে সেই কাহিনী বিবৃত করাও আমার কাজ নয়—সে সকল কাহিনীও তোমাদের জানা থাকা উচিত। যদি না থাকে, তবে সুবল মিত্রের অভিধান দেখিবে। এ বিষয়ে আমার পরামর্শ এই যে,—বাংলা সাহিত্যে—গদ্যে ও পদ্যে—রামায়ণ মহাভারতের বিষয় লইয়া এত অধিক রচনা দেখা যায়, অথবা, ঐ দুই পুরাণের ঘটনা বা চরিত্রের উদ্দেশ্যে (allusion) এত রকমের করা হইয়া থাকে যে, তোমাদের পক্ষে, অন্ততঃ

কাশীদাসী মহাভারত ও কৃত্তিবাসী রামায়ণ, এই দুইখানি বই-এর গল্প জানিয়া রাখা ভালো। যে সকল কবিতা আবৃত্তি করিবার উপযোগী, অথবা মুখস্থ করিলে ভাল হয়, তাহাদের নামের পাশে (*) এইরূপ চিহ্ন দিয়াছি।

এই কবিতা-পাঠের সঙ্গেই আর একটি শিক্ষার সুযোগ করিয়া লইবে —বাংলাভাষায় বাক্য-রচনা ও শব্দযোজনার যে বিশেষ ভঙ্গিগুলি আছে, তাহা খুব ভাল করিয়া চিনিয়া লইবে। তোমরা অনেকেই জান না, প্রত্যেক ভাষার একটা নিজস্ব স্বভাব আছে। সেই স্বভাবের জন্য, কেবল অভিধান এবং ব্যাকরণের সাহায্যে বাক্যের অর্থ ও গঠন ঠিক করিয়া লইতে পারিলেই কোন ভাষাকে আয়ত্ত করা যায় না। যিনি ভাষার সেই বিশেষ ভঙ্গি, রীতি, বা বুলির কায়দা উত্তমরূপে অবগত হইয়া তাহা অভ্যাস করিয়াছেন, তিনিই সাধুভাষায় বা চল্‌তি ভাষায় উৎকৃষ্ট লেখক হইতে পারিবেন। ইংরেজী ভাষা যে কারণে একটি উৎকৃষ্ট ভাষা আমাদের বাংলাও সেই কারণে সকল শ্রেষ্ঠ ভাষার সমতুল্য, কারণ, বাংলাতেও ভাবপ্রকাশের জন্য ভাষার নানা সূক্ষ্ম কৌশল আছে; ইহাতে যেমন অজস্র বাঁধা-বুলি, বচন, ও নানা জাতের শব্দ আছে, তেমনই প্রয়োগের বহুতর কৌশলও আছে। তোমরা এই 'কবিতা-পাঠে'র প্রসঙ্গেই এইরূপ অনেক ভঙ্গির পরিচয় পাইবে। তাহাদের মধ্যে, আমি দুইটি প্রধান ভঙ্গির কথা এইখানেই বলিয়া রাখিতেছি। একটিকে 'চল্‌তি-বুলি' বা 'ইডিয়ম' বলিয়া জানিবে; সেগুলিতে অভিধান-ব্যাকরণের কোন নিয়ম নাই; যথা—'কালাপেড়ে' (কাপড়), 'কালো-পেড়ে' নয়; ইহাকে ইংরেজীতে usage বলে; কিম্বা যেমন 'মামার বাড়ী', —'মামাবাড়ী' নয়। তেমনই, কতরকমের যে চল্‌তি রীতি আছে, তাহার হিসাব করা শক্ত। 'দয়ার শরীর', 'মাটির মানুষ', 'মুখের কথা' যেমন এক ধরণের বুলি, তেমনই, 'মুখ-চোরা', 'ভয়-তরাসে', 'দুধে-ধোয়া',

'মন-মরা', প্রভৃতি কত রকমের যে বাক্-ভঙ্গি আছে, তাহা তোমরা বিখ্যাত লেখকদিগের লেখা গদ্য বা পদ্য-রচনা মনোযোগ করিয়া পড়িলেই দেখিতে পাইবে; আজকালকার বাজে লেখকদের লেখা পড়িলে কিন্তু তাহা পাইবে না, কারণ তাহারা প্রায়ই খাঁটি বাংলাভাষায় লিখিতে জানে না। ভাষার সম্বন্ধে আর একটি প্রধান লক্ষ্য করিবার বিষয়—যাহাকে ইংরাজীতে বলে, শব্দের 'phrasal sense', অর্থাৎ—কোন একটি অপর শব্দের সহযোগে (phrase বা খণ্ডবাক্যের মধ্যে) কোন কোন শব্দের যে বিশেষ অর্থ হয়। সাধারণতঃ ক্রিয়াপদের শব্দগুলিতেই এইরূপ হইতে দেখা যায়। ইহার যথেষ্ট উদাহরণ তোমরা 'কবিতা-পাঠে'র মধ্যে পাইবে ; একটি উদাহরণ এইখানে দিতেছি। তোমরা নিশ্চয় লক্ষ্য করিয়াছ, 'ধরা' ক্রিয়াপদটির অর্থ ভিন্ন ভিন্ন শব্দের যোগে ভিন্নরূপ হইয়া থাকে, যথা—'বৃষ্টি ধরিয়াছে', 'উনুন ধরাও' ইত্যাদি। ইহাকেই 'phrasal meaning' বলে, আমি উহাকে বাংলায় 'যৌগিক অর্থ' বলিব। কবিতাপাঠের সময়ে তোমরা মাতৃভাষার এই গুণগুলির প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। আমি হয়ত সর্ব্বত্র দৃষ্টি দিতে পারি নাই, তোমরা আরও অনেক এইরূপ দৃষ্টান্ত খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবে।]

পুরাতন যুগ

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী হইতেই বাংলা কবিতার রীতিমত আরম্ভ ধরা যাইতে পারে ; কারণ তাহার পূর্ব্বে যাহা রচিত হইয়াছিল তাহা কাব্যহিসাবে বিশেষ কিছু নয়। ইহার মধ্যে বৈষ্ণবপদকর্ত্তা চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমভক্তিমূলক কবিতা, এবং কৃত্তিবাসের রামায়ণই প্রাচীনতম। তারপর ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব ও তাঁহার প্রবর্ত্তিত নূতন ধর্ম্মের প্লাবনে, বাঙ্গালী জাতির এক নবজাগরণ ঘটে, তাহাতে বাংলা ভাষায় বিশেষ বেগ সঞ্চার হয় ; শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম ও জীবন-সংক্রান্ত বহু

কাব্য, গান, ও তত্ত্ব-আলোচনা বাংলা সাহিত্যিকে সমৃদ্ধ করে। এ যুগের বাংলা কবিতাকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে ফেলা যায়—(১) গান, (২) কাহিনী। ষোড়শ শতাব্দীতে বৈষ্ণব গীতিকবিতার বিশেষ উৎকর্ষ ঘটে, কিন্তু কাহিনী-কাব্যের ধারা পুষ্ট হইয়া উঠিলেও, সপ্তদশ শতাব্দীতেই তাহার সমধিক বিকাশ হয়; কারণ, এই কালেই 'মঙ্গল-কাব্য' নামক—গ্রাম্য দেব-দেবীর মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন-মূলক—এক জাতীয় কাহিনী-কাব্য রচিত হইয়াছিল; তন্মধ্যে প্রাচীনতম—বিজয়গুপ্তের (খৃঃ ১৫শ শঃ) 'মনসামঙ্গল'-কাব্যের উপাখ্যানে, কল্পনা ও কবিত্বের বিশেষ উৎকর্ষ লক্ষ্য করা যায়। তথাপি ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে রচিত মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যই কাব্যহিসাবে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে; অপরাপর মঙ্গল-কাব্যগুলি লোক-সাহিত্যের—অর্থাৎ, গ্রাম্য গীতি-কথা বা পালা-গানের—পর্য্যায়ভুক্ত। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে আর এক কবি—কাশীরাম দাস—মহাভারতের অনুবাদ করিয়া অক্ষয় যশ লাভ করিয়াছেন; কৃত্তিবাসের রামায়ণের মত এই মহাভারতও বাঙ্গালীর জাতীয় কাব্য হইয়া আছে। ইহার পর অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলা-কাব্য প্রায় একই ধারায় চলিয়া আসিলেও—কবিতার ভাষা ও রচনার রীতি কিছু মার্জ্জিত হইয়া উঠিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর দুইখানি কাব্য উল্লেখযোগ্য—একখানি ঘনরামের 'ধর্ম্মমঙ্গল', অপরখানি ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'ই কাব্যহিসাবে, পুরাতন ধারার শেষ ও চূড়ান্ত নিদর্শন—ভাব ও অর্থের সহিত ভাষার নিপুণ যোজনায়, ছন্দে, ও রসসৃষ্টিতে, তিনিই পুরাতন যুগের শ্রেষ্ঠ কবি। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলায় যে রাষ্ট্রবিপ্লব হয়—ইংরাজ-রাজত্বের আরম্ভ হয়—তাহাতে, বাংলা কাব্যের ধারা কতকটা ছিন্ন হইয়া যায়, এবং সাহিত্যের আদর্শ ও মার্জ্জিত রচনা-রীতি অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হয়। এখন হইতে উনবিংশ শতাব্দীর অর্দ্ধেকেরও অধিককাল ধরিয়া, যে ধরণের কাব্যের প্রচলন হইয়াছিল তাহা প্রায়ই, পাঠ করিবার জন্য নয়—গাহিয়া শোনাইবার জন্য রচিত হইত। এই সকল কবিতার অধিকাংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে, এবং যাহাও আছে তাহা ঠিক কবিতা নয়—গান। এই কালের—এবং খাঁটি পুরাতন-ধারার—শেষ কবি, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। ইঁহার ব্যঙ্গ-কবিতা ও রঙ্গরসের রচনাই অতিশয় জনপ্রিয় হইয়াছিল। বাংলা কাব্যের পুরাতন যুগের ইহাই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। তোমরা এই কালের কবিদের নাম, কাব্যের নাম, ও তাহাদের রচনা-কাল মনে রাখিবার চেষ্টা করিবে।

পুস্তকের এই ভাগে গান খুব কম আছে—কাহিনী-কবিতাও—রামায়ণ ও মহাভারত হইতেই বেশির ভাগ উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহাতে তোমরা এই কয়জন বড় কবির নাম পাইবে ;—বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস, জ্ঞানদাস, সৈয়দ আলাওল, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম, কাশীরাম দাস, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ ও ঈশ্বরগুপ্ত। বৈষ্ণব কবিগণের মধ্যে আর একজন খুব বড় কবি আছেন—তাঁহার নাম গোবিন্দ দাস। প্রায় চারিশত বৎসরের বাংলা কবিতার যে বিবরণ দিয়াছি তাহার সম্পর্কে এই কয়টি মাত্র উল্লেখযোগ্য কবির নাম পাইলে ; ইহা হইতেই তোমরা বুঝিতে পারিবে—প্রাচীন বাংলায় উৎকৃষ্ট কাব্য পরিমাণে বেশি ছিল না—এখানে ওখানে দুই একজন শিক্ষিত কবি সাহিত্য-রচনার চেষ্টা করিয়াছেন মাত্র। ইহার কারণ, সেকালে শিক্ষিত বাঙ্গালী বাংলাভাষাকে শ্রদ্ধা করিতেন না—সর্ব্ববিষয়ে সংস্কৃতই ছিল তাঁহাদের আদর্শ। বাস্তবিক পক্ষে, বৈষ্ণব গীতি-কবিতা, চণ্ডীমঙ্গল-কাব্য (মুকুন্দরাম), ও ভারতচন্দ্রের কাব্য ছাড়া, এ যুগে সাহিত্যহিসাবে উল্লেখযোগ্য আর কিছুর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। ইহাদের মধ্যে বৈষ্ণব পদকর্ত্তাদের পদগুলিই প্রাচীন বাংলাসাহিত্যের ও বাঙ্গালীর গৌরব—বাঙ্গালী যে গানের রাজা, তাহার প্রমাণ এত পূর্ব্বকালেও এইগুলির মধ্যে পাওয়া যাইবে। ইহাও লক্ষ্য করিবে যে, কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের কাব্য দুইখানিই, ভাষায় ও আদর্শে, গ্রাম্য-গাথা বা গীতিকা হইতে শ্রেষ্ঠ—এই দুইখানি কাব্যই বাংলা ভাষাকে বহুদিন বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। উভয় কবির কাব্যে (বিশেষতঃ কৃত্তিবাসের), সেকালের সাধারণ বাঙ্গালী সমাজের জীবনযাত্রা ও প্রাণ-মনের যেটুকু প্রকর্ষের (culture) পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে এই দুই কাব্য আজিও বাংলাসাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ হইয়া আছে ; আরও মূল্যবান এই জন্য যে—ইহারা সংস্কৃত রামায়ণ ও মহাভারতের কেবল অনুবাদই নয় ; সেই দুই মহাকাব্যের কাহিনীকে, ও তাহার অন্তর্গত চরিত্রগুলিকে, এই দুই-কবিই বাঙ্গালীর অন্তরের আদর্শে গড়িয়া লইয়াছেন ; এজন্য এই দুই কাব্য প্রকৃতই বাঙ্গালীর জাতীয় মহাকাব্য হইয়া উঠিয়াছিল। এই পুস্তকে উদ্ধৃত কবিতা গুলিতেও দেখিবে, কাহিনীর বিষয় এবং পাত্র-পাত্রী—সকলই সেই সংস্কৃত মহাকাব্যেরই বটে, কিন্তু তাহা একেবারে বাংলা হইয়া উঠিয়াছে—পাত্র-পাত্রীও খাঁটি বাঙালী। অতএব, এ যুগের উৎকৃষ্ট গীতি-কবিতা যেমন বৈষ্ণব পদাবলী ; তেমনই এই দুইখানিই এ যুগের শ্রেষ্ঠ কাহিনী-কাব্য। খাঁটি সাহিত্যের দিক দিয়া বাকি থাকে আর দুইখানি—

'চণ্ডীমঙ্গল' ও 'অন্নদামঙ্গল'। চণ্ডীমঙ্গলের কবিত্ব বা কল্পনা সেকালের পক্ষে প্রশংসনীয় বটে, তথাপি তাহা শ্রেষ্ঠ কাব্যের উপযুক্ত নয়—অদ্ভুত ও অসম্ভব রূপ-কথার মিশ্রণ তাহাতে আছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও মুকুন্দরাম বাস্তব-বর্ণনায় ও চরিত্রসৃষ্টিতে সর্ব্বপ্রথম সত্যকার কবিশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার ভাষার বাংলা শব্দসম্পদ বিস্ময়কর। এজন্য তিনি এক হিসাবে প্রাচীন সাহিত্যের একজন বড় কবি। ভারতচন্দ্রের কবিতার যে নমুনা দিয়াছি তাহাতে দেখিবে—এই কবিই, রচনা-নৈপুণ্যে ও উৎকৃষ্ট ভাষার গুণে, এ যুগের কাহিনী-কাব্যকে একটি উচ্চ সাহিত্যিক আদর্শে তুলিয়া ধরিয়াছেন; কিন্তু ভারতচন্দ্র আধুনিক কালের বড় নিকটবর্ত্তী। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ধর্ম্ম ও জীবনসংক্রান্ত পদ্য-গ্রন্থগুলি ঠিক কাব্যজাতীয় নয়, যদিও তাহার অনেক স্থলে ভাবের ও বর্ণনার কবিত্ব আছে,—এগুলিকে সে যুগের পদ্যে-রচিত গদ্যসাহিত্য বলা যাইতে পারে; তথাপি, ইহাদের দ্বারা একটি কাজ হইয়াছিল—বাংলা ভাষার চর্চ্চা বাড়িয়াছিল—ভাষারও উন্নতি হইয়াছিল। এযুগে অনেক পল্লী-গান ও গীতিকা রচিত হইয়াছিল—তাহাদের ভাবে যথেষ্ট কবিত্ব আছে, কিন্তু সেগুলি লোক-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত; তাহাদের ভাষায়, কল্পনায়, বা রচনারীতিতে সাহিত্যিক লক্ষণ নাই, অতএব সেগুলি পৃথক বস্তু,—একথা কখনও বিস্মৃত হইবে না। এই সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন—'মৈমনসিংহ-গীতিকা'।

(১)

কবিতাটি প্রাচীন মৈথিল কবি বিদ্যাপতির একটি পদ; ইহার ভাষাও মৈথিল-ভাষা। মূল মৈথিল ভাষার কবিতা এককালে বাঙালীর প্রায় নিজস্ব হইয়া উঠিয়াছিল। এই কবিতাটিতে ভগবানের নিকটে ভক্তের আত্মসমর্পণের ভাবটি কেমন গভীর ও প্রাণময় হইয়া উঠিয়াছে তাহা লক্ষ্য কর।

ছন্দ—মাত্রা ছন্দ ('বাংলা কবিতার ছন্দ' দেখ)। পদভাগ এইরূপ—

গণইতে | দোষগুণ ‖—লেশ নাহি | পায়বি—(৪|৪‖৪|৪)

যব তুহুঁ | করবি বি | -চার—(৪|৪|৩)

২-৩। দেবতাকে কোন দ্রব্য সমর্পণ করিবার সময়ে তাহার উপরে তিল ও তুলসী রাখিতে হয়। ইহাদ্বারা ভক্ত আপনার মনের গভীর বিশ্বাস ও আন্তরিকতা

প্রকাশ করিয়া থাকেন ; তিনি যেন সারা মনপ্রাণ দিয়া দেবতাকে সেই দ্রব্য উৎসর্গ করিতেছেন।

৬-৭। তোমাকে জগৎ-জন জগতের নাথ অর্থাৎ প্রভু ও রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া থাকে ; এই অধম আমি ত' জগতের বাহিরে নাই। কহায়সি—কথিত হও। ৮। কর্ম্ম-বিপাকে, অর্থাৎ, কর্ম্ম করিতে ও তাহার ফলভোগ করিতে বাধ্য হইয়া, যে-জীব হইয়াই জন্মলাভ করিনা কেন, তোমার প্রসঙ্গে যেন আমার ভক্তি থাকে। ইহাই ঐকান্তিক ভক্তি। কিয়ে—কিবা।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা :—করম-বিপাকে (কর্ম্মবিপাক) ; গতাগতি ; ভণয়ে ; ভবসিন্ধু ; পদ-পল্লব।

(২)

এই কবিতাটি মৈথিল ভাষায় রচিত। শেষে ভগবানের কৃপা ছাড়া মানুষের আর কোন গতি নাই—এই ভাবটি এই কবিতায় বড় সুন্দর ফুটিয়াছে। সবকয়টি লাইনই মুখস্থ করিবে।

ছন্দ—মাত্রাছন্দ [(২) দেখ]

১। পরিণাম নিরাশা—পরিণাম সম্বন্ধে নিরাশ (বিশেষণ) ৩। অতএব তোমারি উপরে একমাত্র নির্ভর। ৪-৭। এই পংক্তিগুলি প্রায়ই উদ্ধৃত হইয়া থাকে। অর্থ—পর পর কত সৃষ্টি কত প্রলয় বহিয়া গেল, কত চতুরানন (ব্রহ্মা—সৃষ্টিকর্ত্তা) সৃষ্টির সহিত অন্তর্দ্ধান করিল—তোমার আদিও নাই, অবসানও নাই ; সমুদ্রে লহরীর মত সকলই তোমাতে উঠিয়া তোমাতেই মিলিয়া যায়। সমাওত—বিলীন হয়।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা :—সাগরলহরী-সমানা ; শমন-ভয়।

(৩)

কৃত্তিবাসের রামায়ণ হইতে উদ্ধৃত। এই কবিতায় সেকালের বাঙ্গালী সমাজে বিবাহ-অনুষ্ঠান কেমন ছিল, এবং ধনীদিগের গৃহেও বেশভূষা ও বিলাসের আয়োজন-উপকরণ কত সামান্য ছিল, তাহার কিছু পরিচয় পাইবে। কৃত্তিবাস রামায়ণকে শুধু ভাষাতেই নয়, সকল বিষয়েই বাংলা করিয়া তুলিয়াছেন।

ছন্দ—পুরাতন পয়ার।

২-৩। সেকালের একটি সুন্দর বৈবাহিক শিষ্টাচার। ৭। কেশসংস্কারের জন্য আমলকী চূর্ণের ব্যবহার—সেকালের অতি সহজ ও স্বল্পে-তুষ্ট জীবনযাত্রার একটি সুন্দর নিদর্শন। ১৪। পাটের—রেশমী সুতার (আজকাল যাহাকে 'পাট' বলে তাহা নয়); সংস্কৃত 'পট্টবস্ত্রে'র 'পাট'। ২৪। বাজন-নূপুর—বাজে এমন নূপুর। নূপুরের সঙ্গে 'বাজন' শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য কর। ২৬। সোহাগের বাতি—এখানে, 'সোহাগ'—সৌভাগ্য; সৌভাগ্যসূচক প্রদীপ। ৩৩। এই 'জলধারা' দেওয়ার প্রথা এখনও প্রচলিত আছে। ৩৬। পাণিগ্রহণ। ৪০। 'রোহিণী' 'চিত্রা' প্রভৃতি নক্ষত্র পুরাণে চন্দ্রের পত্নী বলিয়া বর্ণিত। ৪২। পরিহার করে—এখানে, 'দান করে'। দানের সহিত দক্ষিণা দিতে হয়; এখানে কন্যাদানের দক্ষিণা হইল পাঁচটি হরীতকী মাত্র। ৪৭। ঝিলিমিলি—'শব্দার্থ সূচী' দেখ।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা:—ঝিলিমিলি; তোলা জল; পূর্ব্বাপর; বিলক্ষণ; বাসরঘর।

(৪)

সীতাহরণের পর শূন্যগৃহে ফিরিয়া রামের যে অবস্থা কবি বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা অতিশয় স্বাভাবিক হইয়াছে। মানসিক অবস্থার এইরূপ বর্ণনা হইতেই বুঝিবে যে, কৃত্তিবাসের কবিত্বশক্তি নিতান্ত অল্প ছিল না।

ছন্দ—পয়ার।

২। গোচরে—সম্মুখে। ৩। এইরূপ আরও দুর্লক্ষণ আছে, যথা—'বামে শব শিবা কুম্ভ, দক্ষিণে গো মৃগ দ্বিজ'। ৪। তোলাপাড়া—নানারূপ চিন্তা। ১৯। প্রমাদ পাড়িল—প্রমাদ (এখানে, 'মহাসঙ্কট') ঘটাইল। ২২। স্থাপ্যধন—গচ্ছিত ধন। ৩৭। পাতি পাতি করিয়া—তন্ন তন্ন করিয়া। ৫৫-৫৮। এই কয়টি লাইনে রামের কথাগুলি স্বাভাবিক হয় নাই; ইহাতে রামের মুখ দিয়া কবি নিজেরই কবিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। ৬১। চিন্তামণি—যে মণি বা রত্ন ধারণ করিলে সকল কামনা পূর্ণ হয়; (অন্যত্র) ভগবান।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা:—তোলাপাড়া; বিস্ময় মানি; পাতি পাতি; পদ্মালয়া; চিন্তামণি; মণিহারা ফণী।

(৫)

এই বর্ণনাও যেমন সরল তেমনই স্বাভাবিক। বাল্মীকি, সীতা ও রাম, সকলেরই চরিত্র যেরূপ স্বতন্ত্রভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে—তাহাতে কবির কল্পনার প্রশংসা করিতে হয়। এখানে কবি রামের মুখ বড় ছোট করিয়া দিয়াছেন; সীতার কথাগুলিতে দুঃখ, অভিমান এবং তেজস্বিতা অতি সুন্দর প্রকাশ পাইয়াছে। এই দুইটি নমুনা হইতেই তোমরা বুঝিতে পারিবে, কবি কৃত্তিবাস—ভাষার কোন্ গুণে, এবং ভাবের কিরূপ সৌন্দর্য্যে—আপামর-সাধারণ বাঙ্গালীর চিরপ্রিয় হইয়া আছেন। এমন স্বাভাবিকতা ও সরলতা প্রাচীন বাঙালী কবিগণের মধ্যে দুর্ল্লভ।

ছন্দ—পুরাতন পয়ার।

৭। পানি—সংস্কৃত 'পানীয়' হইতে। ১৩। আন—অন্য; এখানে, 'অন্যথা'। ২২। চমৎকার—(বিশেষ্য) বিস্ময়। ৩১। অদেখা—'অদর্শন' অর্থে খাঁটি বাংলা শব্দ। ৩৪। বড় অভিমানের কথা: এইরূপ কথা মেয়েদের মুখেই শোনা যায়। ৩৭। বিদ্যমানে—সমক্ষে। ৪৮। সপ্ত—সপ্তম, অর্থাৎ, নিম্নতম। ৫৫। ঘনে—(ক্রি-বিণ) ঘন ঘন। ৬৪—স্বমূর্ত্তি—অর্থাৎ লক্ষ্মীর মূর্ত্তি; লক্ষ্মীই সীতারূপে জন্মিয়াছিলেন। ৬৫। হরিষ—(বিণ) হরষিত, হৃষ্ট।

(৬)

বিখ্যাত বৈষ্ণব পদকর্ত্তা কবি চণ্ডীদাসের পদ। শ্যামের রূপবর্ণনাই কবিতাটির বিষয়। উপমাগুলি দেখ। এইরূপ উপমা প্রাচীন কবিতার একটি বিশেষত্ব।

ছন্দ—পুরাতন ত্রিপদী, অর্থাৎ পদভাগের ছন্দ। গানের পদ বলিয়া অক্ষর-সংখ্যা ঠিক নাই; সাধারণতঃ ৮+৮+১২।

৪-৫। 'থেহা' অর্থে, (এখানে) ঘন-রস। সেই 'থেহা' আবার নিংড়াইয়া আরও যে সারবস্তু পাওয়া যায় তাহার দ্বারা শ্যামের মুখ গড়িয়াছে। ১৩। বিস্তারি পাষাণে, ইঃ—বক্ষ যেমন প্রশস্ত, তেমনই নিটোল ও মসৃণ, যেন একখানি পাষাণ ফলক; গলার রত্নহার সেই পাষাণে খচিত মণিশ্রেণীর মত দেখাইতেছে।

১৭-১৮। 'আদলি'—উরুমূল হইতে কটি পর্য্যন্ত যে অংশ, তাহাকে আদ্রলি বা অর্দ্ধস্থালীর (হাঁড়ি বা কলসের নিম্নাংশ) সহিত তুলনা করিয়া বলা হইতেছে যে, তাহার

উপরে কদলীসদৃশ উরু দুইটি রোপিত বা স্থাপিত হইয়াছে। প্রাচীন কবিতায় উরুর সঙ্গে কদলীবৃক্ষের যে তুলনা দেওয়া হয়, তাহাতে তাহার গোড়াটা উপরের দিকে এবং মাথাটি নীচের দিকে ভাবিয়া লইতে হয়। বলা বাহুল্য, এ সকল উপমায় ঠিক বাহিরের সাদৃশ্য ততটা নাই, যতটা আছে ভাবের সাদৃশ্য। ১৯। দর্পণ—নখের উপমা।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা :—সুধা ছানিয়া ; গঞ্জিয়া ; কম্বু ; দাম ; সুষম করেছে।

(৭)

এই কবিতাটি বৈষ্ণব পদকর্ত্তা জ্ঞানদাসের একটি বিখ্যাত পদ। প্রথম চার লাইন মুখস্থ করিবে। কবিতাটি খাঁটি বাংলা হইলেও, ইহাতে 'ব্রজবুলি'র ছাপ আছে। মৈথিল কবিতার অনুকরণে বাঙালী কবিরা যে ভাষায় কবিতা লিখিতেন, তাহার নাম 'ব্রজবুলি'। এইরূপ হইবার কারণ, এককালে বহু বাঙালী ছাত্র মিথিলায় বিদ্যাশিক্ষা করিতে যাইতেন; সেখান হইতে তাঁহারা মৈথিল-কবিতা শিখিয়া সংগ্রহ করিয়া আনিতেন; এই ভাষার কবিতা বাঙালীদের বড় ভাল লাগিত।

এই 'আক্ষেপ'—রাধার আক্ষেপ। কৃষ্ণকে পাইবার আশা করিয়া রাধা বড় ভুল করিয়াছেন।

ছন্দ—ত্রিপদী ৬+৬+৮। পদভাগের ছল।

৫। করমে লেখি—অদৃষ্টের ফল; ভাগ্যে লেখা ছিল। ১২-১৫। সাগর সেচিলে মাণিক পাওয়া যায়, এরূপ প্রবাদ আছে। নগরে বহু ধনীর সমাগম হয়—বণিক শ্রেষ্ঠীরাও আসিয়া বাস করে; অতএব নগরেই বহুমূল্য মাণিকের সন্ধান মিলিতে পারে। ১৮-১৯—কবি বলিতেছেন, কৃষ্ণকে (ভগবানকে) ভালবাসা ত' সহজ নয়; সে ভালবাসার আগুনে সারা দেহ (দেহের সুখ) দগ্ধ হইয়া যায়; তাই তাহা যত প্রবল, ওই জ্বালাও তত অধিক হইবার কথা।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা :-(ঘর) বাঁধিনু ; (নগর) বসানু ; (জলদ) সেবিনু।

(৮)

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর বিখ্যাত 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্য হইতে এই অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। এ কবিতাটির মধ্যে দুইটি বস্তু আছে;—(১) সেকালে রাজা-জমিদারের

শাসন-কার্য্যে কি ভাবে কর্ম্মচারী নিয়োগ হইত, তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ ইহাতে আছে; (২) পশুরাজের রাজ্যে সেই সকল কাজ গুণানুসারে কোন্‌টি কোন্ পশুর উপযুক্ত—কবির এই কল্পনায় একটি প্রচ্ছন্ন হাস্যরস আছে, পশুকেও মানুষের মত বুদ্ধিমান করা হইয়াছে। বিভিন্ন রাজকর্ম্মের বিভিন্ন উপাধিগুলি লক্ষ্য কর—আর লক্ষ্য কর, এই নামগুলিতে এবং কবিকঙ্কণের ভাষায়, সেকালের রাজভাষা ফারসীর প্রভাব। অপ্রচলিত শব্দের অর্থ পুস্তকের পরিশিষ্টে দেখ।

ছন্দ—ত্রিপদী (৮+৮+১০)।

২৯। মষ্য—মহিষ। ৩৭। 'ক্ষেতি খাবে', 'খাইবা ইনাম-ভূমি'—এখানে 'খাওয়া'র যে বিশেষ অর্থ, তাহা চল্‌তি রীতিমূলক (idiomatic)—'উপস্বত্ব ভোগ করা'।

(৯)

'কালকেতু' কবিকঙ্কণের কাব্যের নায়ক। কবিকঙ্কণ ব্যাধপুত্রকে, অর্থাৎ অতিশয় নিম্নজাতীয় একজনকে, তাঁহার কাব্যের নায়ক করিয়া, তাহার চেহারা ও বলবীর্য্যের বর্ণনায় কেমন সত্যকার বীরমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছেন! ইহার একটা কারণ, এই গল্প তাঁহার নিজের নয়—বাংলার প্রাচীন পল্লীগাথা অবলম্বনে রচিত। তথাপি কবির কল্পনা যে এইরূপ নায়ককে অবহেলা করে নাই, ইহাতে, মানুষহিসাবেই মানুষের যে মহত্ব, তাহার প্রতি কবির শ্রদ্ধা প্রকাশ পাইয়াছে। (অপ্রচলিত শব্দের অর্থ পুস্তকের পরিশিষ্টে দেখ)।

ছন্দ—আগের কবিতার মত।

২৪। শশারু—খরগোশের পুরাণো বাংলা নাম।

(১০)

কাশীরাম দাসের মহাভারত হইতে উদ্ধৃত। দ্রোণের সকল শিষ্যের মধ্যে অর্জ্জুন ছিলেন শ্রেষ্ঠ। এই কবিতায় সেই শ্রেষ্ঠত্বের একটি প্রমাণ ও তাহার কারণ দেখানো হইয়াছে। কেবল ধনুর্বিদ্যা নয়, সকল বিদ্যাই সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে হইলে মনের ঐরূপ একাগ্রতা চাই।

ছন্দ—পয়ার।

৫১—৫২। অর্জ্জুনের দৃষ্টিতে লক্ষ্য-বিন্দুটি ছাড়া জগতের আর সকল বস্তু তখন মুছিয়া গিয়াছে; ইহারই নাম একাগ্রতা। ৪৮। চমৎকার—বিশেষ্যপদ, বাংলায় বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়।

(১১)

এই কবিতাটিও কাশীরাম দাসের মহাভারতে আছে। দাম্ভিক ক্ষত্রিয়-বীর এবং রাজগণ যাহা পারিলেন না, একজন দীনদরিদ্র ব্রাহ্মণ-যুবা তাহা পারিল ; একদিকে রাজগণের নিরাশ হওয়ার জন্য ক্ষোভ ও ক্রোধ, এবং অপরদিকে সত্যনিষ্ঠ, বিনয়ী, নিরভিমান, ব্রাহ্মণবেশী মহাবীর অর্জ্জুনের ব্যবহার—ইহাই এ কবিতায় বর্ণিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে একটা বড় সত্যের ইঙ্গিত রহিয়াছে, তাহা এই যে,—নীরব সাধনা, চরিত্রবল ও পুরুষকার, এই তিনের দ্বারাই মানুষ জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ জয় করিয়া লইতে পারে ; সেজন্য বংশগৌরব বা প্রবল আত্মীয়-বন্ধুর সাহায্য আবশ্যক হয় না।

ছন্দ—পয়ার।

১৫। পুষ্পবৃষ্টি অর্থে, 'অতিশয় মৃদু বৃষ্টি'ও হয়। ২১। হতচিত্ত—হতাশ, ক্ষুব্ধহৃদয়। ২৭। চিত্তে উপরোধ করি—মনের ভাব দমন করি ; আত্মসংযম করি। ২৮। উচিত—উচিত শাস্তি। ৪৫-৪৬। এই লাইন দুইটি মুখস্থ করিবে। ৪৯। ভণ্ডন—ভাঁড়ানো ; গোপন করা। ৫৮। আখণ্ডল—ইন্দ্র।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা ঃ—বল্লভ ; দ্রুপদের বালা ; শিষ্ট—দুষ্ট ; আকর্ণ পূরিয়া।

(১২)

ইহাই মহাভারতের প্রায় শেষ ঘটনা। কৃষ্ণ-অবতারের যাহা কিছু কাজ সব শেষ করিয়া, এবং যদুবংশ ধ্বংস হইবার পরে, ভগবান কিরূপে দেহত্যাগ করিলেন তাহারই বর্ণনা। মায়া-মোহ, সুখ-দুঃখ, জয়-পরাজয়, দ্বেষ-হিংসা প্রভৃতি সকল সংস্কারের অতীত সম্পূর্ণ আত্মবশ ও আত্মসমাহিত যে মহাপুরুষ-চরিত্র, এখানে তাহাই ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ছন্দ—ত্রিপদী (৮+৮+১০)।

১০। নম্রকায়—অর্থাৎ, খর্ব্বাকৃতি, বেঁটে। ১১। একেশ্বর—সম্পূর্ণ একা। ২০। যদুবংশ (শ্রীকৃষ্ণের বংশ) ধ্বংসের হেতু হইয়াছিল এক অদ্ভুত মুষল। শ্রীকৃষ্ণও সেই বংশের বলিয়া ব্যাধ সেই মুষলেরই এক টুকরা কুড়াইয়া পাইয়াছিল, এবং তাহার দ্বারা বাণের ফলক তৈয়ারী করিয়াছিল। ২০। নিরমাই—নির্ম্মাইল,

(নির্ম্মাণ করিল)। ২২। সন্ধানিয়া—লক্ষ্য স্থির করিয়া। ৩০। শ্রীবৎসলাঞ্ছন—শ্রীবৎস-চিহ্ন আছে যাহাতে; 'শ্রীবৎস' অর্থে, বর্ত্তুলাকার রোমাবলী। ৩২। ভাল—ভালো, সুন্দর। ৩৬। মাগে—(এখানে) স্বীকার করে। ৪০। অজ্ঞানের মূর্ত্তিময়—মূর্ত্তিমান অজ্ঞান। ৪১। গোঁসাই—গোস্বামী; সাধারণ অর্থে 'প্রভু'। ৪২। অপ্রমিত—অপরিমিত। ৫৮। মোরে—আমার নিকটে। ৬৬। হৃদয়ে ভাবনা করি'—যোগস্থ হইয়া।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা :—ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ; রবিবিম্ব; কোকনদ; অলকা-তিলকা; দ্বিজরাজ; আকর্ণ-লোচন; রাতুল।

(১৩)

সৈয়দ আলাওলের 'পদ্মাবতী' কাব্যের আরম্ভে এইরূপ ভগবানের মহিমা-বর্ণন আছে। এই কাব্যখানির ভাষা ছাপার দোষে এত বিকৃত হইয়া গেছে যে এখন তাহা উদ্ধার করাই দুরূহ। এইরূপ হইবার আরও কারণ—মূল কাব্যখানি ফারসি হরফে লেখা হইয়াছিল। তথাপি, এই ভাষার মধ্যেও কবি আলাওলের রচনার একটি গুণ লক্ষ্য করা যায়,—তাঁহার বাক্য অতিশয় সংক্ষিপ্ত, সেজন্য অর্থও অতিশয় সুনির্দ্দিষ্ট। এই কবিতাটিতে ভগবানের মহিমার যে বর্ণনা আছে, তাহার ভাষা যেমন খাঁটি বাংলা, তেমনই তাহার ভক্তিভাবটি খাঁটি মুসলমানের।

ছন্দ—পুরাতন পয়ার।

১১। গোপত আকার—অদৃশ্য। ১৮। নৈরাশ—যে কিছুরই আশা করে না। ২০। জগতের লোক যাহা দান করিয়া দাতা হয়, সে সকলেরই আদি-দাতা ভগবান। ২৪। সমযোগে—একই শক্তিতে। ৩১-৩২। কোন এক স্থানে নয়—সর্ব্ব স্থানে আছেন। তাঁহার নামে রূপ বা রেখার দাগ পড়িতে পারে না; অর্থাৎ, তিনি নিরাকার, সৃষ্টির কিছুতেই তাঁহাকে সীমাযুক্ত করা যায় না। ৪১-৪২। লাইন দুইটি অতি সুন্দর। সেই প্রভুর অসীম মহিমা বর্ণনা করিতে কেহ পারে না—করিতে গেলেই চেষ্টা নিষ্ফল হইবে। কেবল একটি উপায় আছে—সে তাঁহার 'কৃপাময়' নামটি; কবি, বা ভক্ত ও কৃতজ্ঞ মানুষ, ওই একটি নামের দ্বারা তাঁহার অনন্ত মহিমা ও অনন্ত গুণের ধারণা করিতে পারে।

(১৪)

ভারতচন্দের 'অন্নদামঙ্গল' হইতে। পিত্রালয়ে, পিতা দক্ষের মুখে পতিনিন্দা শুনিয়া সতী দেহত্যাগ করিয়াছেন, এই সংবাদে শিব অনুচরবর্গসহ দক্ষালয়ে চলিয়াছেন। মহাদেবের মূর্ত্তি ক্রোধে অতি ভয়ঙ্কর হইয়াছে; জটায় গঙ্গা, গলায় সর্প, ললাটে শশিকলা, এবং তৃতীয় নেত্রে অগ্নি—সকলই ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে।

ছন্দ—সংস্কৃত 'ভুজঙ্গপ্রয়াত'; বাংলা ছন্দ নয়। ইহা মাত্রা-ছন্দ, ('কবিতার ছন্দ' দেখ)। মাত্রাসংখ্যা—২০। এইরূপ হ্রস্ব-দীর্ঘ করিয়া পড়িতে হইবে—

অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে।

অরে রে অরে দক্ষ দে রে সতীরে॥

—যুক্তাক্ষরের পূর্ব্ববর্ণ, এবং দীর্ঘস্বর (ঊ, এ, আ, ঈ) দীর্ঘ ধরিতে হইবে।

৩। সংঘট্ট—(বিণ) সংঘট্টিত; অর্থাৎ সংঘাতে আন্দোলিত। ৪-৫। এই দুই পংক্তিতে, শব্দের কেবল ধ্বনির দ্বারাই ভাব প্রকাশ করিবার কৌশল লক্ষ্য কর। গাজে—গর্জ্জন করে। ৬। নিশানাথ চন্দ্রও সূর্য্যের ন্যায় প্রতাপযুক্ত হইয়াছেন, অর্থাৎ চন্দ্রও সূর্য্যের মত জ্বলিতেছে।

(১৫)

এই কবিতাও ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে'র কবিতা। ভারতচন্দ্রের কাব্যে যে বাস্তবচিত্র ও হাস্যরস, এবং বিশুদ্ধ বাংলা বাক্যরচনার যে সৌন্দর্য্য আছে, তাহা এই কবিতাটি পড়িয়া বুঝিবার চেষ্টা করিবে। ভারতচন্দ্রের ভাষায় সেকালের বাংলা বুলি (idiom) প্রচুর পাইবে—তাহার অনেকগুলি এখনও প্রচলিত আছে। এ কবিতার প্রত্যেক লাইনের ভাষা ও শব্দ ভাল করিয়া লক্ষ্য করিবে।

ছন্দ—(১) পয়ার; (২) ত্রিপদী।

৬। এই লাইনটীর দুই রকম অর্থ হইবে। ১০। অর্থাৎ, মুখ একবার খুলিলে বাক্যের স্রোত বহিতে থাকে। কুঁজি—চাবি। ১১। কড়া পড়িয়াছে—(চল্‌তি বচন), এখানে অত্যুক্তিমূলক ব্যঙ্গ; অর্থ—অন্ন ও বস্ত্র এত অধিক পরিমাণে ও

এতবার দিয়াছ যে, ওই সকল দ্রব্যের ঘর্ষণে করতল কঠিন হইয়া গেছে। ২৮। সবে—একমাত্র। ৩২। উপায়—উপার্জ্জন। ৩৮। আয়তি—এয়ো বা সধবা স্ত্রীলোকের শুভ চিহ্ন, যেমন—সিন্দূর, কঙ্কণ। ৪০। অর্থাৎ, (ভাবিয়া দেখিলে) শিবের দোষগুলিই তাঁহার গুণ। ৪৩। বেশিক্ষণ অনাহারে থাকিলে 'পিত্ত পড়ে' এইরূপ কথা প্রচলিত আছে; তাই গলার আস্বাদ তিক্ত হয়। ৫৫-৫৬। এই দুই পংক্তি প্রবাদ-বাক্য হইয়া গেছে। স্বতন্তরা—স্বতন্ত্রা, যে (স্বামীর) বশীভূত নয়। ৫৯। নির্গুণ—দুই অর্থ; (১) গুণহীন; (২) নিঃসঙ্গ, নিষ্ক্রিয় ও নির্লিপ্ত—যেমন পরমেশ্বর। ৭১। গৃহিণীপণে—গৃহিণীসুলভ গুণপনায়; অল্প আয়ে গুছাইয়া সংসার চালানো আদর্শ গৃহিণীর একটি গুণ। -'পনা' প্রত্যয়টির ব্যবহার ও অর্থ লক্ষ্য কর। খনখন ঝনঝনে—কলহ বা অশান্তির মধ্যে। ৭২। বেড় বান্ধে নাই—বেড় বা বাসের নির্দ্দিষ্ট স্থান—বান্ধে নাই—পাকা করে নাই; আসিলেও বেশিদিন থাকে না। ৭৬। সংস্কৃত='ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ': ভিক্ষা, অর্থাৎ পরের অনুগ্রহ, কখনও পুরুষের জীবিকা হইতে পারে না। এই চারিটি পংক্তি একটি সংস্কৃত শ্লোকের অনুবাদ। ৭৮। গুহ—কার্ত্তিক।

(১৬)

এইটিও অন্নদামঙ্গলের কবিতা—ভারতচন্দ্রের একটি উৎকৃষ্ট কবিতা। ঈশ্বরী পাটনীর চরিত্রটি কেমন সুন্দর ফুটিয়াছে, তাহাই ভাল করিয়া দেখিবে; এই চরিত্রই এই কবিতার প্রধান বিষয়।

ছন্দ—পয়ার।

১১। বিশেষণে—অর্থাৎ, নাম না করিয়া, গুণের বর্ণনা দ্বারা। ১৩-১৬। এখানে, 'গোত্র', 'পিতামহ', 'বাম', 'সিদ্ধি', 'গুণ', 'কু-কথা', 'দ্বন্দ্ব', 'ভূত' প্রভৃতি শব্দগুলির দুই অর্থ আছে। তা'ছাড়া—'অতি বড় বৃদ্ধ', 'কপালে আগুন', 'পঞ্চমুখ', 'কণ্ঠভরা বিষ', 'শিরোমণি', 'যে মোরে আপনা ভাবে' ইত্যাদি—এ সকলেরও শ্লেষ-অর্থ লক্ষ্য করিবে। সব মিলিয়া পরিচয় দাঁড়াইবে এই:—আমি হিমালয়-কন্যা উমা বা দুর্গা; মহাদেব আমার স্বামী; গঙ্গা আমার সপত্নী; এবং

মৈনাক পর্ব্বত আমার ভাই। আমি দেবী, ভক্তমাত্রেই আমার প্রিয়; যে ভক্তি করে ('আপনা ভাবে') তাহারই গৃহে আমি বিরাজ করি,—অর্থাৎ নিকটে থাকিয়া তাহার মঙ্গল করি।

২১। সতা—সতীন; তরঙ্গ—(দ্বিতীয় অর্থ) হাব-ভাব, লাস্যলীলা। ৪৬। এই লাইনটির অর্থ ভাল হয় না। মূল পুঁথি হইতে নকল করিবার সময়ে ভুল হইয়া থাকিবে; পরে সেই ভুলই ছাপা হইয়া আসিতেছে। এইরূপ একটা অর্থ করা যায়:—'তাঁহার ইচ্ছাই এইরূপ সৌভাগ্যের কারণ; নতুবা কাঠের সেঁউতিতে তপের ফল ফলিতে পারে না'। ৫৮। অষ্টাপদ—সোণা। ৬৯। ভবানন্দ মজুমদার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্ব্ব পুরুষ; এই কাহিনীর দ্বারা কবি তাঁহার প্রতিপালক রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বংশ-গৌরব কীর্ত্তন করিয়াছেন। ৭২। এই বাক্যটিতে পাটনীর যে আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা যেন সেকালের বাঙ্গালীমাত্রেরই শ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা। 'দুধে ভাতে থাকা'র চেয়ে ভাল অবস্থা আর কি হইতে পারে? [(৮৮) কবিতা দেখ]

ভাষা ও শব্দশিক্ষা:—ফের-ফার; অহর্নিশ; দ্বন্দ্ব; ভব-পারাবার; কোকনদ; ধেয়ায়; গজ-গমন; অষ্টাপদ।

(১৭)

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের 'কালীকীর্ত্তন' কাব্য হইতে। সেকালের আদর্শে ইহা একটি উৎকৃষ্ট কবিতা। চাঁদের সঙ্গে সুন্দর মুখের যে উপমা কবিরা দিয়া থাকেন, সে উপমা যে কত সত্য তাহাই প্রমাণ করিবার জন্য কবি এই গল্পটি কল্পনা করিয়াছেন। সেকালের কবিতায় কল্পনার এইরূপ কৌশল সকলকে মুগ্ধ করিত। ইহাতে ভাবের একরূপ সৌন্দর্য্য থাকিলেও, চিত্রটি স্বাভাবিক নয় বলিয়া, আধুনিক কালে এরূপ কবিতার আদর হয় না। তথাপি কবিতাটিতে বাৎসল্য-রস (সন্তানের প্রতি পিতামাতার স্নেহ) সুন্দর ফুটিয়াছে।

ছন্দ—ত্রিপদী (৮+৮+১০); গানের আকারে লিখিত বলিয়া অক্ষর কম-বেশি আছে।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা :—প্রবোধ দিতে ; ফুলাল' আঁখি ; মুকুর ; উপজিল ; বিনিন্দিত।

(১৮)

রামপ্রসাদের একটি বিখ্যাত শ্যামা-সঙ্গীত। এই কবিতা ও পরের কবিতাটি গান। রামপ্রসাদের এই গান বাংলা ভাষায় এক অপূর্ব্ব বস্তু—এমন সরল অথচ ভাব-গভীর এত সহজ ও আন্তরিকতাপূর্ণ গীতিরচনা বাংলায় খুব কম আছে। এই কবিতা ভক্তিমূলক হইলেও (ভূমিকা দেখ), ইহাতে গীতি-মাধুর্য্য আছে। কবি তাঁহার নিজের ধর্ম্মসাধনা হইতেই, ভগবান ও ভগবানের আরাধনা সম্বন্ধে যে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহার মূলমর্ম্ম সকল ধর্ম্মের সকল সাধকেরাই অন্তরে সত্য বলিয়া অনুভব করিবেন। এমন সহজ ভাষায় এমন গভীর কথা বাংলা কবিতায় আর কেহ ব্যক্ত করিতে পারেন নাই। রামপ্রসাদের গানের একটি অতি সহজ সুরও আছে, সেজন্য তাহার নাম হইয়াছে—'রামপ্রসাদী'।

ছন্দ—ছড়ার ছন্দ—প্রতি পর্ব্বে চারিটি (হসন্ত বাদ) অক্ষর আছে, যেমন—

এমন দিন কি | হবে তারা | (যবে) তারা তারা | তারা বলে'।
তারা বেয়ে | পড়্বে ধারা ॥

৬-৭। 'তারা' বা 'কালী'রূপে আমি যাঁহার সাধনা করি—তখন, তাঁহার কোন মূর্ত্তিতে আমার মন আর বাঁধা থাকিবে না। তাঁহার একটা বিশেষ রূপ-গুণের ধারণা করিয়া এখন মনের মধ্যে যে সকল ভাব হয় তাহাতে—এইটি তাঁহার, এবং এইটি তাঁহার নয়—এইরূপ ভেদ-জ্ঞান আছে ; কিন্তু তখন বুঝিব, তিনি যে নিরাকার ইহাই চরম সত্য—'শত শত সত্য বেদ' (পাঠান্তর 'সত্য সত্য সত্য বেদ')। 'নিরাকারা' অর্থ—কোন বিশেষ রূপ তাঁহার নাই, সকলই তাঁহার রূপ। তাই কবি বলিতেছেন—'মা বিরাজে সর্ব্বঘটে' ; অর্থাৎ, ব্রহ্মাণ্ডে যত কিছু যেখানে আছে তাহাতে তিনিই আছেন। ইহাই হিন্দুর ঈশ্বর-চিন্তার বিশেষত্ব—ইহাই উপনিষদের 'ব্রহ্মবাদ'। শক্তিসাধক ভক্ত রামপ্রসাদের মাতৃভাবের সাধনাতেও সেই এক উপলব্ধি জাগিয়াছে।

৮। সর্ব্বঘটে—সকল আকার বা আকৃতিতে। তিমিরে তিমিরহরা—অন্ধ আঁখির যে তিমির, অর্থাৎ অজ্ঞান, তাহা হরণ করেন যিনি। (অথবা, সেই অন্ধকার রূপই মনের অন্ধকার দূর করে।)

ভাষা ও শব্দশিক্ষা :—ভেদাভেদ ; বিরাজে সর্ব্বঘটে ; তিমিরে তিমিরহরা।

(১৯)

পূর্ব্বের কবিতাটির সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি—এ কবিতাটির ভাষা ও ভাব প্রভৃতির সম্বন্ধেও তাহা সত্য। এ কবিতার মূলভাব এই। সত্যকার পূজায়, অর্থাৎ ভগবৎ-আরাধনায়, আয়োজন উপকরণের কোন আড়ম্বর আবশ্যক হয় না; তাহাতে বরং আরও অনিষ্ট হয়—মনে দম্ভ বা অহঙ্কার জন্মে। সে পূজায় অন্তরের ধারণাই যথার্থ প্রতিমা; ভক্তিই শ্রেষ্ঠ নৈবেদ্য; জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ দীপ; এবং কুপ্রবৃত্তি সকলই যথার্থ বলিদানের বস্তু। ইহাই প্রকৃত নিরাকার-উপাসনা। পূর্ব্বের কবিতাটি দেখ।

ছন্দ—পূর্ব্ব কবিতার মত—ছড়ার ছন্দ।

(২০)

কবিতাটি গানের মত করিয়া লেখা। উপমাটি বড় সুন্দর, মুখস্থ করিবে।

ছন্দ—পদভাগের ছন্দ (৮+৮)। প্রত্যেক চরণে তিনটি পদ; শেষের পদটি ৫ অক্ষরের।

৫। ধারাজল—বৃষ্টির জল।

(২১)

কবিতাটি ইংরেজ কবি পোপের (Pope) বিখ্যাত 'Universal Prayer'-এর স্বচ্ছন্দ অনুবাদ। মূল কবিতাটির সঙ্গে মিলাইয়া পড়িবে। কবিতার ভাষা প্রায় সরল গদ্যের মত; কবিতাহিসাবে রচনাটি উৎকৃষ্ট নয়; কিন্তু ইহাতে কতকগুলি চমৎকার ভাব ও চিন্তা আছে।

ছন্দ—পয়ারের চতুষ্পদী স্তবক (Stanza)। ইংরাজীর অনুবাদ বলিয়া, এই প্রথম আমরা বাংলা কবিতায় 'স্তবক' পাইলাম।

১১-১২। প্রকৃতির আর সকলই (জীবজন্তু, গ্রহ-উপগ্রহ) ভাগ্য, অর্থাৎ নিয়তির অধীন; কেবল মানুষকেই তুমি বুদ্ধি ও স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়াছ। ইংরাজী কবিতায় আছে—

"Binding Nature fast in fate
Left free the human will."

২৫-২৬। অর্থাৎ, পাপী বলিয়া যেন কাহারও নির্য্যাতন না করি; কারণ, আমার এমন জ্ঞান নাই যে, কোন্ অবস্থায় কোন্ আচরণ পাপ, তাহা নির্ণয় করিতে পারি। ২৭-২৮। অর্থাৎ, যাহারা আমার মতে তোমার আরাধনা করে না, তাহাদিগকে তোমার শত্রু মনে করিয়া পীড়ন না করি। ৩১। এই পংক্তির শব্দ-কৌশল লক্ষ্য কর—এইরূপ যমক ও অনুপ্রাস ঈশ্বর গুপ্তের বড় প্রিয় ছিল। ৩৯-৪০। ইংরাজী 'Lord's Prayer' হইতে এই ভাবটি লওয়া হইয়াছে,—"Forgive us our trespasses as we forgive those that trespass against us."। ৪৬। রবিতলে—অর্থাৎ, পৃথিবীতে; ইংরেজী বাক্‌ভঙ্গি—"under the sun," কবিতায় চলিতে পারে, গদ্যে অচল। ৪৩-৪৪। যদি বাঁচিতে হয় তোমার ইচ্ছায় যেন বাঁচি; যদি মরিতে হয় তোমার ইচ্ছায় যেন মরি।

(২২)

পূর্ব্বের কবিতাটি ঈশ্বরগুপ্তের নিজের নয়—অনুবাদ। ঈশ্বরগুপ্ত নিজেও অনেক নীতি ও ধর্ম্মতত্ত্বের কবিতা লিখিয়াছেন; সেগুলি বিশেষ খ্যাতি লাভ করে নাই। কিন্তু তিনি যে সকল ব্যঙ্গ-কবিতা ও হাসির কবিতা লিখিয়াছেন তাহাতেই এককালে খুব যশ লাভ করিয়াছিলেন—তাঁহার কালের তিনি শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। এই কবিতাটি তাঁহার একটি বিখ্যাত হাস্যরসের কবিতা। ইহার ভাষার কৌশলগুলি লক্ষ্য কর। হাস্যরস সৃষ্টি করিবার জন্য কবি উপমার বাড়াবাড়ি করিয়াছেন; এবং ভোজনবিলাসীর যে সুখাদ্য-লোভ, তাহা লইয়া ব্যঙ্গ করিয়াছেন।

ছন্দ—পয়ার।

৬। তার—স্বাদ; যাহার সহিত মিল হইতেছে তাহাও 'তার', কিন্তু অর্থ এক নয়। ভাষার এই কৌশলকে 'যমক' বলে (২২ ও ২৮ পংক্তি দেখ)। ১২। গালে দিই—(কথ্যরীতি) খাই। ২২। লুণ-পোড়া—চলতি ভাষা 'নুনে পোড়া'; এখানে 'পোড়া' অর্থে নষ্ট, অভক্ষ্য; এই অর্থ আর কোথাও হয় না। ইহাও যৌগিক অর্থ (ভূমিকা দেখ)। পোড়া জল—এখানে 'পোড়া' অর্থে—নিকৃষ্ট; গালি দেওয়ার যোগ্য।

২৩। উলুবেড়ে—কলিকাতার দক্ষিণে গঙ্গাতীরে, সমুদ্রের আরও নিকটবর্তী স্থান। এইখানে গঙ্গার জলে (সমুদ্রের লোণা জল পৌঁছায় বলিয়া) তপ্‌সে মাছ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ৩৪। কারণ, 'ম্যাঙ্গো' অর্থে আম বা অমৃত-ফল। ৩৮। কমলিনী রাই—এখানে 'রাই' কথাটির দুই অর্থ আছে (১) রাই-সরিশা—ইংরাজের খানার একটি মসলা; (২) রাধিকা; তাই 'কমলিনী' বিশেষণটি যোগ করা হইয়াছে—উদ্দেশ্য, বিদ্রূপ করা। ৪৬। মিঠে জল—মিঠে এখানে 'মিষ্ট' নয়—লোণার বিপরীত; ইংরেজী 'fresh water'।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা :—গালে দিই; কুড়ি-দরে; ছাঁকা-তেলে; আলো ক'রে; সোঁৎ।

(২৩)

ইহাও একটি খাঁটি ঈশ্বরগুপ্তী কবিতা। শেষ লাইন দুইটির ভাষার ভঙ্গি দেখ।

ছন্দ—পয়ার।

৫। মন নাহি সরে—পছন্দ হয় না; এখানে 'সরে' এই ক্রিয়াপদের অর্থ একটু অন্যরূপ, তাহা লক্ষ্য কর। এইরূপ অর্থকেই 'যৌগিক অর্থ' (phrasal meaning) বলে। ঐ শব্দের ঐ অর্থ আর কোথাও হয় না—'প্রাণ সরে' বলিলে কোন অর্থ হয় না। ভাষার এই চল্‌তি রীতির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে।

(২৪)

যে কবির "পাখিসব করে রব রাতি পোহাইল" কবিতা তোমরা সকলেই বোধ হয় শিশুকালে পড়িয়াছ—এ কবিতাটিও তাঁহারই 'বাসবদত্তা' কাব্য হইতে উদ্ধৃত। ইহা একটি 'নীতি-কবিতা' ('কবিতার কথা' দেখ)।

ছন্দ—পয়ার।

১১-১৪। উপমাটি খুব নূতন—মনে রাখিবে। ২২। সংস্কৃত শ্লোকে আছে—"খাদতি পৃষ্ঠমাংসম্", তাহারই অনুবাদ। ৩৪। বিগুণ—গুণহীন, দুষ্ট। ৩৭। বিমত—বিপরীত মত; মুখে যাহা বলে কাজে তাহা করে না।

(২৫)

রঙ্গলাল পরিবর্ত্তন যুগের প্রথম, ও পুরাতন যুগের শেষ কবি ; তিনি যেন ঠিক সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া দুই দিকেই দৃষ্টি করিতেছেন। তথাপি, পুরাতনের প্রতি তাঁহার মমতা এত অধিক যে, তিনি সেই আদর্শই রক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার কবিতায় ইংরেজী কাব্যের অনুকরণ থাকিলেও, প্রাচীন ভাব, ভাষা ও ভঙ্গির ছাপ এতই স্পষ্ট যে, তাঁহাকে পরিবর্ত্তন-যুগে না আনিয়া শেষ প্রাচীনপন্থী কবি বলাই সঙ্গত।

এই লাইনগুলি 'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্যে আছে। এগুলির মধ্যে শেক্স্পীয়ারের কয়েকটি বিখ্যাত লাইনের ভাব স্পষ্ট উঁকি দিতেছে ; লাইনগুলি এই—

'To gild refined gold, to paint the lily,
To throw a perfume on the violet,
To smooth the ice, or add another hue
Unto the rainbow, or with taper-light
To seek the beauteous eye of heaven to garnish,
Is wasteful and ridiculous excess."

তথাপি, কবি ঐ ইংরাজী উপমার ভাষাকে কেমন বাংলা করিয়া লইয়াছেন, তাহা লক্ষ্য কর।

ছন্দ—ত্রিপদী (৮+৮+১০)।

১১। 'গজমুক্তা'—নাম হইল কেন?

ভাষা ও শব্দশিক্ষা :—মৃগমদ, কষিত কাঞ্চন, সিন্দুরে মাজা, মুক্তাফল।

(২৬)

এই কবিতাটিও 'পদ্মিনী' কাব্য হইতে উদ্ধৃত। ইহার বিষয়, স্বদেশ-প্রীতি। ইহাই এ কবিতার নূতনত্ব ; প্রাচীন কবিতায় কোথাও স্বদেশপ্রীতির কথা ছিল না। এক সময়ে ইহার প্রথম ৮ পংক্তি সকলের মুখস্থ ছিল ; তোমরাও মুখস্থ করিবে।

ছন্দ—পদভাগের ছন্দ (৮+৮+৬) যথা—

স্বাধীনতা-হীনতায় ॥ কে বাঁচিতে চায় হে ॥ কে বাঁচিতে চায়

—এখানে 'হে' দুই অক্ষরের সমান।

(২৭)

কয়েকটি চমৎকার নীতি-কথা—সংস্কৃত-শ্লোকের অনুবাদ ; সবগুলিই 'নীতি-কবিতা'র উৎকৃষ্ট উদাহরণ ('কবিতার কথা' দেখ)। এইরূপ কবিতা সুন্দর হয় দুইটি বস্তুর গুণে—উপমা ও দৃষ্টান্ত।

ছন্দ—ত্রিপদী ও পয়ার।

১১। গজভুক্ত কথ্‌বেল—সংস্কৃত "গজভুক্তকপিত্থবৎ"। 'গজ' অর্থে হস্তী নয়—এক প্রকার ক্ষুদ্র কৃমি। "কপিত্থান্তর্গতঃ কীটো গজ ইত্যভিধীয়তে"—বৈজয়ন্তী। খেল্—বিস্ময়কর আচরণ, যেমন 'ভেল্‌কির খেল্'।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা :—কূপ-পয়, সলিল-সম্পাতে, অঙ্কুশ, গরল, শ্রুতির শোভন শ্রুতি।

পরিবর্ত্তন-যুগ

এই যুগের যে কবিতাগুলি তোমরা এই পুস্তকে দেখিতে পাইবে, তাহাদের সঙ্গে পূর্ব্বের কবিতাগুলি তুলনা করিলে, এই কয়টি বিষয়ে দুই যুগের পার্থক্য স্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

(১) এ যুগের কবিতার ভাষা আরও অধিক সাধু বা সংস্কৃত হইয়া উঠিয়াছে ; তার কারণ, এখন হইতে উচ্চশিক্ষিত সমাজ বাংলা ভাষায় উৎকৃষ্ট কবিতা রচনা করিতে ও পাঠ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। পূর্ব্বে বাংলা ভাষা বিদ্বানের ভাষা ছিল না, সে ভাষায় যে কবিতা রচিত হইত, তাহা প্রায় অর্দ্ধশিক্ষিত জনসাধারণের জন্য ; তাহাতে তাহাদেরই গ্রাম্য ধারণার উপযোগী ভাব ও কল্পনা প্রকাশ পাইত ; ভাষাও তাহারই উপযুক্ত ছিল। দুই চারিজন পণ্ডিত কবির কথা তোমাদিগকে পূর্ব্বে বলিয়াছি—তাঁহাদের ভাষা কতকটা মার্জ্জিত এবং উন্নত হইলেও, কল্পনা অতিশয় সংকীর্ণ ও মামুলী ধরণের ছিল। এক্ষণে, প্রাচীন কাব্য হইতেও যেমন, তেমনই বিদেশী কাব্য হইতেও—উৎকৃষ্ট বিষয়, গভীরতর ভাব, ও উচ্চতর কল্পনা আহরণ করিয়া, বাংলা ভাষায় রীতিমত উচ্চাঙ্গের কাব্যরচনার আগ্রহ—বিশেষ করিয়া, ইংরেজী-শিক্ষিত সমাজের মধ্যে দেখা দিল। এজন্য, পূর্ব্বের ভাষায় আর কাজ চলিল না। গ্রাম হইতে শহরে, অথবা নদী হইতে সমুদ্রে আসিলে, যেমন, এত

নূতন বস্তুর—নূতন দৃশ্যের—সহিত সাক্ষাৎ হয়, যে তাহা বর্ণনা করিতে আগেকার ভাষায় আর কুলায় না,—নূতন শব্দ নূতন বাক্য শিখিয়া বা তৈয়ারী করিয়া লইতে হয় ; তেমনই, এই যুগে, প্রাচীন ও আধুনিক, দেশী ও বিদেশী, বিরাট কাব্য-সাহিত্যের ভাবসকল আত্মসাৎ করিয়া বাংলায় প্রকাশ করিবার জন্য পুরাতন ভাষাকে অনেক পরিমাণে মার্জ্জিত, এবং বহু নূতন শব্দের দ্বারা সমৃদ্ধ করিতে হইল। যাঁহারা এই কাজ উত্তমরূপ করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহারাই এই যুগের প্রধান কবি ও লেখক। এ প্রসঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, আমাদের ভাষার পশ্চাতে সংস্কৃত ভাষার অক্ষয় শব্দ-ভাণ্ডার ছিল বলিয়াই, আমরা এ কাজ এত শীঘ্র করিতে পারিয়াছিলাম ; আরও কারণ, আমাদের বাঙালী জাতির ভাবুকতা ও কল্পনা-শক্তি ভারতের অপর সকল জাতি অপেক্ষা অনেক বেশি, তাই আর কোন ভারতীয় ভাষায় এমন উৎকৃষ্ট সাহিত্য এখনও সৃষ্টি হইতে পারে নাই।,

(২) এই যুগের কবিগণের কল্পনা ও মনোভাব কত ভিন্ন, তাহাও লক্ষ্য কর। কবিরা, এক্ষণে নিজেদেরই ভাবনা-কামনা কবিতায় প্রকাশ করিতেছেন ; মনুষ্য-জীবনের সম্বন্ধেও কত চিন্তা এখন কবিতার বিষয় হইয়াছে ; প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা, শিশুর সৌন্দর্য্য, স্বদেশের গৌরব, স্বজাতির উন্নতি, মানুষের প্রতি গভীর সমবেদনা, দূর-দেশ ও অতীত যুগের সম্বন্ধে কত কল্পনা—কবিগণের চিত্ত আকৃষ্ট করিয়াছে।

(৩) কবিতার ভাষার মত, কবিতার ছন্দও নূতন হইয়া উঠিতেছে ; ইহারও পরিচয় এই কবিতাগুলির মধ্যেই তোমরা পাইবে।

এ যুগের চারিজন কবিই প্রধান :—'মেঘনাদবধ কাব্যে'র কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত; 'সারদামঙ্গলে'র কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী, ইঁহার কাব্যে গীতি-কবিতার একটি নূতন ধারা আরম্ভ হইয়াছে ; হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ইনি 'বৃত্রসংহার' নামক মহাকাব্য রচনা করিয়াছিলেন ; তথাপি, ইঁহার রচিত 'কবিতাবলী' প্রভৃতি খণ্ড কবিতাগুলিই সর্ব্বত্র পঠিত হইত, এবং তাহার জন্যই ইনি এ যুগের কবিগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা লোকপ্রিয় ছিলেন। আর একজন বড় কবি—নবীনচন্দ্র সেন ; ইঁহার রচিত 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র', এবং 'প্রভাস'—এই তিনখানি বড় কাব্য সেকালে খুব খ্যাতিলাভ করিলেও, তাঁহার 'পলাশীর যুদ্ধ' নামক ক্ষুদ্র কাব্যখানিই এক সময়ে সকলের কণ্ঠস্থ ছিল। এই পরিবর্ত্তন-যুগের কবিতা সম্বন্ধে আর একটি কথা তোমরা জানিয়া রাখিবে,—এ যুগে মহাকাব্যই

ছিল কাব্যের আদর্শ, এবং পূর্ব্বে উল্লিখিত মহাকাব্যগুলি ('মেঘনাদবধ', 'বৃত্রসংহার', 'রৈবতক' প্রভৃতি) ছাড়াও বহু মহাকাব্য রচিত হইয়াছিল, তাহাদের প্রায় সবই এক্ষণে লোপ পাইয়াছে, কেবল ঐ কয়খানি মাত্র বাংলা কাব্যের ইতিহাসে টিকিয়া আছে ; এবং তাহাদের মধ্যে কাব্যহিসাবে মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য'ই শ্রেষ্ঠ। এ যুগের আরও অনেক কবির পরিচয় এই পুস্তকে তোমরা পাইবে, তাঁহাদের মধ্যে, 'মহিলা কাব্যে'র কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, এবং 'আলো ও ছায়া'-রচয়িত্রী কামিনী রায়ের নাম বিশেষ করিয়া মনে রাখিবে।

(২৮)

এ যুগের শ্রেষ্ঠ কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের বিখ্যাত মহাকাব্য 'মেঘনাদবধ' হইতে উদ্ধৃত। এ ছন্দ বাংলায় সম্পূর্ণ নূতন—ইহা ইংরাজী Blank Verse-এর অনুকরণে, বাংলা অমিত্রাক্ষর। এই কবিতার ভাষা এবং ছন্দ খুব ভাল করিয়া অভ্যাস করিবে। ভাব খুব সহজ,—কেবল দুরূহ কথাগুলির অর্থ জানিয়া লইলেই, এবং ছন্দ ঠিক মত পড়িতে পারিলেই, এ কবিতা খুব ভাল লাগিবে।

ছন্দ—অমিত্রাক্ষর, অর্থাৎ মিলহীন পয়ার, কিন্তু পয়ারের মত পড়িলে চলিবে না ; লাইনের শেষে না থামিয়া যেখানে বাক্য শেষ হইয়াছে সেইখানে থামিবে ; এবং তাহারও মধ্যে, বাক্যের অংশগুলি অর্থ-অনুসারে একটু পৃথক করিয়া পড়িবে—তাহা হইলেই পড়িতে কোন কষ্ট হইবে না। একটু দেখাইয়া দিতেছি—

ছিনু মোরা, | সুলোচনে, | গোদাবরী তীরে, |
কপোত-কপোতী যথা | উচ্চ বৃক্ষচূড়ে, |
বাঁধি' নীড়,—থাকে সুখে ; || ছিনু ঘোর বনে, |
নাম পঞ্চবটী,—মর্ত্ত্যে | সুরবন সম। ||

প্রত্যেক লাইনে ৮ ও ৬ অক্ষরের পদভাগ আছে—যেমন পয়ারে থাকে ('বাংলা ছন্দ' দেখ) ; তাই মাঝে ও শেষে এই (।) চিহ্ন দিয়াছি—ওই দুই জায়গায় খুব সামান্য একটু থামিতে হয় ; উহাকে 'যতি' বলে। এখানে প্রথম লাইনের শেষে একটু বেশী থামিতে হইবে, কারণ ওখানে 'কমা' আছে। মাঝে এক জায়গায় আরও বেশি থামিতে

হইবে বলিয়া (‖) এইরূপ ডবল চিহ্ন দিয়াছি। যেখানে কথাগুলি পৃথক করিয়া পড়িতে হইবে সেখানে (—) এইরূপ চিহ্ন দিয়াছি। কিন্তু এই সকল চিহ্নের দরকার হয় না; অর্থ বুঝিয়া পড়িলে, থামিবার জায়গাগুলি আপনিই ঠিক হইয়া যায়, তখন ছন্দ বুঝিতে কোন কষ্ট হয় না। কেবল যতির স্থানগুলি একটু লক্ষ্য করিবে।

২০। পীরিতি - প্রীতি, আনন্দ। ২৩। মধু—বসন্তকাল। ৩৬-৩৭। তুলনাটি ঠিক হইয়াছে কিনা দেখ। ৪৬। দেবকন্যারা সূর্য্যরশ্মির রূপ (ছদ্মবেশ) ধরিয়া পদ্মবনে খেলা করিতেন। ৬১-৬৩। নদীর জলে আকাশের প্রতিবিম্ব।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা ঃ—পঞ্চবটীবনচর মধু নিরবধি; বৈতালিক; কান্তার; রাঘব-রমণী।

(২৯)

মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদ বধ' কাব্য হইতে।

ছন্দ—অমিত্রাক্ষর। পূর্ব্বের কবিতা দেখ।

১। নাথ—মহাপুরুষ-বাচক উপাধি, যেমন, ইংরাজী Lord; এখানে—রামচন্দ্র। ২৬। বলি—'বলী'র সম্বোধনে; মধুসূদন বীরমাত্রেরই নামের পূর্ব্বে এই বিশেষণ ব্যবহার করিয়াছেন। ২৭। গুণহীন—'গুণ' অর্থে ধনুকের ছিলা। ৩৯। সুধিবেন—সুধাইবেন। ৫০। আচার—ইংরাজী, conduct. ৫৬। সরস'—(ক্রিয়াপদ) সরস কর।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা ঃ—সুধন্বি; মহাবাহু; পৌলস্তেয়; সর্ব্বভূক্; দুর্ব্বার; কর্ব্বুরোত্তম; শিশির-আসারে; নিদাঘার্ত্ত।

(৩০)

মধুসূদনও ইংরাজী ধরণের Stanza বা স্তবক-ছন্দ রচনা করিয়াছিলেন—এই কবিতাটীতে সেই ছন্দ খুব সুন্দর হইয়াছে। কবিতাটী আবৃত্তি করিবার উপযোগী, মুখস্থ করিলে ভাল হয়। কয়েকটী সুন্দর উপমা আছে। অর্থ, প্রেম, ও যশ—এই

তিনেরই অত্যধিক আকাঙ্ক্ষার কোনটাই পূর্ণ হয় নাই—শেষে কেবল হাহাকারেই জীবন শেষ হইল; ইহাই কবিতাটীর মূল ভাব।

ছন্দ—পদভাগের ছন্দ, ছয় লাইনের Stanza বা স্তবক; লাইনগুলি—৮+৮, এবং ৬; মিল এইরূপ—ক খ ক খ গ ক।

২৯। এ উপমার এখানে সার্থকতা কি? ৩১। ব্যয়িলি—অপব্যয় করিলি; মধুসূদনের এই নূতন ধরণের ক্রিয়াপদ-সৃষ্টি লক্ষ্য কর। ৩৫। অর্থাৎ, যশ লাভ করিয়া এই হইল যে, বহুলোক ঈর্ষা করিতেছে। ৪০। পামর—মূর্খ।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা :—অম্বুবিম্ব; সন্তঃপাতি; ক্ষণপ্রভা; জ্বলন্ত পাবক-শিখা।

(৩১)

কাশীরাম দাস সংস্কৃত মহাভারত বাংলা ভাষায় তর্জ্জমা করিয়া বাঙ্গালীর যে উপকার করিয়াছিলেন, (আজও বাঙালীর পক্ষে উহাই একমাত্র খাঁটি বাংলা মহাভারত)—কবি মধুসূদন এই কবিতায় কাশীদাসের সেই কবি-গৌরব কীর্ত্তন করিয়াছেন। উপমাগুলি কেমন সার্থক হইয়াছে, দেখ।

ছন্দ—ইহাও, একরূপ স্তবক—ইহার ইংরাজী নাম Sonnet; মধুসূদনই সর্ব্বপ্রথম এইরূপ কবিতা লিখিয়াছিলেন, তিনি ইহার নাম দিয়াছিলেন—'চতুর্দ্দশপদী কবিতা'। পয়ার-ছন্দের চৌদ্দটি লাইনে বাংলা সনেট রচিত হয়। ইহার মিলের নিয়ম বড় কড়া; খাঁটি সনেটে দুইটি ভাগ থাকে—৮ লাইন ও ৬ লাইন। প্রথম আট লাইনের মিল—ক খ খ ক, ক খ খ ক—এইরূপ হওয়া উচিত। শেষের ৬ লাইনে মিল ইচ্ছামত হইতে পারে। সকল সনেটে এই নিয়ম রক্ষিত হয় না, এখানেও হয় নাই।

৩। সংস্কৃত হ্রদে—অর্থাৎ যে জল একস্থানে বদ্ধ ছিল। ঋষি দ্বৈপায়ন—মহাভারতের কবি বেদব্যাস। দ্বীপে জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার উপাধি হইয়াছে 'দ্বৈপায়ন' (দ্বীপের বিশেষণ)। 'ভগীরথ', 'সগরবংশ' প্রভৃতির গল্প মহাভারতে আছে।

৯। ভাষা-পথ—এখানে 'ভাষা' অর্থে বাংলা ভাষা; সংস্কৃত ছাড়া আর সকল ভাষার সাধারণ নাম 'ভাষা'। খননি—খনন করিয়া; পূর্ব্বের 'ব্যয়িলি' দেখ।

১০। ভারত—মহাভারত। ১১। গৌড়—বঙ্গদেশ—বাঙ্গালী। ১৩। এই লাইনটি অবিকল কাশীরামের মহাভারতে প্রত্যেক পরিচ্ছেদের শেষে আছে।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা :—চন্দ্রচূড়-জটাজালে ; ব্রতী ; কবীশ।

(৩২)

এ কবিতাটি কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর 'নিসর্গ-সন্দর্শন' কাব্য হইতে উদ্ধৃত। বিহারীলালের কবিতায় যেমন ভাবের সরলতা ও স্বাভাবিকতা একটু অধিক, তেমনই তিনি, যতদূর সম্ভব সহজ ভাষায়, সেই ভাব ব্যক্ত করেন ; যেরূপ ভাষা তিনি নিত্য ব্যবহার করেন—আবশ্যক হইলে, সেই ভাষার অতিশয় চল্‌তি (colloquial) শব্দ কবিতায় ব্যবহার করিতে তিনি কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করেন না। কিন্তু তাই বলিয়া, তাঁহার কবিতায় ভাবের অনুযায়ী বিশুদ্ধ ও কবিত্বময় ভাষারও অভাব নাই। তাঁহার কাব্যগুলি পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, ভাষার বিষয়ে তাঁহার বিশেষ পাণ্ডিত্য ও সূক্ষ্ম জ্ঞান ছিল। এই কবিতায়, সাধু ও চল্‌তি শব্দের কিরূপ মিশ্রণ হইয়াছে তাহা বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবে। এইরূপ হওয়ার কারণ,—বিহারীলাল ভাবের সঙ্গে সঙ্গে যেথানে যেমন কথা আপনি আসিয়াছে, তাহাই লিখিয়াছেন। কবিতাটি পড়িলে মনে হয়—কবি দূরে বসিয়া সমুদ্রের দৃশ্য কল্পনা করিতেছেন না, একেবারে সমুদ্রের সম্মুখে দাঁড়াইয়া এই কথাগুলি উচ্চারণ করিতেছেন ; ইহাই এই কবিতার সৌন্দর্য্য। এই কবিতায় ইংরেজ কবি বায়রণের বিখ্যাত—'Roll on ! thou deep and dark blue Ocean—roll !'—কবিতার ছায়া আছে।

ছন্দ—পয়ার ছন্দের চার লাইনের স্তবক (stanza) ; মিল—ক খ ক খ।

৫। কল্লোল—বৃহৎ তরঙ্গ। ৭। কাণে 'তালা লাগা'—চল্‌তি বুলি। ১৬। ভ্রূক্ষেপ—ছন্দ রক্ষার জন্য 'ভুরূক্ষেপ' পড়িতে হইবে। ৩৭—৪০। এই চারিটি লাইনে ভাব বেশ গভীর হইয়া উঠিয়াছে। 'থরহরি'—একটি চল্‌তি শব্দ ; 'থরথর' করিয়া কাঁপা অপেক্ষা 'থরহরি কাঁপা' আরো বেশি ভয়ের সূচনা করে।

৪১। আদি মনু—পুরাণের মতে, 'মনু' অনেকগুলি—এক এক মহাযুগের অধিপতি এক এক 'মনু', তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন নামও আছে। আদি-মনুর নাম—

'স্বায়ম্ভুব মনু'। এখানে—'আদি মনু' অর্থে 'আদি মানব' বুঝিতে হইবে। ২৫-৪৪। এই কয় পংক্তি ইংরেজ কবি বায়রণের বিখ্যাত কবিতার এই লাইনগুলি স্মরণ করাইয়া দেয়—

"Thy shores are empires, changed in all save thee—
Assyria, Greece, Rome, Carthage, what are they?
Thy waters washed them power while they were free,
And many a tyrant since; their shores obey
The stranger, slave, or savage; their decay
Has dried up realms to deserts;—not so thou;—
Unchangeable, save to thy wild waves' play;
Time writes no wrinkle on thine azure brow;—
Such as Creation's dawn beheld, thou rollest now."

—*Childe Harold.*

(৩৩)

এই কবিতাটি বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল' কাব্য হইতে উদ্ধৃত। কবিতাটি খুব ভাল করিয়া পড়িবে—ইহার ভাব, ভাষা, ও কল্পনা সবই চমৎকার। এই কবিতায় বিহারীলাল,—আদিকবি বাল্মীকির মুখে প্রথম শ্লোক বাহির হওয়ার যে কাহিনী আছে—তাহাকে নিজের কল্পনার দ্বারা নূতন ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ব্যাধের শরে নিহত ক্রৌঞ্চের জন্য তাহার সহচরী ক্রৌঞ্চীর আর্ত্ত-চীৎকার শুনিয়া আদিকবি বাল্মীকির প্রাণে যে করুণার উদ্রেক হইয়াছিল তাহা হইতেই কবিতার জন্ম হইল—শোকই 'শ্লোক' হইয়া উঠিল। বিহারীলাল এই কবিতাটিতে ইহাই প্রতিপন্ন করিতেছেন যে, কবিতার দেবতা সরস্বতী কবিরই মানস-কন্যা; কবির হৃদয়ে যে সৌন্দর্য্য, কোমলতা, ও পবিত্রতা তাঁহারও অজ্ঞাতসারে বাস করিতেছে, তাহা যখন বাহিরে কবিতারূপে প্রকাশ পায়, তখন তাঁহার নিজেরই বিস্ময় ও আনন্দের সীমা থাকে না। এই কবিতার আরও এক অর্থ এই যে, সর্ব্বজীবে করুণা, প্রীতি ও প্রেমই—কবিত্বের মূল উৎস।

ছন্দ—স্তবক (stanza)—পদভাগের ছন্দ। ৮ অক্ষর ও ১৪ অক্ষরের চরণ। চরণের সংখ্যা ঠিক নাই। মিলের পদ্ধতি লক্ষ্য কর।

২। আলা—আলো (যেমন, কালা—কালো)। ৬। তামসী-অরুণ—অন্ধকার হইতে ফুটিয়া-উঠা ঈষৎ লোহিতবর্ণ। ধরণী লুটায়—ধরণীতে লুটায়। সহসা ললাটভাগে—ললাট মনুষ্যদেহের সর্ব্বোচ্চ ও শ্রেষ্ঠ স্থান। যত-কিছু শ্রেষ্ঠ ভাব ও চিন্তার আবির্ভাব হয় ললাটের তলে—এইরূপ একটা ধারণা আছে। গ্রীক-পুরাণে আছে যে, মিনার্ভা বা বিদ্যাদেবী স্বর্গরাজ জুপিটারের ললাট ভেদ করিয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বিলোচন—বিশিষ্ট বা সুন্দর লোচন। উত উত উতরোল—'উতরোল' শব্দের 'উত' অংশটিকে এইরূপ দুইবার উহার পূর্ব্বে বসাইয়া কবি মূল শব্দের ভাবটিকে প্রবলতর করিয়াছেন; তুলনীয়—'হু-হুঙ্কার'।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা :—বিকচ; তামসী-অরুণ; লোচনলোভা; রবিচ্ছবি; বিলোচন; উতরোল; উভরায়।

(৩৪)

কবিতাটি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'মহিলা কাব্য' হইতে উদ্ধৃত। সুরেন্দ্রনাথের কবিতায় ভাব অপেক্ষা চিন্তার গভীরতাই বেশী; ভাষাও সংস্কৃতরীতিযুক্ত—বাক্যগুলি অতিশয় সংক্ষিপ্ত ও সমাসবহুল। এইরূপ রচনা এ যুগের আর কাহারও নহে; এজন্য সুরেন্দ্রনাথের কবিতা অতিশয় মনোযোগের সহিত পাঠ করা উচিত। এই সঙ্গে তাঁহার প্রসিদ্ধ 'মাতৃস্তুতি' কবিতাটিও পড়িবে—'প্রসীদ, প্রসন্নমনা জননী আমায়'। এই কবিতার ছন্দ পূর্ব্বকবিতার মত—অথচ ভাষা একেবারে বিপরীত বলিয়া, কবিতাটির সুর কত ভিন্ন! পূর্ব্বের কবিতাটি 'গীতি-কবিতা'; এ কবিতা—'নীতি-কবিতা'।

ছন্দ—পূর্ব্ব কবিতার মত।

৩। রসাক্ত—আর্দ্র, জলসিক্ত। ১১। পাপীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায় বলিয়া। ২৪। অদীন—আত্মপ্রত্যয়যুক্ত; সাহসী। ২৫। বাল্যকালে কল্পনাশক্তি যেমন সহজ, বিশ্বাস করিবার শক্তিও তেমনই অপরিমিত হইয়া থাকে। ৪৮। সুনিত্য—চিরদিন। ৬০। শেষ—'শেষ' নাগ; তাঁর এক নাম 'অনন্ত'; তাহার মুখের সংখ্যা নাই বলিয়া, এইরূপ তুলনা করা হইয়াছে। ৬৫। এই বিশ্ব যে শক্তির দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে তাহা মাতৃ-শক্তি, অর্থাৎ, মাতাই জগদ্ধাত্রী।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা :—ঈশ-ভ্রূ ; অদীন-চিত ; মৃত্যুহরী ; অঙ্গত্রাণ ; ভাবি-ভয়-বিবর্জ্জিত ; কন্দুক সমান।

(৩৫)

কবিতাটিতে যৌবনকাল সম্বন্ধে কবি যে কয়টি কথা বলিয়াছেন তাহার বেশি কিছু আর বলিবার নাই—যেন কয়েকটি সার কথা সংক্ষেপে বলিয়া বিষয়টিকে শেষ করিয়া দিয়াছেন। ইংরাজীতে 'Bacon's Essays' যেরূপ অর্থপূর্ণ ও সংক্ষিপ্ত রচনা, সুরেন্দ্র-নাথের কবিতাও সেইরূপ উৎকৃষ্ট গদ্যরচনার মত ; ইহার উপমাগুলিই ইহার একমাত্র কবিত্ব।

ছন্দ—সাত চরণ-বিশিষ্ট স্তবক (stanza)—পদভাগের ছন্দ ; মাঝে দুইটি ৮ অক্ষরের চরণ, বাকী সব ১৪ অক্ষরের। মিলগুলি এইরূপ—ক ক খ গ গ খ থ।

৫। ঘন-অবকাশে—মেঘের ফাঁকে। ১৩-১৪। নীচ প্রবৃত্তির সহিত উচ্চ প্রবৃত্তির যুদ্ধ ; অথবা, দেহ ও মন পরস্পরের শক্তি বৃদ্ধি করিয়া সর্ব্ববিষয়ে জীবনকে আনন্দময় করে। ২৫। তোমায়—তোমার দ্বারা।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা :—ক্ষণিক শশাঙ্ক-ভাতি ; অটন রটন ; মৈত্রী ; গিরিসন্ধি-স্থল ; যুবজানি।

(৩৬)

কবি যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের তিনটি কবিতা এখনও সুপাঠ্য হইয়া আছে—'ধাত্রী পান্না' 'জন্মভূমি' ও 'নক্ষত্র'। যদুগোপালের কবিতাগুলির ভাষাই সর্ব্বাপেক্ষা লক্ষণীয় ;—ধ্বনি-মাধুর্য্যের সহিত ভাবগাম্ভীর্য্য তাঁহার প্রিয় ছিল। তাঁহার ভাষা সেকালের অপর কবিগণের তুলনায় অতিশয় সংযত, সুমার্জ্জিত ও শৈথিল্যবর্জ্জিত। এই কবিতার ভাষার সঙ্গে (৪৪) সংখ্যক কবিতা এবং মধুসূদনের কবিতার ভাষা তুলনীয়। ইহাই বাংলা কাব্যের সংস্কৃতগন্ধী বা ক্ল্যাসিক্যাল ভাষা ; এ ভাষার একটি স্বকীয় সৌন্দর্য্য আছে। সত্য, নীতি ও চরিত্র-মহিমা এবং ভাবুকতা তাঁহার কবিতাগুলির প্রধান প্রেরণা হইয়াছে দেখা যায়। কিন্তু তাঁহার ভাষার গুণেই সেগুলি এখনও বাঁচিয়া আছে।

তোমরা এ কবিতাটি মুখস্থ করিতে পারো। এই কবিতার উপমাগুলি যেমন সহজ-সুন্দর, তেমনই ভাষার গুণে আরও মনোহারী হইয়াছে।

ছন্দ—চার লাইনের একান্তর মিলযুক্ত স্তবক—চৌদ্দ অক্ষরের পয়ার ছন্দ।

৫। শ্যামাঙ্গিনী—সংস্কৃত 'শ্যামাঙ্গী'। ১০। মেঘ-সখা—ময়ূর মেঘ দেখিলে আনন্দে নৃত্য করে, এজন্য কবিগণ ময়ূরকে মেঘ-সখা বলিয়া থাকেন। ১২। চন্দ্রক—'ক্ষুদ্র চন্দ্র'; ময়ূরের পুচ্ছে ছোট ছোট চন্দ্রাকৃতি চিহ্ন আছে। ৯-১২। এই কয় পংক্তির সহিত তুলনীয়—

> "When night, with wings of starry gloom,
> O'ershadows all the earth and skies,
> Like some dark beauteous bird whose plume
> Is sparkling with unnumbered eyes ;"
>
> —*Thomas Moore* (Thou art, O God !).

১৬। দেবেন্দ্রকামিনী—ইন্দ্র-পত্নী শচী; বহুমান—একটি যুক্ত-শব্দ (phrase); অর্থ, 'অত্যধিক আদর'। ১৭। প্রসর—বিশেষণ, বিশেষ্য—'প্রসার'। ২০। প্রমোদিত—এখানে, 'প্রস্ফুটিত'। ২৯। গ্রহ, গ্রহদলপতি—Planet ও Star; গ্রহদলপতি—যেমন, সূর্য্য; সূর্য্যও একটি Star। ফলিত-জ্যোতিষের (Astrology) মতে, মানুষের জন্মক্ষণে গ্রহগণ যেভাবে অবস্থান করিয়া পরস্পর দৃষ্টি করে, তাহারই ফলে জাতকের সারাজীবনের ভাগ্য নির্ণয় হইয়া থাকে। ৩৩। ঋষি হও, ঋক্ষ হও—যথা, 'সপ্তর্ষিমণ্ডল' নামক নক্ষত্রপুঞ্জ; ইহার ইংরাজী নাম, 'Great Bear'; 'ঋক্ষ' অর্থে ভল্লুক (Bear)। দাক্ষায়ণী—দক্ষকন্যা সতী [(১৪) কবিতা দেখ]; দক্ষের আর সকল কন্যা 'তারারূপে রূপবতী দারা চন্দ্রমার' হইয়াছেন। ৩৭। দৃষ্টির-সহায়-যন্ত্র—অর্থাৎ, দূরবীক্ষণ-যন্ত্র। ৪১। বিমান-গ্রন্থে—বাংলায়, 'বিমান' অর্থ—'আকাশ'; সংস্কৃত অর্থ—ব্যোমযান। ৪৩-৪৮। এই শেষ লাইনগুলিতেই সমস্ত কবিতাটি ভাবের দিক দিয়া সার্থক হইয়াছে, এইখানেই বিজ্ঞানের উপরে কবিত্ব জয়ী হইয়াছে। এই শেষ স্তবকটির ভাব পূর্ব্বোক্ত ইংরাজী কবিতার অনুরূপ, সেখানেও আছে—

> "Thou art, O God ! the life and light
> Of all this wondrous world we see ;

Its glow by day, its smile by night,
Are but reflections caught from Thee.
Where'er we turn Thy glories shine,
And all things fair and bright are Thine."

ভাষা ও শব্দশিক্ষা :—মনোমুগ্ধকর ; কবরী-ভূষণ ; ব্যোমচর ; চন্দ্রক ; লোচন-লোভন ; বহুমান।

(৩৭)

কবিতাটি হেমচন্দ্রের 'কবিতাবলী'তে আছে। মার্কিন কবি Longfellow-র "Psalm of Life" কবিতাটির অনুসরণে লিখিত ; তাহার প্রথম দুই পংক্তি এইরূপ—

"Tell me not in mournful numbers,
Life is but an empty dream."

ছন্দ—ত্রিপদী—৮+৮+১০।

৯। অর্থাৎ, সুখ চাহিলেই দুঃখ পাইতে হইবে। ১৬। তুলনীয় : "নলিনীদলগতজলমতিতরলম্। তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্॥" (মোহমুদ্গর) ; অর্থাৎ, জীবন অতিশয় ক্ষণস্থায়ী—একটু বাতাস লাগিলে যেমন ওই জলবিন্দু জলাশয়ে পড়িয়া যায়, আয়ুও তেমনই যে কোন মুহূর্তে কাল-সাগরে মিশাইয়া যাইতে পারে। ৬। ইংরাজী কবিতায় আছে—"Things are not what they seem"। ২১-২৮। এই কয় পংক্তি মুখস্থ করিবে। ইংরেজীতে এইরূপ আছে :—

"Lives of great men all remind us
We can make our lives sublime ;
And, departing leave behind us
Footprints on the sands of time."

ভাষা ও শব্দশিক্ষা :—দারা পুত্র পরিবার ; সংসার-সমরাঙ্গনে ; বীর্য্যবান ; বরণীয় ; সময়-সাগর-তীরে।

(৩৮)

কবিতাটি হেমচন্দ্রের 'কবিতাবলী'তে আছে। এই কবিতাটি পড়িয়া বুঝিতে পারিবে হেমচন্দ্রের কবিতা এককালে সর্ব্বসাধারণের অতিশয় প্রিয় ছিল কেন। বিষয়টি 'শিশুর

হাসি', অতএব সকলেই বুঝিবে; ইহার ভাব এবং অর্থ দুই-ই অতিশয় প্রাঞ্জল,—সকলের মনেই এমন ভাব জাগিতে পারে; ভাবাও এমন নয় যে, কোথাও কোন সূক্ষ্ম অর্থ লুকাইয়া আছে; ছন্দেরও একটি স্বচ্ছন্দ গতি আছে। এই সকল গুণে পরিবর্ত্তন-যুগের কবিদের মধ্যে হেমচন্দ্রই সমধিক জনপ্রিয় হইয়াছিলেন।

ছন্দ—পদভাগের ছন্দ, (৩৩, ৩৪, দেখ)।

১৪। বিধি যাহা মনে করেন বা ধ্যান করেন, তাহাই তৎক্ষণাৎ সৃষ্টিতে প্রকাশ পায়—সংকল্পমাত্রেই সৃষ্টি হয়। ১৬। উটি—'ওটি'র মিষ্ট উচ্চারণ—আদরে। ৩৪। অতুলনা—বিশেষণটি স্ত্রীলিঙ্গ নয়; 'নাই-তুলনা-যাহার'। ৩৬। বারি-কোলে—নদীর বুকে।

(৩৯)

এ কবিতাটিও হেমচন্দ্রের 'কবিতাবলী'র 'কবিতা। এরূপ কবিতাকে 'reflective' বা 'ভাবনামূলক' কবিতা বলা যাইতে পারে। হেমচন্দ্রের কবিতায় এই ধরণের ভাবুকতা প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়; জাতির অদৃষ্ট, মানুষের ভাগ্য, জীবনের পরিণাম প্রভৃতির সম্বন্ধে অতিশয় সহজ আবেগময় চিন্তা—ও তাহাতে ইতিহাসের দৃষ্টান্ত মিশাইয়া, তিনি এমন কবিতা রচনা করিতেন, যে, তাহাতে সাধারণ পাঠকের মনেও বেশ একটু বৈরাগ্য ও বিষাদের ভাব জাগে। জগৎ, সংসার, ও মানুষের ইতিহাস—এমন ভাবে ভাবনা করিয়া প্রাচীন কবিরা কবিতা লিখিতেন না; অথচ কবিতার ভাষা ও ছন্দ, এবং ভাবের ভঙ্গিটি খুব নূতন নয়—তাই সেকালের বাঙালীর পক্ষে এমন কবিতা অতিশয় উপাদেয় বোধ হইত। এইরূপ কবিতাকেই যথার্থ পরিবর্ত্তন-যুগের কবিতা বলা যাইতে পারে—হেমচন্দ্র ছিলেন খাঁটি সেই যুগের কবি। এই কথাগুলি মনে রাখিয়া এ কবিতা মনোযোগের সহিত পাঠ করিবে।

ছন্দ—স্তবক (stanza):—পদভাগের ছন্দ; চরণ কয়টি, সকলের মাপ এক কি না, এবং মিলের গাঁথুনি কিরূপ—নিজেরা পরীক্ষা কর।

১। মৃণাল—(বাংলায়) পদ্মের ডাঁটা; সংস্কৃত 'মৃণাল' অর্থে পদ্মের নাল বা ডাঁটার সূত্র; অথবা, পঙ্কমধ্যস্থ পদ্মলতার মূল। ১১। নিবন্ধন—নির্ব্বন্ধ।

১৩। স্রোতঃশিলা—কথাটির অর্থ এখানে খুব স্পষ্ট নয়; 'স্রোতের মুখে শিলাখণ্ডের মত'। ২১। মিশরের 'পিরামিড'। ৩০। কুলে বাতি দিতে কেহ নাই—একটি প্রচলিত বাক্য, অর্থ—'বংশে আর কেহ বাঁচিয়া নাই'। ৩২। গ্রীসের ইতিহাসে দুইটি বিখ্যাত রণস্থল,—কাহিনী জানিয়া লইবে। ৩৩। গিরীশ—Greece। ৪০। একাদি নিয়ম—আদি হইতে এক নিয়ম, অর্থাৎ সমান প্রভুত্ব। ৪৭-৪৮। রাজপথ দুর্গে যার, ইত্যাদি—ভাষাটি বড় সুন্দর। ৪৪-৪৫। হিস্পানি—স্পেন দেশ; সিন্ধু ও হিন্দু একই নাম। কাফের—অবিশ্বাসী, বিধর্ম্মী; যবন—মূল অর্থ যূনানী বা গ্রীক জাতি; পরে শব্দটির কু-অর্থ হইয়াছে—অনাচারী জাতি। এখানে ইহার অর্থ, অ-মুসলমান জাতি। ৪৭। 'দীন্'—ধর্ম্ম; ধর্ম্মযুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলে স্বর্গলাভ হয়, এই বিশ্বাসে মুসলমান বীরগণ যুদ্ধকালে 'দীন্' 'দীন্' বলিয়া হৃদয়ে বলসঞ্চার করিতেন। (৪) ও (৫) স্তবক দুইটি মুখস্থ করিবে। ৫৫। জগতের চক্ষু—চক্ষু একটি জ্ঞানেন্দ্রিয়; অতএব, 'যে জাতির সহায়তায় জগৎ জ্ঞান লাভ করিয়াছে'। ৬৫। অর্থাৎ—যাহারা এতদিন অন্ধকারে ছিল, তাহারাই এইবার দীপ্তিলাভ করিবে।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা:—অবনীতে অপরূপ; কুলে দিতে বাতি; আকাশ-পয়োধি-নীরে; জগতীতলে; পূর্ণগ্রাসে প্রভাকর।

(৪০)

কবির রচিত বিখ্যাত 'সদ্ভাবশতক'-এর কবিতা। কবিতার ভাব এতই যথার্থ, এবং ছন্দ এত মধুর যে, ইহা একটি প্রবাদের মত হইয়া গিয়াছে।

ছন্দ—পদভাগের ছন্দ, চৌপদী। প্রত্যেক চরণে চারিটি পদ আছে—প্রথম তিনটিতে ৬ অক্ষর, এবং শেষেরটিতে ৫ অক্ষর আছে।

(৪১)

সংস্কৃত মহাকবি কালিদাসের বিখ্যাত 'মেঘদূত' কাব্যের একটি বর্ণনার অতিশয় সরল ও সুন্দর ভাবানুবাদ। ভাষা কি সহজ অথচ মধুর, তাহা লক্ষ্য কর। এমন সহজ সরল ভাষায় এ ধরণের কবিতা আজকাল আর দেখা যায় না। যক্ষের গল্পটি না জানা থাকিলে শিক্ষক মহাশয়ের নিকট জানিয়া লইবে।

ছন্দ—ত্রিপদী (৮+৮+১০)।

৫। থইথই করে—(চলতি বুলি) ছাপাইয়া উঠে; কূলে কূলে পূর্ণ। ৬। হাট—মেলা; একত্র অনেকগুলি। ১১। মানস-সরে—মানস-সরোবরে; মানস সরে—ইচ্ছা হয়। এইরূপ শব্দ-ব্যবহারের কৌশলকে 'যমক' বলে [(২৩) দেখ)] ১৭-২০। ছবিটি বুঝিবার চেষ্টা কর। ৩৫-৩৬। সূর্য্য অস্ত গেলে পদ্ম যেমন মলিন ও মুদিত হইয়া যায়, তেমনি আমার অবর্ত্তমানে সেই গৃহের শোভা মলিন হইয়াছে।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা:—সরসীর স্বচ্ছজলে; মেঘেতে তড়িৎ যেন সাজে; মাধবী-মণ্ডপ; কুরুবক; কেকাভাষী।

(৪২)

বাংলায় 'যুদ্ধ-কবিতা'—ইংরাজীতে যাহাতে 'battle piece' বলে—প্রায় নাই বলিলেই হয়। এই কবিতাটি সেই হিসাবেই পড়িবে; ইংরাজী Hohenlinden, The Charge of the Light Brigade প্রভৃতি কবিতার সহিত তুলনা করিবে। 'পলাশীর যুদ্ধ' বাংলার ইতিহাসে একটা বড় ঘটনা—তাহার কথা তোমরা নিশ্চয় জানো।

ছন্দ—চার চরণের স্তবক (stanza); পদভাগের ছন্দ; চরণগুলির মাপ ও মিল, এবং সাজাইবার রীতি লক্ষ্য করিয়া স্তবকের গঠন বুঝিয়া লও।

৪। আম্রবন—সংস্কৃত বানান, 'আম্রবণ'। ১০। সদর্পভরে—দর্পভরে। ৩৬। সসজ্জিত—সুসজ্জিত, না সসজ্জিত? ৩৭। চিত্রিত প্রাচীর—উপমাটি কেমন যথার্থ হইয়াছে বুঝিয়া দেখ। ৪০। একটি সুন্দর লাইন। 'রণ-পয়োধি'—উপমাটি কি কারণে সার্থক হইয়াছে? (১১) স্তবকটির বক্তব্য কোন্ অর্থে সত্য হইতে পারে? ৫৭। বাজিল—শব্দটির এখানে যে অর্থ হইয়াছে তাহা লক্ষ্য কর। শব্দের এরূপ অর্থ কোথায়, কি জন্য হয়? ৫৭। নির্ঘাত—(চলতি ভাষায়) 'অব্যর্থ'; এখানে 'প্রচণ্ড আঘাত'। ৬০। উপমাটি সুন্দর হইয়াছে। ৬১। নাচিছে—অনিশ্চিতভাবে দোল খাইতেছে—কোন্ পক্ষের দিকে যাইবে ঠিক নাই। ৬৮। অনুমতি—আদেশ।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা :—অর্দ্ধ-নিষ্কোষিত; অংসোপরে; কণ্টকাকীর্ণ; বজ্রনাদী; ব্যাজ; বীর-প্রসবিনী; অশনি-সম্পাত।

(৪৩)

এই কবিতাটি একটি বিখ্যাত কবিতা; ছন্দ এমনই সুন্দর যে, পড়িলেই মুখস্থ করিতে ইচ্ছা হইবে। 'যমুনা-লহরী' নামটিও কবিতার ছন্দের উপযোগী হইয়াছে। কবি দিল্লী-আগ্রার তল-বাহিনী যমুনার কথাই ভাবিয়াছেন—সেই স্থানে বসিয়াই এই কবিতা লিখিয়াছেন। যমুনার তীরে ভারতের অতীত গৌরবের নিদর্শনস্বরূপ যে সকল বিখ্যাত নগরী ও রাজধানীর চিহ্ন এখনও রহিয়াছে, তাহাদের বর্ত্তমান শ্রীহীন অবস্থা কবির চিত্তে যে বিষাদ ও বৈরাগ্যের ভাব জাগাইয়াছে তাহাই এ কবিতার কবিত্ব। মানুষের সকল কীর্ত্তি সকল মহিমাই নশ্বর—এই ভাবনার দীর্ঘশ্বাস এই কবিতার ছন্দের মধ্যেও বহিতেছে। [তুলনীয়-(৩৯)]

ছন্দ—মাত্রা-ছন্দ ('বাংলা কবিতার ছন্দ' দেখ)।

৫। ধবল সৌধছবি—প্রস্তরনির্ম্মিত সুন্দর শ্বেত অট্টালিকা, যেমন, আগ্রার 'তাজমহল'। ৬। জল-নীলে—নীল জলে; কবিতায় বিশেষ্য ও বিশেষণের এইরূপ উলট-পালট হয়। যমুনার জল কালো বলিয়া প্রসিদ্ধ। জলে আকাশের প্রতিবিম্বের উপরে এই শুভ্র অট্টালিকার প্রতিবিম্ব মেঘমালার মত দেখাইতেছে। নভ-অঞ্জন—মেঘ। শব ও সব—দুইটি শব্দ শুনিতে একই; ইহাও একরূপ শব্দালঙ্কার, অর্থাৎ কবিতার শব্দ-কৌশল। ২৮। অর্থাৎ, যে-কালে তোমার তীরে বড় বড় রাজ্য ও রাজধানী বিদ্যমান ছিল, সেইকালে ভারতবর্ষ হইতে দেশ-বিদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার হইয়াছিল; ভারতের সে এক গৌরবময় যুগ। ৩১। পয়ঃপারে—স্রোতস্বিনী তীরে; পয়ঃ অর্থে, (এখানে) নদী। ৩৯। কৌতুক—খেলা, মিথ্যা অভিনয়। ৪১। গৌরব, সৌরভ—ঐশ্বর্য্যের মহিমা ও সৌন্দর্য্যের খ্যাতি। ৪২। কাহিনী—মিথ্যা গল্পমাত্র।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা :—তটশালিনী; ধবল সৌধ-ছবি; নভ-অঞ্জন; তুরগ-গজ-ভারে; শব-নীরব; কাল-কবল।

(৪৪)

এই কবিতাটি নবীনচন্দ্র দাস-কৃত 'রঘুবংশে'র বিখ্যাত বাংলা অনুবাদ হইতে উদ্ধৃত। 'রঘুবংশ' মহাকবি কালিদাসের রচিত সংস্কৃত ভাষার শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য। তোমরা সকলেই মহাকবি কালিদাসের নাম শুনিয়াছ—কিন্তু সকলের হয়ত মূল সংস্কৃতে তাঁহার কাব্য পড়িবার সম্ভাবনা নাই। সেই কারণে, কালিদাসের কবিতার পরিচয় বাংলায় যতদুর সম্ভব একটু দিবার জন্য, 'রঘুবংশে'র ষষ্ঠ সর্গের অনুবাদ হইতে এই অংশ উদ্ধৃত করিয়াছি। ইহাতে কালিদাসের ভাষারও কিছু পরিচয় পাইবে। অনেক পংক্তি মুখস্থ করিলে ভাল হয়। এই কবিতায় দুইটি বিষয় লক্ষ্য করিবে—'স্বয়ম্বর'-সভার চিত্রটি; এবং বিশেষ করিয়া স্বয়ম্বরা রাজকন্যার সুশিক্ষিত সুরুচিপূর্ণ ব্যবহার। কবি প্রাচীন ভারতবর্ষের বিভিন্ন দেশের যে সংক্ষিপ্ত কবিত্বপূর্ণ বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাও তোমাদের চিত্ত আকৃষ্ট করিবে।

ছন্দ—চার লাইনের স্তবক; লাইনগুলির মিলের ঠিক নাই—বাঁধা মিল রাখিলে অনুবাদে অসুবিধা হইত। লাইনগুলি—চৌদ্দ অক্ষরের পয়ার।

৭। মানব-বাহনে—অর্থাৎ, সেকালেও পাল্‌কী ছিল; হয়ত তাহার আকার অন্যরূপ ছিল—উপর-দিকটা খোলা ছিল। ৮। প্রতিহারিণী—প্রতিহার অর্থে দ্বারপাল; প্রতিহারী বা প্রতিহারিণী—অন্তঃপুরের দ্বারপালী; অন্যত্র—'দৌবারিকী'। ১১। অগ্রে মগধ-রাজার—মগধ প্রাচীনতম রাজ্য; অতএব মগধরাজের আসন সর্ব্বাগ্রে। ১৫। স্মরণীয়—'রাজা প্রকৃতিরঞ্জনাৎ'। ১৮। প্রকৃত রাজা লাভ করার যে সৌভাগ্য এই মগধরাজ হইতেই ধরণী সেই সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে; অর্থাৎ, আর কাহারও রাজ-পদ তাহাকে এমন মহিমান্বিত করে নাই। ইতিহাস দেখ। ২২। কুসুমপুর—মগধের রাজধানী পাটলীপুত্রের অপর নাম। ২৭। লাইনটি বড় সুন্দর; 'মধুক'—মহুয়া ফুল; স্বয়ম্বর-মালায় মহুয়া ফুল ব্যবহৃত হইত। ৩৭। অবন্তী—প্রাচীন জনপদ—বিখ্যাত উজ্জয়িনী নগরী যাহার রাজধানী। প্রবাদ এই যে, মহাকবি কালিদাস এই উজ্জয়িনীর রাজসভার কবি ছিলেন। ৩৮। সুতনু—কৃশ, সরু। ৩৯। পুরাণের মতে, সূর্য্যকে বিশ্বকর্ম্মা (সর্ব্বকর্ম্মবিশারদ দেবশিল্পী) নিজের শাণ-যন্ত্রে শাণিত করিয়া ঐরূপ উজ্জ্বল করিয়াছেন। ৪৭। সিপ্রা—অবন্তীদেশের নদী, এই নদীর তীরেই উজ্জয়িনী।

৪৯-৫০। ইন্দুমতী অবন্তীরাজকে পছন্দ করিলেন না। কবি এইস্থানে বড় কৌশল করিয়াছেন; কারণ, যদি কিংবদন্তী সত্য হয়, তবে উজ্জয়িনী-রাজের এই অগৌরব কালিদাসের পক্ষে বর্ণনা করা দুষ্কর; তাই তিনি এই উপেক্ষার দ্বারাই অবন্তীরাজ বিক্রমাদিত্যের পূর্ব্বপুরুষের গৌরব আরও বাড়াইয়াছেন। ৫৭। মহেন্দ্র-পর্ব্বত কলিঙ্গ দেশের পর্ব্বত। ৬১-৬৪। যোদ্ধাদের হাতে, ধনুকের ছিলার (টানিয়া ছাড়িবার সময়ে) আঘাত লাগে; ক্রমে সেই স্থানে একটি কালো দাগ (কড়া) পড়ে। কবি তাহা হইতেই একটি চমৎকার কল্পনা করিয়াছেন—শত্রুর লক্ষ্মীকে বাহুবলে কাড়িয়া লইবার সময়ে সেই লক্ষ্মীর চোখের কাজল-ধোয়া (সাঞ্জন) অশ্রুবিন্দু বিজয়ী বীরের বাহুর উপরে পড়িয়া ওই শ্যামল দাগটির সৃষ্টি করিয়াছে। ৬৬। পূরব সাগর—বঙ্গোপসাগর। ৭০। দক্ষিণ দেশের সমুদ্রকূলে তালবন বা তালীবন আছে—কালিদাস এইরূপ উল্লেখ আরও করিয়াছেন; এই গাছ আমাদের তালগাছ নিশ্চয় নয়। ৭১। দূর দ্বীপের মধ্যে যে লবঙ্গ-ফুলের বন আছে তাহার উপর দিয়া বহিয়া। ৭৫-৭৬। রাজার নিজের কোন দোষ নাই—গ্রহের দোষে (অর্থাৎ সময়টা তাঁহার পক্ষে অশুভ ছিল বলিয়া) ভাগ্যদেবী, গুণ ভালবাসিলেও—তাঁহার মত গুণবানকে বরণ করিলেন না। উপমা এবং অর্থ ভাল করিয়া দেখ। ভাষার সংস্কৃতরীতির জন্য, কত অল্প কথায় কতখানি অর্থ প্রকাশ পাইতেছে, তাহাও লক্ষ্য কর। ৯১-৯২। অন্যত্র (৪৯-৫০) কবি ঠিক উল্টা যুক্তি দিয়াছিলেন। ৯৩-৯৬। কালিদাসের একটি উৎকৃষ্ট উপমা—খুব ভাল করিয়া বুঝিবে, এবং মুখস্থ করিবে। মূল সংস্কৃত শ্লোকটি এইরূপ:—"সঞ্চারিণী দীপশিখেব রাত্রৌ—যং যং ব্যতীয়ায় পতিংবরা সা। নরেন্দ্রমার্গাট্ট ইব প্রপেদে—বিবর্ণভাবং স স ভূমিপালঃ" ॥ ৯৯। 'দক্ষিণ ভুজ' কেন? ১০৫। অজে-নিবেশিত-মতি—পদটি কেমন সমাসবদ্ধ দেখ—সমস্তটা একটি বিশেষণ-পদ হওয়ায় অল্পের মধ্যে অনেক অর্থ রহিয়াছে। ১১১-১১২। যজ্ঞ একশোটি সম্পূর্ণ হইলে ইন্দ্রের বড় বিপদ—তাঁহার স্বর্গরাজ্য এই মর্ত্ত্যের রাজার দখলে আসিবে। ১১৪। বিশ্বজিৎ যজ্ঞ—সকল ঐশ্বর্য্য নিঃশেষে বিলাইয়া দিয়া ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ করার যজ্ঞ; প্রাচীন রাজগণ, এইরূপে ধন-সম্পদের প্রতি লোভ ত্যাগ করার আদর্শ প্রজাগণের মনে জাগাইয়া রাখিতেন, নিজেরাও স্মরণ করিতেন। ১২৪। উভয়ে উভয়ের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করুক; একটি প্রসিদ্ধ উপমা। ১২৬। নবীন লাজ—কুমারী-হৃদয়ে প্রথম প্রেমসঞ্চারের লজ্জা।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা ঃ—পুর-উপবনে ; প্রতিহারিণী ; প্রগন্তে ; রাজন্বতী ; দৌবারিকী ; সুতনু ; সাঞ্জন অশ্রু ; বৈতালিক ; প্রলোভ-বাণী ; গ্রহ-দোষ ; গুণ-বিলাসিনী ; সুভগা ; সরত্ন-অর্ণব-কাঞ্চী ; দক্ষিণা-দিশা ; পূগ-তরু ; অঙ্গদ-কেয়ূর ; সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ; সহকার ; বচন-কুশলা ; ধনি।

(৪৫)

এই লাইন দুইটি প্রবাদ-বাক্য হইয়া আছে। (৪০) কবিতাটীর সহিত তুলনীয়।

ছন্দ—পদভাগের ত্রিপদী (৬+৬+৮)

(৪৬)

কবিতাটির ভাব এই ;—শিশু সকলের চেয়ে কোমল ও দুর্ব্বল হইলেও তাহার মত বীর কে? এত সহজে ও অব্যর্থভাবে জগতের সকলকে জয় করিতে পারে কে? হৃদয় জয় করার মত বড় জয় আর কিছু নাই—শিশু সেই হৃদয়জয়কারী মহাবিজয়ী বীর। এই কবিতাটির সহিত (৩৮) কবিতাটি পড়িবে।

ছন্দ—(৫১) কবিতার মত।

৬-৭। এ বীরের আগমনে ভয়ঙ্কর রণসজ্জা নাই ; ইহার রথ ও পথ—অর্থাৎ যেভাবে আমাদের সম্মুখে দেখা দেয়, তাহার—সকলই মনোহর। পুষ্পরথে—'পুষ্পক রথ' নয়—পুষ্পে নির্ম্মিত রথ। কিরণে মিহির—মিহিরের (সূর্য্যের) কিরণে। ১১। ফোঁপায়ে উঠে—ফুলিয়া উঠে, উচ্ছ্বসিয়া উঠে ; চল্‌তি অর্থে, এ উচ্ছ্বাস কান্নার—আনন্দের নয়। ১৭-১৮। এত চঞ্চল, এত অস্থির—সে যেন নিমেষে সমস্ত পৃথিবী ঘুরিয়া আসিতে পারে। ২৩। এই পংক্তি হইতে শেষ পর্য্যন্ত, কবি শিশুর মহিমা খুব বড় করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সৃষ্টির যাহা-কিছু, সকলই শিশুর হিতার্থে ;—যেহেতু শিশুই একমাত্র দেবতা, অতএব, তাহারই ভোগের জন্য ভগবান এত আয়োজন করিয়াছেন। এই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'শিশু'-কাব্যের 'রঙীন খেলেনা দিলে ও রাঙা হাতে' কবিতাটি পড়িতে পারো। খ্রীষ্টের সেই কথাও স্মরণ কর—"Blessed are the children, for theirs is the Kingdom of Heaven."।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা ঃ- মিহির ; দ্রোহ ; পরিধি।

(৪৭)

ইংরাজীতেও কোন বীর বা শ্রেষ্ঠ পুরুষের মৃত্যু উপলক্ষ্যে রচিত খুব ভালো কবিতা আছে। বাংলাতেও আছে, তার মধ্যে এই কবিতা—কবিতাহিসাবে যেমন সরল, তেমনই আবেগপূর্ণ হইয়াছে। এই দুইটি কবিতা হইতে তোমরা কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের কবিত্ব-শক্তির পরিচয় পাইবে। ইঁহাকে আমি পরিবর্ত্তন-যুগের কবিদের মধ্যে ধরিয়াছি এইজন্য যে—বিষয়, ভাষা, এবং ছন্দের দিক দিয়া তিনি প্রকৃত আধুনিক নহেন। অথচ, আধুনিকতার একটা লক্ষণ তাঁহার কবিতায় আছে—নিজের অন্তরের ভাবকে তিনি অতিশয় স্বাধীন ও নির্ভীক ভাবে প্রকাশ করেন, অর্থাৎ কোন প্রচলিত আদর্শের শাসন মানেন না। ইহার প্রমাণ তাঁহার বেশির ভাগ কবিতায় পাইবে; এই কবিতা দুইটিতে অবশ্য সেই লক্ষণ তত ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই, তার কারণ—এখানে কবিতার বিষয় সেরূপ নয়। তথাপি এখানেও একটা প্রাণখোলা অকপট ভাব আছে। গোবিন্দ দাস রীতিমত ইংরাজীশিক্ষিত কবি ছিলেন না—এমন কি, খুব বেশি লেখাপড়াও তাঁহার ছিল বলিয়া বোধ হয় না; তথাপি, ভাষা ও ছন্দের উপরে তাঁহার অধিকার অসামান্য; এবং আধুনিক যুগের অনেক সংবাদ এবং অনেক নূতন জ্ঞানের পরিচয় তাঁহার কবিতায় পাওয়া যায়। তিনি যে একজন শক্তিমান লেখক এবং জন্ম-কবি, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ছন্দ—পদভাগের ছন্দ; ত্রিপদী। প্রথম চরণ—১৪ অক্ষর, পরে ৮+৮ এবং ১৪,—এইরূপ চলিয়াছে।

৩। এই তিন লাইন মুখস্থ করিবে—একটি তারিখকে কবিতার ভাষায় এবং ছন্দে কেমন স্মরণীয় করা হইয়াছে! ১০। দ্বিজরাজ—কোকিল (কি অর্থে?) ১৫। নবীন—কবি নবীনচন্দ্র সেন; হেম—কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; অক্ষয়—বিখ্যাত গল্প-লেখক ও সমালোচক অক্ষয়চন্দ্র সরকার; চন্দ্রনাথ—বিখ্যাত সাহিত্যিক চন্দ্রনাথ বসু ('শকুন্তলা-তত্ত্ব', 'ত্রিধারা' প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক); দীনবন্ধু—বিখ্যাত নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্রের অতিশয় প্রিয় বন্ধু ছিলেন; তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব্বে পরলোক গমন করিয়াছিলেন। 'রায়'—সম্ভবতঃ জগদীশনাথ রায়, বঙ্কিমচন্দ্রের আর এক বন্ধু; ইনি খুব বিদ্বান ছিলেন, এবং বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শনে' প্রবন্ধ লিখিতেন।

ইঁহারা সকলেই বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-সহচর ছিলেন, এবং ইঁহাদিগকে লইয়া একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠী গড়িয়া উঠিয়াছিল। ৯। ছিন্নবাসা—অর্থাৎ ছিন্নবস্ত্র-পরিহিতা। ৩৭। নিমতলে—কলিকাতার একটি শ্মশান-ঘাটের নাম 'নিমতলা'। ৪৩। হৃতরত্ন রত্নাকর—সমুদ্রকে মন্থন করিয়া দেব দানবেরা তাহার রত্নরাজী হরণ করিয়াছিল। ৪৭-৫২। ইন্দিরা (লক্ষ্মী), পারিজাত, সুধাকর, কল্পতরু, কৌস্তুভ—এসকল সমুদ্র-মন্থনে উঠিয়াছিল। কবি কল্পনা করিয়াছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রের দেহভস্মের স্পর্শে সমুদ্র আবার তাহার হৃত রত্নসকল ফিরিয়া পাইবে, এবং সকল তুচ্ছ পার্থিব বস্তু স্বর্গীয় বস্তুতে পরিণত হইবে।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা :—দ্বিজরাজ ; শ্যামা ; ইন্দিরা ; প্রবাল ; কল্পতরু ; পদ্মরাগ ; কৌস্তুভ ; ত্রিদিব।

(৪৮)

কবি শহর হইতে পল্লীগ্রামে গিয়া গৃহস্থের কুটীর ও বাসভূমি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন—যাহা কিছু সুন্দর মনে হইয়াছে তাহার যথাযথ বর্ণনা এই কবিতাটিতে আছে। পড়িলে, তোমাদের মনে হইবে, অতিশয় তুচ্ছ বস্তুও কত সুন্দর হইতে পারে।

ছন্দ—ত্রিপদী (৮+৮+১০) ; সর্ব্বত্র পংক্তি-সজ্জা একরূপ নয়।

১-৮। চিত্রটি যেমন বাস্তব, তেমনই মনোহর। ১। নিকানো—জলে মাটি ও গোবর গুলিয়া তাহার লেপ দেওয়া। ৭। কড়ি-ঝারা—'ঝারা', এখানে, ঝুলাইবার খেলনা—কড়ির তৈয়ারী। ১৭। সাঁই সাঁই—এইরূপ ধ্বনি-অনুকরণের শব্দ বাংলায় অনেক আছে—ব্যবহারে বড়ই ভুল হয় ; যেমন—ঝমঝম, ধুপধাপ, ঝনঝন, সন্‌সন্‌, বন্‌বন্‌, প্রভৃতি। ১৯। হাতে গোঁজা—কাজ করিবার সময়ে পাছে বাধা হয় বলিয়া হাতের উপর দিকে তুলিয়া শক্ত করিয়া রাখা। ২১। ধান নাড়ে—শুকাইবার জন্য। ২৪। মেঠো—'মাঠ' হইতে বিশেষণ ; যেমন, 'খ'ড়ো'।

(৪৯)

ভগবানের উপাসনার সময়ে প্রহরে প্রহরে মস্‌জিদে সমবেত হইবার জন্য, প্রত্যেকবার 'মুয়াজ্জেন' মস্‌জিদের মিনারে উঠিয়া উচ্চৈঃস্বরে সকলকে আহ্বান করিয়া থাকে—তাহারই

নাম 'আজান'। অতি প্রত্যূষকালে (ফজর) সেই আজান-ধ্বনি নীরব নিঝুম ধরার বক্ষে কিরূপ শুনিতে হয়, কবি তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন। সে সময় সে ধ্বনি এত মধুর মনে হয় দুই কারণে,—(১) সৃষ্টির তখন এক অপূর্ব্ব শোভা; (২) সেই শোভার সেই মাধুর্য্যের আবেশে—তরুলতা পশুপক্ষী, নদ নদী—সকলের সহিত যেন একভাবে ভোর হইয়া, জগদীশ্বরের বন্দনা করিতে প্রাণ স্বতঃই উন্মুখ হইয়া উঠে; তাই, 'আজানে'র সেই মধুর গম্ভীর ধ্বনি হৃদয়ের তারে তারে এমন ঝঙ্কার তুলিয়া থাকে। কবিতার বিষয়ও যেমন উচ্চ, ভাষাও তেমনই সহজ সরল প্রাণের ভাষা। আজানের মূল ভাব এই,—হে বিশ্ববাসী, সেই পরম করুণাময় অদ্বিতীয় ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রভুকে বন্দনা করিবার সময় হইয়াছে; নিদ্রা অপেক্ষা উপাসনা ভাল—তোমরা যে যেখানে আছ, এস, বিলম্ব করিও না। ইহা অপেক্ষা মহৎ ভাব খুব অল্পই আছে।

ছন্দ—পদভাগের ছন্দ; স্তবক-ভাগও আছে। পদগুলির মাপ সমান নয়, পদগুলি সাজাইবার কোন নিয়ম নাই। ইংরেজী Ode-কবিতার ছন্দ এইরূপ। বাংলায় এ ছন্দকে 'ভাবোচ্ছ্বাসের ছন্দ' বলা যাইতে পারে।

১৫-১৭। তুলনীয়—(২১) কবিতার শেষ স্তবক। 'গুণ'-গান—গুন্ গুন্-গুঞ্জন; অথবা, বিভুর গুণগান। ২৮-৩০। কবি এখানে, ইংরাজীতে যাহাকে 'Music of the Spheres' বলে তাহাই স্মরণ করিতেছেন। গ্রহচন্দ্রতারকাগণ যে বিশ্বরাগিণীর ছন্দে অনন্ত ব্যোমপথে পরিক্রমণ করে—সেই নিঃশব্দ রাগিণী তাঁহারই মহিমার স্তবগান। ৪৮। 'আল্লা' ভিন্ন অন্য ঈশ্বর নাই; মোহাম্মদ সেই আল্লার 'রসুল'—'প্রেরিত-পুরুষ' (ফারসী—'পয়গম্বর')।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা :—নাচিল ধমনী; নিথর অম্বর; প্রাণ করে আনচান; প্রতি যামে যামে; নীরব নিঝুম।

(৫০)

[পুরাতন ও পরিবর্ত্তন-যুগের সন্ধিস্থলে যেমন রঙ্গলাল, তেমনই, পরিবর্ত্তন ও আধুনিক যুগের সন্ধিস্থলে আমরা কবি কামিনী রায়কে পাই। পরিবর্ত্তন-যুগের কবিতার দুইটি লক্ষণ প্রধান;—(১) ভাষা ও ভাব দুইই বাহুল্যপূর্ণ ও উচ্ছ্বাসময়; (২) জাতি ও সমাজের সঙ্গে কবিগণের সমপ্রাণতা;—সমাজেরই মুখপাত্রস্বরূপ তাঁহারা উচ্চ

কল্পনা ও উন্নত আদর্শের চর্চ্চা করেন। আধুনিক যুগের কাব্য-প্রেরণা অন্যরূপ,—কবিগণ নিজেদের মনের সূক্ষ্ম ভাব ও অভাব, আকুলতা ও অতৃপ্তি-কেই প্রকাশ করেন, জগতের সব-কিছুকে মনের রঙে রঙীন্ করিয়া সুন্দর দেখেন—সে বিষয়ে সর্ব্বসাধারণের সহিত তাঁহাদের ভাবের বা ভাবুকতার যোগ নাই। কামিনী রায়ের কবিতায় এই আত্মভাবের প্রাধান্য আছে, সে যেন তাঁহার নিজেরই প্রাণের কথা; কিন্তু সমাজের আর সকলের সঙ্গে সে প্রাণের মিল নাই দেখিয়া তিনি দুঃখ পান; অর্থাৎ, তাঁহার কবিতার ভাব অতিশয় ব্যক্তিগত হইলেও তিনি সমাজ বা জাতিসাধারণ সম্বন্ধে উদাসীন নহেন। পরবর্ত্তী যুগে এইরূপ ব্যক্তিগত ভাবের কল্পনা হইতেই উৎকৃষ্ট কবিতার উদ্ভব হইয়াছে, এবং সে কল্পনা আরও আত্মভাব-প্রধান। কিন্তু এ কবির কল্পনা ততটা মুক্ত বা স্বাধীন নয়; ইঁহার কবিতায়, প্রেম, প্রকৃতি-পূজা বা সৌন্দর্য্য-প্রীতি অপেক্ষা নরনারীর চারিত্রিক সংযম-সুষমাই গৌরবান্বিত হইয়াছে। কামিনী রায়ের ভাষাও অতিশয় সংযত ও পরিমিত। তাঁহার কবিমানস একদিকে যেমন পরিবর্ত্তন-যুগের অগ্রগামী, তেমনই অপরদিকে, তাঁহার কল্পনার প্রসার অল্প,—ভাষায় ও ছন্দে আধুনিক গীতিকবিতার গভীর আকুতি বা অপূর্ব্ব ধ্বনি-ঝঙ্কার নাই। এই সকল কারণে কামিনী রায়কে পরিবর্ত্তন-যুগ ও আধুনিক-যুগের মধ্যবর্ত্তী বলিয়া নির্দ্দেশ করাই সঙ্গত।]

এই কবিতা ও পরের কবিতাটি কামিনী রায়ের—'আলো ও ছায়া' নামক বিখ্যাত কাব্য হইতে উদ্ধৃত। পড়িলেই বুঝিতে পারিবে, এই কবিতায় কবির প্রাণের যে অনুভূতি ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা বাংলা কবিতায় একটু নূতন। এরূপ কবিতাকে 'নীতি-কবিতা' বলিলে ঠিক হয় না; কারণ, ইহার ভাবটি উপদেশ দেওয়ার ভাব নয়; অন্তরে যাহা সত্য ও মহৎ বলিয়া জানি, সমাজের ভয়ে তাহা কাজে করিতে পারি না—এজন্য যে আত্মগ্লানি, কবি তাহাই অতিশয় সরল বাক্যে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা পরকে উপদেশ দেওয়া নয়,—নিজেরই অন্তরের কাতরতা প্রকাশ করা; তাহাতে একটি উদার সত্যনিষ্ঠ হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। 'পাছে লোকে কিছু বলে'—এই বাক্যটি বড় যথার্থ হইয়াছে।

ছন্দ—পদভাগের ছন্দ—স্তবকের মত ভাগ আছে; প্রত্যেক স্তবকে চারিটি ৮ অক্ষরের পদ; প্রত্যেক স্তবকের শেষ পদটি ইংরাজী 'Refrain'-এর মত ফ্রিরিয়া ফিরিয়া আসিতেছে; বাংলায় ইহাকে 'আবৃত্ত-পদ' বলা যাইতে পারে।

২-৩। এই দুই লাইনে সব কথা বলা হইয়াছে; ভয়, লাজ, সংশয়—সকলই লোকনিন্দার কারণে। ১০। শুভ্র চিন্তা—'শুভ্র' অর্থে, পবিত্র; নির্ম্মল; স্বার্থ-শূন্য। এখানে ভাষায় একটু ইংরেজি গন্ধ আছে। ১৩-১৬। ভাবার্থ ঃ—এতখানি পরদুঃখ-কাতরতাকে লোকে বাড়াবাড়ি মনে করিতে পারে। ১৯। উপেক্ষার ছলে—অন্তরের ভাব গোপন করিয়া বাহিরে উপেক্ষা প্রকাশ করি। ২৫। প্রাণ—সংকার্য্যে উৎসাহ।

(৫১)

আগের কবিতাটিতে যেমন সৎসাহস ও সত্যনিষ্ঠার আবেগ ব্যক্ত হইয়াছে, এই কবিতাটিতেও তেমনই মানুষের প্রতি মানুষের আচরণের একটি মহৎ নীতি প্রচারিত হইয়াছে। পাপকে ঘৃণা করিবে, কিন্তু পাপীকে ভালবাসিবে—ইহাই প্রকৃত নীতি, প্রকৃত ধর্ম্ম; কবি তাহার কারণ দেখাইয়াছেন। এই কবিতাটি একটি উচ্চাঙ্গের 'নীতি-কবিতা'।

ছন্দ—পদভাগের চৌপদী; প্রথম লাইনে মিল-দেওয়া দুইটি ৮ অক্ষরের পদ; দ্বিতীয় লাইনেও দুইটি পদ আছে—৮+৬, মিল নাই, যথা—

উপহাস করি' কেহ | যায় পায়ে ঠেলে;

১৩-১৬। এই চারিটি লাইনের উপমা ও ভাব বড় সুন্দর। ১৭। জ্বালিয়া--'জ্বালাইয়া' হইবে।

আধুনিক যুগ

এইখানে আধুনিক যুগের কবিতা আরম্ভ হইল। পুরাতন যুগের কবিগণের মধ্যে যেমন চণ্ডীদাস, কাশীদাস, কৃত্তিবাস, মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র প্রধান; পরিবর্ত্তন-যুগের কবিগণের মধ্যেও তেমনি মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রই প্রধান। কিন্তু আধুনিক যুগের একজন কবিই এত বড় যে, তাঁহার মত আর কাহাকেও প্রধান বলা যায় না। এই কবি রবীন্দ্রনাথ। কেবল তিনজন কবি—দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয় বড়াল ও দ্বিজেন্দ্রলাল—রবীন্দ্রনাথের অনুবর্ত্তী নহেন; বিশেষ করিয়া, প্রথম দুইজন রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমবয়সী, এবং ইঁহাদের কাব্যভঙ্গিও স্বতন্ত্র। দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার, রবীন্দ্রনাথের মতই,

কবি বিহারীলাল-প্রবর্ত্তিত নূতন গীতিকবিতার ধারাটিকে নিজ নিজ ভঙ্গিতে প্রসারিত করিয়া বাংলা কাব্যে এই আধুনিক যুগের প্রতিষ্ঠা করেন। তথাপি রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার নব নব উন্মেষ, এবং তাঁহার কবিতার বিচিত্র ও অফুরন্ত ধারা, গত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া বাংলা ভাষাকে এমনই সমৃদ্ধ করিয়াছে—এই যুগের কবিতার ভাষায়, ছন্দে ও ভাবে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব এত বেশি, যে এই যুগকে রবীন্দ্রনাথের যুগও বলা যাইতে পারে। পরিবর্ত্তন-যুগের সঙ্গে এই যুগের একটা পার্থক্য এই যে, এ যুগের সকল কবিতাই গীতিকবিতা, এবং তাহার ভাবও অতিশয় নূতন। সেই ভাবেরও কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ আছে ;—প্রথমতঃ, কবিদের ভাবনা, কামনা ও কল্পনা বাহিরের বস্তু অপেক্ষা অন্তরের অনুভূতিকে বড় করিয়া তুলিয়াছে ; (কবি কামিনী রায় সম্বন্ধে মন্তব্য দেখ) দ্বিতীয়তঃ, প্রকৃতির সৌন্দর্য্যকে কবিরা নূতন চক্ষে দেখিতেছেন—তাহার রঙের রূপের যেমন অন্ত নাই, তেমনই তাহার যেন একটা প্রাণ ও মন আছে—সেও যেন কথা কয়, মানুষের জীবনের সঙ্গে তার যেন কতদিক দিয়া কত রকমের যোগ রহিয়াছে। তৃতীয়তঃ ; এ যুগের কবিতায়—যত ক্ষুদ্র হোক, মানুষহিসাবেই মানুষের মর্য্যাদা—তাহার মনুষ্যত্বের মহিমা—কবিরা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন ; মানুষ সকল মিথ্যা, ভয় ও দুর্ব্বলতা হইতে মুক্ত হউক, এই বাণী প্রচার করিয়াছেন। মানুষের সহজ সরল জীবনযাত্রা, এবং প্রকৃতিদত্ত স্বাস্থ্যের সৌন্দর্য্যকে কবিগণ মুগ্ধদৃষ্টিতে দেখিয়াছেন ; এজন্য পল্লীপ্রকৃতি ও গ্রাম্য-কৃষকের চরিত্র বর্ণনা করিতে তাঁহারা বড় আনন্দ পান।

উপরে আধুনিক কবিতার লক্ষণ সম্বন্ধে যে কয়টি কথা লিখিলাম তাহা ভাল করিয়া পড়িলে, এই ভাগের অধিকাংশ কবিতার ভাব সহজেই বুঝিতে পারিবে। এখন হইতে কবিতার ভাষা ও ছন্দের দিকে আরও মন দিবে, এবং বেশি করিয়া মুখস্থ করিবে।

(৫২)

কবিতাটি দেবেন্দ্রনাথ সেনের একটি উৎকৃষ্ট সনেট। অশোক-গাছ লাল ফুলে ভরিয়া গিয়াছে—সে যেন গাছের হাসি। কিন্তু গাছ যে কেন হাসিতেছে তাহা সে নিজে জানে না। কবি বলিতেছেন, এ যেন শিশুর হাসি,—সে হাসিরও কি কোন কারণ আছে ? এই সনেটের প্রথম আট লাইনে কবি উপমার পর উপমা দিয়া হাসির কারণ জিজ্ঞাসা

করিতেছেন; শেষ ছয় লাইনে, একটি আরও চমৎকার উপমা দিয়া, নিজেই সেই জিজ্ঞাসার একটি গভীর কবিত্বপূর্ণ উত্তর দিয়াছেন। সনেটের এই দুইভাগে—ভাবেরও দুই ভাগ, এবং একটির দ্বারা অপরটিকে সম্পূর্ণ করার এই যে কৌশল—ইহাও উৎকৃষ্ট সনেটের লক্ষণ।

ছন্দ—সনেট; পূর্ব্বে দেখ।

৫। কখনও সধবা-অবস্থা না ঘুচে—এই কামনা করিয়া সধবা স্ত্রীগণ যে ব্রত করিয়া থাকেন; সেই ব্রত-শেষে অপর সধবাগণকে শাঁখা সিঁদুর ও শাড়ী দিয়া অর্চ্চনা করিতে হয়। কবি অশোক ফুলের রঙ দেখিয়া এমনই মুগ্ধ হইয়াছেন যে, সে রঙের তুলনা খুঁজিয়া যেন শেষ করিতে পারিতেছেন না। ৮। ব্রীড়াহাসি—লজ্জার হাসি—মুখ ঈষৎ লাল হইয়া উঠে। চয়ন—কেবল এই শব্দটির দ্বারা কবি হাসির রাশিকে ফুলের রাশি করিয়া তুলিয়াছেন। লাইনটি অতি সুন্দর। ১০। জাতিস্মর—যে পূর্ব্ব জন্মের কথা স্মরণ করিতে পারে। ১১। আলো ও অন্ধকারের মেশামেশিতে যেমন দৃষ্টিবিভ্রম হয়, তেমনই, (উপমার গূঢ় অর্থে) জীবনে ক্রমাগত সুখ-দুঃখ হাসিকান্নার দোল খাইয়া মন স্থিরভাবে কিছুই ধারণা করিতে পারে না—নিজের যথার্থ পরিচয় বিস্মৃত হয়। ১৩। দেয়ালা—অতিশয় অল্পবয়সের শিশুরা ঘুমন্ত অবস্থায় যখন হাসে তখন তাহাকে 'দ্যায়্লা'-করা বলে।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা:—ব্রীড়াহাসি; জাতিস্মর; শৈশবের আবছায়।

(৫৩)

সমগ্র কবিতাটিতে Personification (সংস্কৃত, 'সমাসোক্তি') নামক কল্পনা রহিয়াছে—প্রাকৃতিক ব্যাপারের উপরে মানুষের ভাব আরোপ করা হইয়াছে। কল্পনাটি আরও চমৎকার হইয়াছে এইজন্য যে, পুরাণের মদনভস্মের কাহিনী এখানে একটি প্রাকৃতিক ঘটনারূপে বর্ণিত হইয়াছে। মদন (প্রেমের দেবতা) তাহার পত্নী রতিকে সঙ্গে লইয়া মহাদেবের ধ্যান ভাঙ্গিতে গিয়াছিল। কিন্তু মহাযোগী রুদ্রদেবতা মহাদেব তাহার বাণ পৌঁছিবার পূর্ব্বেই, তাহার স্পর্দ্ধায় এত ক্রুদ্ধ হইলেন, যে, তাঁহার ললাটের চক্ষু হইতে সহসা অগ্নিশিখা নির্গত হইয়া মদনকে ভস্ম করিয়া ফেলিল। এখানে বসন্তের মাস

'চৈত্র'ই—মদন ; বসন্তকালের জ্যোৎস্নারাত্রি—রতি ; এবং, অগ্নিময় বৈশাখ—তপোমগ্ন রুদ্র-দেবতা।

প্রাকৃতিক দৃশ্যের উপরে এইরূপ মানুষী মূর্ত্তির আরোপ কবিতার আদিম যুগ হইতেই আরম্ভ হইয়াছে—প্রাকৃতিক দৃশ্য ও প্রাকৃতিক ঘটনার মূলে মানুষের মতই নানা ব্যক্তি অদৃশ্যরূপে কার্য্য করিতেছে, এইরূপ কল্পনা হইতেই যাবতীয় প্রাচীন কাহিনীর উদ্ভব হইয়াছে। এইরূপ কল্পনাকে ইংরাজীতে "Mythopoetic Imagination" বলে। প্রাচীন আর্য্য ও প্রাচীন গ্রীক-জাতির মধ্যে এইরূপ কল্পনা বেশ একটু উচ্চস্তরে উঠিয়াছিল—তাই গ্রীক ও সংস্কৃত ভাষায় অসংখ্য পুরাণ-কাহিনীর সৃষ্টি হইয়াছিল ; পরে সেই কাহিনীগুলি বড় বড় কবিদের হাতে পড়িয়া উৎকৃষ্ট কাব্য হইয়া উঠিয়াছে। এইরূপ কল্পনা যে কবিত্বের একটা বড় লক্ষণ, তাহার প্রমাণ—এখনও কবিরা সেই কল্পনার বলে উৎকৃষ্ট কবিতা রচনা করিতেছেন।

ছন্দ—ছয়টি পয়ার-চরণের স্তবক।

১০। নিয়তির ফেরে—দুরদৃষ্টের বশে; 'ফের'—বিপাক [তুলনীয়—'ফেরফার' (১৬)] ১৩-১৪। কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' কাব্যে মদন-ভস্মের অতি সুন্দর বর্ণনা আছে ; তাহাতেও আকাশ হইতে দেবতারা মহাদেবকে বলিতেছেন—"ক্রোধং প্রভো সংহর সংহর"। ২০। অর্থাৎ, বিধবা হইয়া বিলাস-চিহ্ন ত্যাগ করিল, তাহার সে সৌন্দর্য্য আর রহিল না। ২৩। করবীর—করবী-ফুলের (বাংলা 'করবী', সংস্কৃত 'করবীর')। ২৮। কারণ, খাল-বিল সব শুকাইয়া গিয়াছে। ৩০। আতপে সন্তাষে—আতপ (উত্তাপ) সম্বন্ধে কাতরোক্তি করে। (৫) স্তবকটিতে বৈশাখের বর্ণনা কেমন বাস্তব হইয়াছে দেখ।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা :—কপালে কঙ্কণ হানি ; বিভূতি-ভস্ম ; রোষান্ধ ; দিগঙ্গনা ; নিঃসরিল ; বাছনি ; উপল।

(৫৪)

দারুণ দুর্ভাবনার পরে যেমন সুসংবাদ, ভীষণ দুর্ভিক্ষের পরে যেমন প্রচুর ফসলের শোভা, তেমনই দুঃখময় দারিদ্র্যের পর সহসা সম্পদের আবির্ভাব—কবি কল্পনায় সেই সুখ অনুভব করিতেছেন ; হয়ত তাহা বাস্তব সত্য হইয়া উঠিবে না, কিন্তু কল্পনায় তাহা অনুভব

করিতে ক্ষতি কি? ইহাতে, আমরা অন্ততঃ লক্ষ্মীর সেই সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য আরও বেশি উপভোগ করি।

ছন্দ—পদভাগের চরণ; সর্ব্বত্র সমান নয়—অধিকাংশ ১০ অক্ষর; ১৪ ও ১৮ অক্ষরও আছে।

৭। ছাবাল—ছাওয়াল, পুত্র। পঙ্গপাল দুর্ভিক্ষের একটি কারণ; কিন্তু এখানে দুর্ভিক্ষকেই পঙ্গপালের কারণ বলা হইয়াছে। ১৭। কনক-কুণ্ডল—অতি সুন্দর উপমা; ধানের পীতবর্ণ শীষগুলি কুণ্ডলের মত অর্দ্ধ-গোলাকৃতি হইয়া দুলিতে থাকে। ২৭। নীবার—অতিশয় সহজে উৎপন্ন হয়—এমন একপ্রকার ধান্য; এখানে—সাধারণ ধান। ৩৮। ফাঁক ফাঁক লাগে—কেমন একটা অভাব বোধ হয়। (চলতি ভাষা বা idiom)—'ফাঁক' শব্দটি এইরূপ দুইবার ব্যবহার করায় অর্থ একটু অন্যরূপ হয়; যেমন, 'ভয় ভয় করছে', 'তেতো তেতো লাগছে', 'দূর দূর মনে হয়'—অর্থাৎ, সত্যই ঐরূপ হয় ত নয়, তথাপি ঐরূপ মনে হইতেছে। ৪৩। নদী যেমন বরাবর দুই তটে বদ্ধ রহিয়া শেষে মোহানার কাছে (সমুদ্রে মিশিবার স্থান) খুব প্রশস্ত হইয়া থাকে, প্রাণও সেইরূপ—আশঙ্কায় কিছুদিন রুদ্ধ থাকিয়া শেষে আনন্দে সকল বাঁধ ভাঙ্গিয়া ফেলে। একটি উপমার সাহায্যে কত অল্প কথায় কতখানি ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, দেখ। ৪৮-৫৩। লাইনগুলিতে যেন একটি অতি সুন্দর ছবি আঁকা হইয়াছে—বালিকা নববধূর অতিশয় সরল, সুন্দর ও কৌতূহলপূর্ণ হাসিটিকে কবি কমলার হাসির সহিত তুলনা করিয়াছেন। ঘরের বৌকে বাঙালী 'ঘরের লক্ষ্মী' মনে করে—তাহাও স্মরণ কর। 'বরণডালা'—'ডালা' কেন?

ভাষা ও শব্দশিক্ষা:—কনক-কুণ্ডল; নীবার; মোহানা; বরণডালা।

(৫৫)

কবি, মানুষের হৃদয়কে, অর্থাৎ, যাহা হইতে আবেগ ও উৎসাহ উৎসারিত হয়—তাহাকে শঙ্খের সহিত তুলনা করিয়াছেন। হৃদয়ের এই আবেগ কতরূপে সার্থক হইতে পারে—এই কবিতায় শঙ্খের উপমা দিয়া, কবি তাহাই আমাদের মনে গভীরতর ভাবে মুদ্রিত করিতেছেন। অক্ষয়কুমারের ভাষা লক্ষ্য কর; এ ভাষা—বড় বেশি শব্দসংক্ষেপের

ভাষা ; প্রত্যেক শব্দটির অর্থ পৃথক—এক অর্থের শব্দ, একটির বেশি তিনি ব্যবহার করেন না।

ছন্দ—চার লাইনের স্তবক ; পদভাগের ছন্দ ; প্রতি চরণে ১০ অক্ষর ; দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে মিল।

৬। সকলে নিজ নিজ স্বার্থ-সুখ, ধনসম্পদ প্রভৃতি আকাঙ্ক্ষা করে, কেহ সর্ব্বভূতের হিতে আত্মোৎসর্গ করে না। ৭-৮। প্রবাদ আছে (ইংরাজী কবিতায়), শঙ্খ বহুকাল সমুদ্রতলে বাস করিয়া—সমুদ্রের তরঙ্গে ক্রমাগত গড়াইয়া—আপনার বক্ষকুহরে তরঙ্গের ধ্বনি ধরিয়া রাখিতে পারে ; কাণে চাপিয়া ধরিলে তাহার মধ্যে সেই অনন্তের ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। ৯। হে রমণী—গৃহের মঙ্গলহেতু হৃদয়-শঙ্খ বাজাও। ১৩। হে রথী—সমাজ ও রাজ্য রক্ষার জন্য বীরকর্ম্মে উৎসাহিত হও। প্রাচীনকালে যুদ্ধক্ষেত্রে বীরগণ শঙ্খধ্বনি করিতেন। ১৭। জগতের সর্ব্বজীবের আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য, ভগবৎ-আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিবার সময়ে, পূজার শঙ্খ বাজাও। ঋষির 'আহুতি', যোগীর 'প্রণতি', এবং পূজকের 'স্তুতি'—প্রত্যেকটির পৃথক অর্থ আছে।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা :—বলদৃপ্ত ; পরস্বলোলুপ ; বজ্রনির্ঘোষ।

(৫৬)

শিশুপুত্রের শোকে জননীর উক্তি। শিশুর দেহের যতকিছু সৌন্দর্য্য সব যেন এক এক করিয়া স্বর্গের নানা বস্তুতে গিয়া মিশিয়াছে ; ঠিক সেই সেই মাধুরী মর্ত্ত্যের শিশুদেহে ছিল বলিয়া স্বর্গে যেন একটা অভাব ঘটিয়াছিল। এই কবিতার সহিত তুলনীয়—'শিশুর হাসি' (৩৭) ও 'বিদায়' (৫৬) ;—ঠিক এই ভাবের না হইলেও, এই সঙ্গে পড়িবে। 'বিদায়' কবিতাটিতে শিশু মাকে ছাড়িয়া যায় নাই, তাহার সৌন্দর্য্য প্রকৃতির নানা নিত্য ঘটনা ও দৃশ্যের মধ্য দিয়া মাকে নানাভাবে স্পর্শ করিতেছে। এখানে, শিশু আর পৃথিবীতে নাই—সে এত সুন্দর, যে, স্বর্গ তাহাকে হরণ করিয়া নিজের অভাব পূরণ করিয়াছে, মর্ত্ত্য-জননীর বুক শূন্য করিয়া দিয়াছে। কিন্তু স্বর্গে কেবল সৌন্দর্য্য আছে—স্নেহ আছে কি ? সেখানে শিশু মায়ের মত এমন স্নেহ কাহার কাছে পাইবে ? তাই ভাবিয়া জননী শোকার্ত্ত হইয়াছেন।

ছন্দ—স্তবক ; পদভাগের স্তবক, লাইনের সংখ্যা ঠিক নাই। সাধারণতঃ দুই মাপের চরণ আছে—১৪ অক্ষর ও ৮ অক্ষর। মিল—দুই-দুই চরণে।

৫-৬। দেবতারা যেন হিংসা করিয়া তাহার মুখের সেই শোভা—সেই আলো, চাঁদের শোভা বাড়াইবার জন্য হরণ করিয়াছে ; কারণ, চাঁদের যেটুকু আলো আছে, তাহাতেই ত' জগৎ আলোকিত হয়—বেশির কি প্রয়োজন ছিল ? ভাবার্থ—তাহার সেই মুখ চাঁদের চেয়েও সুন্দর ছিল। [শিশু-মুখের সঙ্গে চাঁদের এই তুলনা পূর্ব্বের একটি কবিতায় কেমন সুন্দর হইয়াছে, স্মরণ কর [(১৭) কবিতা] । ১০। ছিঁড়েছিল—ছিঁড়িয়া গিয়াছিল। 'কল্প-লতিকা'—কল্পবৃক্ষ (অভিধান দেখ) । ১৪। টানা-চোখ—'টানা', অর্থাৎ—'দীর্ঘ', 'আয়ত'। ১৮। শিশুর হেলিয়া-দুলিয়া চলার যে সুন্দর ভঙ্গি—এখন তাহা স্বর্গনদীর ঢেউগুলিতে যুক্ত হইয়াছে। [এইরূপ উপমার দ্বারা সৌন্দর্য্যবর্ণনার রীতিটি প্রাচীন কাব্যের রীতি ; এমন কি, এ কবিতার এই উপমাগুলি কালিদাসের 'শ্যামাস্বঙ্গং চকিতহরিণীপ্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতম্' প্রভৃতি স্মরণ করাইয়া দেয়। ইহাতে ঠিক রূপের, বা আকৃতির সাদৃশ্য নাই—সৌন্দর্য্যের যে গুণটি আকৃতিতে প্রকাশ পায়, কেবল তাহাই বুঝাইবার জন্য, সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তুর দ্বারা, সেই গুণটি মাত্র তুলনায় উল্লেখ করা হয়। [(৬) কবিতা দেখ)] ২৮। বড় যথার্থ ও সুন্দর। পৃথিবীতে মায়ের প্রাণ সন্তানের জন্য যতখানি ব্যাকুল হয়, স্বর্গে কি কাহারও সেরূপ হয় ? এখানে কোল হইতে মাটিতে নামাইতে মায়ের ভয় হয়—পাছে কিছু ঘটে, পাছে হারাই ; স্বর্গে সে ভয় নাই, অতএব তেমন স্নেহও নাই। ৩১। কথাটি বড়ই মর্ম্মস্পর্শী।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা :—অখিল ; কল্প-লতিকা ; টানা-চোখ ; মন্দাকিনী ; জীবন-শ্মশান-কূলে।

(৫৭)

সমগ্র কবিতাটিতে 'সন্ধ্যা'র বধূমূর্ত্তি কল্পনা করা হইয়াছে, এবং সেই মূর্ত্তি সর্ব্বাংশে বধূর অনুরূপ করিয়া চিত্রিত হইয়াছে—পশ্চিম আকাশের দিনান্ত-ছবিটিকে কেমন একটি নারীর রূপ দেওয়া হইয়াছে, দেখ।

ছন্দ —স্তবক। প্রথমটি ছাড়া আর সকলগুলি ছয় লাইনের স্তবক; পদভাগের ছন্দ—১৪ ও ৮ অক্ষরের দুই প্রকার চরণ; মিল—ক ক খ গ গ খ। তুলনীয়—(৩৩), (৩৪) ও (৩৮)।

৩। তরল—(এখানে) স্বচ্ছ। ১৩। ক্ষীরোদ-সমুদ্র—(পৌরাণিক) ক্ষীর-সমুদ্র, যাহাতে নারায়ণ বাস করেন। এখানে গভীর, প্রশান্ত, ও স্নিগ্ধ—এই তিন গুণ বুঝাইতেছে। ১৪। বিজয়-বিশ্রাম— দিনের সকল কর্ম্ম সমাপন করিয়া গৌরবময় বিশ্রাম। ১৬। অলক-মেঘ—সন্ধ্যার আকাশে যে ছোট মেঘগুলি দেখা যায়; অলক—চূর্ণ-কুন্তল; কপালের কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। এ সন্ধ্যা শরৎকালের সন্ধ্যা। ১৭। নৃত্য অভিরাম—তারাটি দপ্ দপ্ করিতেছে। ১৮। আথিবিথি—আস্তে ব্যস্তে। ২৯। অলস—গন্ধভারে মন্থর।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা :—নব-নীলোৎপল; অলক-মেঘ; অভিরাম; আথিবিথি; পুলিন্; পুরনারী।

(৫৮)

এই কবিতাটি মুখস্থ করিবে। কবি এখানে আমাদের দুর্গতি ও অধঃপতনের কারণ বুঝিয়া ভগবানের নিকটে ঠিক সেইগুলি দূর করিবার প্রার্থনা জানাইতেছেন।

ছন্দ—সনেট, (৩১) দেখ। রবীন্দ্রনাথ সনেটের গঠনে মিলের রীতি মানেন না।

৪। রবীন্দ্রনাথ মানুষকে কেবল নিজের সমাজ ও নিজের দেশটির মধ্যেই বদ্ধ দেখিতে চান না; জগতের সকল মানুষের সঙ্গে তাহার সর্ব্ববিধ সম্বন্ধ স্থাপিত হোক, ইহাই তাঁহার কামনা। ৯-১১। উপমাটি বুঝিয়া লও। পৌরুষ—এখানে পৌরুষ অর্থে—moral courage, যাহা সত্য ও মঙ্গলকর বলিয়া বুঝি তাহা আচরণ করিবার সাহস; ভাবার্থ :—যেথানে আচারের অসংখ্য বিধি-নিষেধ পুরুষের স্বাধীন হিতাহিতবোধ দমন করিয়া তাহার সাহস ও কর্ম্মশক্তিকে তুচ্ছকার্য্য-সাধনে ক্ষয় হইতে দেয় না। ১৩-১৪। একটি খুব বড় দুঃখে বা বিপদে না পড়িলে আমাদের জ্ঞান হইবে না; অতএব সেই কল্যাণকর শাস্তি—পিতা যেমন পুত্রকে দেন—তিনিও আমাদিগকে দিন।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা :—দিবস-শর্ব্বরী; নির্ব্বারিত স্রোত; দিশে দিশে।

(৫৯)

আমাদের দেশের একটি অতি পরিচিত প্রাকৃতিক ঘটনা; পল্লী-জীবন ও পল্লী-প্রকৃতির সৌন্দর্য্য কবিতাটিতে কেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা লক্ষ্য কর। কবিতাটি মুখস্থ করিবে।

ছন্দ—পর্ব্বভাগের ছন্দ, প্রতি পর্ব্ব ছয় অক্ষরের, যথা—

নীল নবঘনে | আষাঢ় গগনে | তিল ঠাঁই আর | নাহি রে

(শেষটি খণ্ডপর্ব্ব)

১২। ধবলী—ধবলী নামক গাই; ১৮। খোয়ালে—হারাইল; নষ্ট করিল; (ক্ষোয়াইল—ক্ষয় করিল)। ৩৫। নিচোল—মেয়েদের বসন।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা :—ঝর ঝর; দর দর; খেয়া-পারাপার; নিচোল; বেণুবন।

(৬০)

ইহা একটি 'গীতি-কথা'র মত কবিতা। স্থান ও কালের সঙ্গে একটি ঘটনা, এবং তাহা হইতে দুইটি মানুষের দুইরূপ চরিত্রের পরিচয়—ইহাই আমাদের মনে বিস্ময় এবং গভীর শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। গুরু যেমন অতিশয় নির্লোভ, তেমনি স্থির, শান্ত ও নির্ব্বিকার পুরুষ; ইহাও খাঁটি ভারতীয় আদর্শ।

ছন্দ—চরণগুলি পয়ারের মত; কিন্তু অক্ষর গণিবার সময়ে, শব্দের মধ্যে বা শেষে যে যুক্তাক্ষর আছে, তাহা দুই অক্ষর ধরিতে হইবে, যেমন—

৩ + ৩ + ২ ৩ + ৩

নিম্নে যমুনা বহে | স্বচ্ছ শীতল = ১৪

৮। পাহাড়গুলি অবশ্য অচল, কিন্তু এমনভাবে দিগন্তের দিকে ঢেউ খেলিয়া গিয়াছে যে, মনে হয়, যেন চলিতে চলিতে বাঁধা পড়িয়া গিয়াছে। এ দৃশ্য বাংলার নয়, পশ্চিমাঞ্চলের। ১৮। ভগবৎ-লীলা—ভগবানের অপূর্ব্ব ক্রিয়া-কলাপের বিবরণ; ভাগবত গ্রন্থ। ২৭-২৮। বর্ণনাটি দেখ। ৩৫-৩৬। আর একটি চমৎকার বর্ণনা।

৩৮। গুরু ধর্ম্মগ্রন্থ;পাঠে তন্ময় হইয়া আছেন—তাঁহার অন্তরে তখন অন্য কোন চিন্তা স্থান পাইবে না। ৪২। উতলা—(এখানে) সংক্ষুব্ধ, আলোড়িত। ৪৭-৪৮। গুরু শিষ্য রঘুনাথকে এইভাবে যেন ভর্ৎসনা করিলেন, কারণ, সে এইরূপ ধন-রত্নের উপহার দিতে গিয়া গুরুকে একরূপ অপমানই করিয়াছে। কিন্তু শিষ্যের প্রাণের আকুলতা গুরু যেরূপ কৌশল করিয়া উপেক্ষা করিলেন—তাহা যেমন আমাদিগকে চমকিত করে, তেমনই, তাঁহার এইরূপ কঠিন নির্ব্বিকার ভাবও আমাদিগকে স্তম্ভিত করিয়া দেয়।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা ঃ—রৌদ্র-বরণ ফুল ; নিবেশিল ; প্রাণ-মন-কায় ; যমুনা উতলা করি'।

(৬১)

কবিতাটি হাস্যরসের কবিতা হইলেও, ইহার মধ্যে একটি বড় নীতি-উপদেশ আছে। বেশি বিদ্যা ও বেশি বুদ্ধির গর্ব্ব যাহারা করে, তাহারাই অতিশয় সহজ বিষয়টিকে কঠিন করিয়া তোলে, এবং আরও বেশি অনর্থের সৃষ্টি করে। ইংরাজীতে যাহাকে 'common sense' এবং বাংলায় যাহাকে 'কাণ্ডজ্ঞান' বলে,—যাহা একজন অশিক্ষিত ব্যক্তিরও থাকিতে পারে—বড় বড় বিদ্বান বা অতি-বুদ্ধিমানের তাহা অনেক সময় থাকে না।

ছন্দ—পর্ব্বভাগের ১০ চরণে একটি স্তবক ; মিল—কখকখ, গঘগঘ, চচ। চরণ দুই প্রকার, তাহাদের পর্ব্বভাগ এইরূপ—(১) কহিলা হবু | শুন গো গোবু | রায় (৫+৫+২) ; এবং—(২) কালিকে আমি | ভেবেছি সারা | রাত্র (৫+৫+৩) ; শেষের দুইটি—দুই মাপের খণ্ডপর্ব্ব।

৫। বাঁটি'—'বাঁটা', ভাগ করা ; (এখানে) 'বাঁটিয়া', প্রাপ্য অংশ হিসাব করিয়া—অর্থাৎ, পুরাপুরি। 'বাঁটা' ও 'বাটা' এক নয় ; মসলা 'বাঁটা' হয় না—'বাটা'। ৮। অনাসৃষ্টি—নিয়মবিরুদ্ধ ব্যাপার। ১৩। মুখ চুন—বিবর্ণ মুখ—চুনের মত সাদা, ফ্যাকাসে। ৩৩। জ্ঞানী গুণী—বিশেষজ্ঞ (Expert)। ৩৪। যন্ত্রী—মিস্ত্রী (Mechanic, Engineer)। ৪৮। উহ্য—অদৃশ্য। ৫৭। মজিল—(খাঁটি বাংলা idiom.) নষ্ট হইল, (এখানে) বদ্ধ হইল। ৫৮। উজাড়—শূন্য।

৬১। পরামর্শে—পরামর্শের জন্য। ৬৩। হেরিল চোখে শর্সে—শর্সে (এখানে) শসে-ফুল:; একটি চল্‌তি বাক্য; অর্থ—ভয়ে ভাবনায় মস্তিষ্ক এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িল যে চোখ বুজিলে শর্সেফুলের মত বিন্দু বিন্দু আলো দেখিতে লাগিল। ৭২। সন্ধ—সন্দেহ। ৮৪। উচিত মত—উপযুক্ত পরিমাণ। ৮৮। মানস—বাসনা। ৯৯। চলিল—এখানে সাধারণ অর্থ নয়, চল্‌তি-রীতির অর্থ—জুতা-পরার 'চলন হইল'।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা :—মুখ চুন; কান্নাকাটি; পাদপদ্ম; জ্ঞানী গুণী; উজাড়; পদোপান্তে।

(৬২)

কবিতার ভাবটি এই :—খোকার মৃত্যুর পরেও খোকার মায়ের মন তাহার স্মৃতিতে ভরিয়া থাকিবে—ধরণী ও আকাশের সকল মাধুরীতে, প্রকৃতির যত-কিছু সুন্দর কোমল স্পর্শে—এমন কি নিদ্রাকালে স্বপ্নের মধ্যেও—তিনি তাঁহার খোকাকে কতরূপে কত রকমের খেলা করিতে দেখিবেন। মায়ের প্রাণের গভীর স্নেহ খোকাকে কখনও হারাইয়া যাইতে দিবে না। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এই কবিতায় মায়ের প্রাণের বাস্তব অনুভূতির চারিধারে একটি অতি সূক্ষ্ম কাব্যকল্পনার সান্ত্বনা ভাব-মধুর হইয়া উঠিয়াছে। কবিতাটির ভাষা আগাগোড়া কেমন মিষ্ট—এবং কি জন্য মিষ্ট, তাহা দেখ।

ছন্দ—ছড়ার ছন্দের ত্রিপদী—প্রথম দুইটি পদে দুইটি করিয়া পর্ব্ব; তৃতীয় পদটিতে দুইটি পর্ব্ব ও একটি খণ্ড পর্ব্ব আছে, যথা—

ঝর্‌ঝরানি | গান গাব ঐ | বনে (৪ + ৪ + ২)।

৮। সাথে—সঙ্গে; ইহা কবিতায় চলে—গদ্যে চলে না; গদ্যরচনায় কখনও 'সাথে' লিখিবে না, সর্ব্বদা 'সঙ্গে' কিম্বা 'সহিত' লিখিবে। ১৮। মধ্যিখানে—(বানান দেখ)।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা :—হাতে ক'রে; চমক মেরে।

(৬৩)

কবিতাটির ভাষা ও ছন্দ যেমন অতিশয় সহজ—প্রায় গদ্যের মত, তেমনই, ভাবও অতিশয় স্বাভাবিক ও মর্ম্মস্পর্শী। এ কবিতাটির কোনখানে অর্থ করিবার প্রয়োজন

হইবে না। দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতার ভাষা কেমন বলিষ্ঠ—অথচ মৌখিক গদ্যভাষার মত, তাহা লক্ষ্য কর।

ছন্দ—ছড়ার ছন্দ ('বাংলা কবিতার ছন্দ' দেখ)।

৪। নেতিয়ে গেছিস—(কথ্য বাংলা) সর্ব্বশরীর এলাইয়া শিথিল হইয়া গেছে। ৯। ভাঙ্গাঘরে-চাঁদের-আলো—খুব চলতি উপমা—সর্ব্বদা ব্যবহার হয়। ১১। পেয়ার—(হিন্দী) আদর। ১৬। সারা—'সারা' অর্থ 'সমস্ত'; এখানে, 'আকুল'; 'হয়রান' অর্থ ও হয়, যেমন—'খেটে সারা'। ২৩। আবদার—শিশুদের অবুঝ প্রার্থনা; এ রকম শব্দের কোন প্রতিশব্দ হয় না—ওই অর্থে ওই শব্দই ব্যবহার করিবে। শিশুদের দিনের মধ্যে কতবার কত খেয়াল হয়—সে যেন স্নেহের ক্ষুধা! সেই খেয়ালের বস্তু না পাইলে তাহারা বড় অসুখী হয়; যাহারা ভালোবাসে তাহাদের নিকটেই এইরূপ আবদার করিয়া থাকে। ২৭-৩৩। লাইন কয়টি বড় মর্ম্মস্পর্শী। ৪২-৪৪। কথাগুলি বড় সত্য, বড় মর্ম্মান্তিক। ৫৫-৫৭ এই লাইন কয়টির অর্থ ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখ। বাড়া—আরও বেশি (কু-অর্থে—যেমন, ইংরাজী 'worse')।

(৬৪)

কবিতাটির বিষয়—'মৃত্যু'; মানুষের প্রাণকে নানাভাবে অভিভূত করিবার এমন ঘটনা আর নাই। প্রিয়জনের মৃত্যু যেমন কবিতার একটি অতি সাধারণ অথচ অতি প্রবল আবেগের বিষয়, তেমনই, মানুষের নিজের মৃত্যুচিন্তা বা মৃত্যুকল্পনাও কবিতার একটি বড় বিষয়। এই কবিতায়, কবি যে-মৃত্যুর কথা ভাবিয়াছেন তাহার নাম 'সুখ-মৃত্যু'; এজন্য ইহার কল্পনা ততটা গভীর গম্ভীর নয়, কিছু সৌখীন বা sentimental। বেশ বুঝা যায়, তিনি মৃত্যুর ব্যাপারটাকে দুই-চারিটি মন-ভুলানো যুক্তির দ্বারা সহজ করিয়া লইয়াছেন। তথাপি, কবিতাহিসাবে ইহাতে ভাবের ও ভাষার যেমন স্বচ্ছতা, তেমনই পুরুষোচিত দৃঢ়তা আছে; ইহাই দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতার বিশেষ গুণ। ভাষা লক্ষ্য কর।

ছন্দ—পদভাগের ত্রিপদী; ৮+৮+১৪; তৃতীয় পদটিকে ৮+৬ এইরূপ আরও ভাগ করা যাইতে পারে। (৫১) দেখ।

৭-১০। তুলনীয়—(৩৯)। ১০। অদ্য—সদ্য, তৎক্ষণাৎ। ১৪-১৫। বড়ই যথার্থ কথা। ১৮। অবধি—সীমা; শেষ। ১৭-২০। এইরূপ চিন্তা মানুষের পক্ষে

স্বাভাবিক নয়—খুব নাস্তিক যাহারা তাহারাই মৃত্যুকেই শেষ বলিয়া বিশ্বাস করে মানুষের পক্ষে, মৃত্যুর পরের যে অবস্থা তাহার সম্বন্ধে ভয় পাওয়াই স্বাভাবিক ("The dread of something after death")। ২১-২৪। কবি এইখানে, 'আর যদি' বলিয়া যে অপর অবস্থার কথা বলিয়াছেন, তাহাও তাঁহার পূর্ব্বের সেই একই কথা; কারণ, সুখও নাই দুঃখও নাই, এমন অবস্থায় পরব্রহ্মে লীন হইয়া যাওয়াও যা—মৃত্যুর পরে কিছু না থাকাও তাই। অতএব দেখা যাইতেছে, মৃত্যুর সম্বন্ধে কবি কোন বিশেষ ভাবনা ভাবিতে রাজী নহেন। পরব্রহ্মে লীন—বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরে বাহিরে ও উপরে যে এক সত্তা ছাড়া আর কিছু নাই (যাহা আছে বলিয়া মনে হয় তাহা আমাদেরই ভ্রান্তি)—তাহাই পরব্রহ্ম; অতএব 'পরব্রহ্মে লীন হওয়া'র অর্থ—সেই 'এক'-এ মিলাইয়া যাওয়া, পৃথক অস্তিত্ব না থাকা। ২৫-৩২। এই কয়টি ছত্রে মনুষ্যহৃদয়ের বড় করুণ ও স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হইয়াছে। ইংরেজী 'Gray's Elegy' যদি পড়িয়া থাক, তবে সেই লাইন কয়টি স্মরণ কর—

"For who, to dumb forgetfulness a prey,
This pleasing anxious being e'er resign'd,
Left the warm precincts of the cheerful day,
Nor cast one longing lingering look behind ?"

—না পড়িয়া থাকিলেও, এই লাইন কয়টি বুঝিয়া মুখস্থ করিবে। এই কবিতার শেষ স্তবকটিও মুখস্থ করিবে।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা :—অবধি ; পরব্রহ্মে লীন ; মৃদুমন্দ।

(৬৫)

দ্বিজেন্দ্রলালের একটি হাসির গান। 'তা' সে হবে কেন!'—এই বাক্যটিতেই কবিতার মূল অর্থ ধরা পড়িয়াছে। প্রকৃতিতে, সংসারে,—সর্ব্বত্র একটা নিয়ম আছে; সেই নিয়মকে না মানিয়া—কোন ব্যক্তি বা সমাজ আপনার ইচ্ছামত সুখ-সাধন করিতে পারে না। সে নিয়ম এই যে—শক্তি, বুদ্ধি ও গুণ অনুযায়ী যাহার যাহা প্রাপ্য সে তাহাই পাইয়া থাকে; মূর্খতা, আলস্য, ও কাপুরুষতা সত্ত্বেও কেহ বড় হইতে পারে না; এবং কেবল আত্মসুখ ও স্বার্থপরতায় সমাজ-রক্ষা হয় না।

ছন্দ—ছড়ার ছন্দ, অর্থাৎ, হসন্ত-বাদ চার অক্ষরের পর্ব্ব অনুসারে ইহার ছেদগুলি পড়িবে। ইহাতে দুই রকমের লাইন আছে, এবং কোন কোন লাইনের গোড়ায় এমন একটি করিয়া শব্দ আছে যাহা ছন্দের বাহিরে পড়ে, যথা—

(তোমরা) দেশোদ্ধারটা | কর্ত্তে চাও কি | করে মুখে | বড়াই।
তোমাদের ও | করপদ্মে | দেশটা সঁপে | শেষে।
(তোমরা) বোঝাতে চাও | হিন্দুধর্ম্মের | অতি সূক্ষ্ম | মর্ম্ম।
অম্‌নি তাই সব | বুঝে যাবে | যত শ্বেত— | চর্ম্ম।

—ব্র্যাকেটের মধ্যে যে টুকু আছে, তাহা ছন্দের—অর্থাৎ, লাইনের—বাহিরে আছে। [(৭০) দেখ] শেষের ছোট পর্ব্বগুলি খণ্ডপর্ব্ব।

৩। ফতে—জয়; বাংলা ভাষায় হিন্দীর (মূল—আরবী) প্রভাব লক্ষ্য কর। ৬। করপদ্মে—এখানে ব্যঙ্গ করা হইয়াছে। ৯। প্রচার কোরেই—অর্থাৎ, নিজে না আচরণ করিয়া। ১৩। এই একটি বাক্যে বর্ত্তমান হিন্দুজাতির সাধারণ চরিত্র বর্ণনা করা হইয়াছে; আসলে, ওই দুইটি মহাদোষকে ঢাকিবার জন্যই তাহারা ধর্ম্মের উচ্চতত্ত্বের দোহাই দেয়। ১৮। তাড়া—'তাড়না' হইতে; 'মুখের তাড়া' (চল্‌তি বুলি)—ধমক।

ভাষা ও শব্দশিক্ষাঃ—তল্পিতল্পা; লড়াই ফতে করা; অগ্রগণ্য; মুখের তাড়া; আর্কফলা।

(৬৬)

কাঁঠালী চাঁপার রঙ প্রায় সবুজ—ঈষৎ পীতবর্ণ; গন্ধটি আরও অদ্ভুত—ফুলের মত নয়, চাঁপা-কলার মত; আকারও খুব সুন্দর নয়—পাপড়িগুলি চওড়া নখের মত। কবি বলিতেছেন—কাঁঠালী চাঁপা—না ফুল, না ফল, না পাতা; এক সঙ্গে তিনটিই হইবার লোভে, বেচারীর এই অবস্থা ঘটিয়াছে। ইহা হইতে আমরা এই শিক্ষা পাইতেছি যে, কোন এক-ধর্ম্ম বা এক-জাতির আদর্শ দৃঢ়রূপে পালন না করিয়া যে ব্যক্তি সর্ব্বজাতি ও সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় (একের মধ্যে সকলের সমাবেশ) করিতে চায়; তাহার কোন জাতি,

কোন ধর্ম্মই বজায় থাকে না—সে এই 'কাঁঠালী চাঁপার' মত একটা অদ্ভুত বস্তু হইয়া থাকে।

ছন্দ—সনেট। ৩১, ৫৮, ও ৫২ দেখ। এই সনেটটির মিল-বিন্যাস লক্ষ্য কর; শেষের ছয় লাইনের প্রথম দুইটি—পয়ার-পংক্তির মত, এবং তাহাতে—৮+৬ না হইয়া, সনেটের ভাগ হইয়াছে—৮+২+৪। এই রীতি ফরাসী ভাষার সনেটে লক্ষিত হয়।

২। বর্ণচোরা—যে বর্ণ চুরি করে, অর্থাৎ লুকায়। ১০। দু'মনা—(চলতি কথা) দুই-মন বা 'দ্বিধা'; দুই দিকেই সমান ঝোঁক।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা :—বর্ণচোরা; অম্বুজ; সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়।

(৬৭)

কবিতাটিতে কবি করুণানিধানের কবিত্বের যাহা বিশেষ লক্ষণ, তাহা পুরাপুরি আছে; —প্রথম, প্রাকৃতিক বস্তু ও দৃশ্যের ছবি-আঁকা; দ্বিতীয়, ভাষার মার্জ্জিত লালিত্য, শব্দচয়নে অতিশয় যত্ন ও পারিপাট্য। এই কবিতায় কবি বর্ষাকালের একটা অতি সুপরিচিত পল্লীচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন; মাটি, জল, আকাশ, পুকুরের মাছ, গাছের ফুল ও ফল, পাখী—সব মিলিয়া কবির চারিপাশে একটি রং, রস ও গন্ধপূর্ণ রূপমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছে।

ছন্দ—একপ্রকার দীর্ঘ চৌপদী—পর্ব্বভাগের ছন্দ; প্রত্যেক বড় লাইনে দুইটি ৬ অক্ষরের পর্ব্ব; এবং ছোটগুলিতে—একটি ঐ পর্ব্ব, ও একটি ২ অক্ষরের খণ্ডপর্ব্ব আছে, যথা—

(১) এসেছে বরষা | বড় চঞ্চল (৬+৬)

(২) বড় দুরন্ত | মেয়ে। (৬+২)

১। গাঙে নামে ঢল—বৃষ্টির জলে নদী ছাপাইয়া উঠাকে 'ঢল নামা' বলে; হয়ত অনেক দূরে কোথাও বৃষ্টি হইয়াছে, তাহার জলে নদীতে সহসা জলবৃদ্ধি হয়। ২। কোমল কাজল—স্নিগ্ধ কালো রং (মেঘ)। তুলনীয়—"মেঘৈর্মেদুরমম্বরম্" (জয়দেব) ১২। এ দৃশ্য প্রায় দেখা যায়। ১৭। বাবুই পাখীর বাসা-নির্ম্মাণ একটা দেখিবার বস্তু। 'বাবুই-বাসা' কথাটি বাংলায় একটা প্রবাদের মত হইয়া গেছে।

১৮। ছুটিছে হাউই্—হাউই-এর মত বেগে ছুটিতেছে। ১৯-২০। চিত্র ও চিত্রের ভাষা, দুই-ই অতি সুন্দর। আকাশের নীল রঙ যেন জলে ধুইয়া ঝাপ্‌সা হইয়া গেছে। ২১-২৪। শেষের এই লাইন-কয়টির ছন্দ, ও শব্দচিত্র বড়ই মনোহর। চন্দন-দীঘি—একটি দীঘির নাম।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা :—গাঙে নামে ঢল ; বৃষ্টির ছাঁট ; ভাসিল (পুকুর) ; সুচিকণ শ্যাম ; ঝাপট ; মরকত-তাজ।

(৬৮)

অতিশয় সরল, অনাড়ম্বর, স্বাস্থ্যপূর্ণ পল্লীজীবনের প্রতি কবির লোভ এই কবিতায় ব্যক্ত হইয়াছে। সে জীবনে, প্রকৃতির সঙ্গে যেমন ঘনিষ্ঠ আনন্দময় সম্বন্ধ, তেমনই, প্রেম, স্নেহ ও ভক্তি অটুট থাকিবার যথেষ্ট সুযোগ আছে। কবিতাটিতে কবি করুণানিধানের সৌন্দর্য্য-দৃষ্টি ও শব্দচিত্র-রচনার পরিচয় পাইবে। তুলনীয়—(৮৬) ও (৯৩)।

ছন্দ—ছড়ার ছন্দের স্তবক। বড় লাইনগুলিতে দুইটি পর্ব্ব, এবং ছোটগুলিতে একটি পর্ব্ব ও একটি খণ্ডপর্ব্ব আছে, যথা—

ছুট্‌ব আমি | সরল প্রাণে (৪ + ৪)
পর্ণ-কুটীর | হ'তে (৪ + ২)

মিলের কৌশল, ও লাইনগুলি সাজাইবার রীতি দেখিয়া লও।

৪। আলিপথ—মাঠের দুই চষা-জমির মধ্যে যে সরু সীমানা-চিহ্ন থাকে ; আইল, আ'ল। ২৬। মোতির সাতনরী—'সাতনরী', সাত 'লহর' বা 'ধারা'-('হালি')-যুক্ত কণ্ঠহার। বড় বড় মুক্তার মত জলবিন্দু ঘাসের উপরে সাতনরী-হারের মত ছড়াইয়া পড়িবে। এখানে একটু ছন্দের দোষ আছে—পুরা ছয় (৪ + ২) অক্ষর (syllable) হয় নাই। ২৯-৩২। একখানি ভূদৃশ্য-পট ; বৃষ্টির বড় বড় দীর্ঘধারা যেন একখানি 'চিক' রচনা করিবে, সেই চিকের ফাঁকে দূরে উচ্চ নারিকেল গাছের শ্রেণী এবং তাহার নীচে কেয়ার বন দেখা যাইবে। ৩৩। মোয়া—নাড়ু ; যেমন মুড়ির মোয়া, মুড়কির মোয়া,—তেমনই শিলের মোয়া (ball)। ৪৬। হেলা'—হেলিয়া-পড়া। ৪৭। সুড়ঙ্গ—গর্ত্ত ; সংস্কৃত, 'সুরঙ্গ'। ৪৮। কাঠঠোক্‌রা পাখী তোমরা বোধ হয় দেখ নাই। ৫৫। স্ফুলিঙ্গগুলি একসঙ্গে অনেক বাহির হয়, এবং ছোট বলিয়া—যুঁই

—এখানেও প্রথম কথাটি ('এই') ছন্দের বাহিরে ; পর্ব্ব একটি, খণ্ডপর্ব্ব একটি। পড়িবার সময়ে ছন্দের বাহিরের কথাটির পরে একটু থামিয়া লাইনটি আরম্ভ করিতে হয়।

৩। পরী-বিহঙ্গী—কারণ তাহাদের দুই কাঁধে দুইখানি পাখা আছে। ১১-১২। লাইনটি অতি সুন্দর—কেন, বুঝিয়া দেখ। 'সবুজ-স্বপন'—সবুজের স্বপন। ২০। গেছে চুকে—শেষ হয়ে গেছে। ২১। এই স্তবকে পরীদের দেহের ক্ষুদ্রতা ও কোমলতার আভাস দেওয়া হইয়াছে। শিরীষফুল বড় কোমল ; এবং রজনীগন্ধা ফুলগুলি খুব ছোট গেলাসের মত। ২৯। ঝিকিমিকি—'শব্দার্থ-সূচী' দেখ। এখানে 'ঝিকিমিকি' অর্থে অতিশয় সূক্ষ্ম ও চিক্কণ বুঝাইতেছে।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা :—ফাগুনী চাঁদের জোছনা-জুয়ারে ; বিকচ ; ফুরফুরে ; কিরণ-সূতায় ; সবুজ-স্বপন-সুখে ; পদ্মকোরক ; ঝিঁঝির ঝিঁঝিঁট তান ; পাপড়ি খসায়ে ; হিন্দোলা ; উর্ণনাভ ; কুয়াশাসার ; ঝিরিঝিরি।

(৭১)

কবিতাটি বড় করুণ ; বিষয় ভিন্ন হইলেও, এইরূপ করুণ রসের একটি বিখ্যাত ইংরাজী কবিতা—Hood-এর "Bridge of Sighs" যদি না পড়িয়া থাক, পড়িয়া দেখিবে ; গল্প বা চরিত্র এক নয়, কিন্তু কবির প্রাণের যে কোমল কারুণ্য এই কবিতায় প্রকাশ পাইয়াছে, সেদিক দিয়া উভয় কবিতা তুলনীয়।

ছন্দ—ছড়ার ছন্দের স্তবক—সর্ব্বশুদ্ধ ৮ লাইন ; তাহার প্রথম ছয় লাইনের মিল এক রকম ; শেষের দুইটি—জোড়া-মিলের লাইন। লাইনগুলিতে এইরূপ ছেদ পড়িবে—

পায়ের্ তলায়্ | নরম্ ঠেক্‌ল | কি

—'বাংলা কবিতার ছন্দ' দেখ।

প্রথম দুইটি স্তবকে অন্ধনারীর অন্ধ অবস্থাটি বড় চমৎকার ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। বধূটি জন্মান্ধ নয়, দৃষ্টিশক্তি কোন কারণে হঠাৎ নষ্ট হইয়াছে। অন্ধেরা স্পর্শ ও শব্দের সাহায্যেই সব কিছু বুঝিবার চেষ্টা করে।

৬। 'আকাশ-পাতাল মনে হওয়া'—একটি চল্‌তি বাক্য ; অর্থ—অনির্দ্দেশ্য ভাবনা, এলোমেলো চিন্তা। ১৬। দ্বন্দ্ব—এখানে, 'যতকিছু বিপদ-বিড়ম্বনা'। ২৩। কাঁটা

—মেয়েলী ভাষায় 'শক্ত'। ২৫-৩২। কথাগুলি বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। 'জন্মদুখীর দীর্ঘ আয়ু দিয়ে' এই বাক্যটি একটি প্রবাদ-বাক্যের মত; যাহারা বড় দুঃখী তাহারা নাকি অনেক দিন বাঁচিয়া থাকে—সুখীদেরই শীঘ্র মৃত্যু হয়। বধূ বলিতেছে—আমার এই দুঃখী-জীবনের দীর্ঘ আয়ু আমার স্বামীকে দিয়া যাইব—তিনি যেন সুখী হইয়াই তাহা ভোগ করেন। ৩০। বালাই—অমঙ্গল। এই স্তবকটিতে বাঙালী পল্লীবধূর যে অপার স্বামী-স্নেহ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ কবিকল্পনা নয়; এরূপ চরিত্র আমাদের দেশে এককালে সুলভ ছিল—এখনও হয়ত দুর্ল্লভ নয়।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা :—মধু-মদির; চৈতালি; বালাই; ডাহুক-ডাকা।

(৭২)

এই কবিতাটিতে বাংলার চাষী-জীবনের একটি সুন্দর অথচ বাস্তব চিত্র পাওয়া যায়,—তাহাদের তুলনায় আধুনিক ভদ্রলোক-শ্রেণীর মানুষের জীবন ও চরিত্র কত বিপরীত, কবি তাহারই আভাস দিয়াছেন। এই কবিতাটির রচনায় একটি বড় কৌশল লক্ষ্য করিবে—একজনের কথাবার্ত্তার ভঙ্গিতেই কবি এই খণ্ড-কবিতাটিকে একটি ক্ষুদ্র নাট্য-চিত্র করিয়া তুলিয়াছেন। এইরূপ রচনাকে ইংরাজীতে 'Dramatic Monologue' বলে।

ছন্দ—প্রতি লাইনে ছয় অক্ষরের তিনটি পর্ব্ব, এবং দুই অক্ষরের একটি খণ্ডপর্ব্ব আছে, যথা—

মুখোস-পরানো | মোলাম মিথ্যা | বিনীত অহং | কার

৩। মোলাম—মোলায়েম। বিনীত অহঙ্কার—বাহিরের বিনীত ব্যবহারে ভিতরের অহঙ্কারই ফুটিয়া উঠে—সে বিনয় যেন গরিবের প্রতি একপ্রকার ব্যঙ্গ। ১০। ভোল—ছল। ১৯। দড়—দক্ষ; পাকা। ২০। কুড়িতে পড়িবে—বয়স উনিশ পূর্ণ হইয়া কুড়ি আরম্ভ হইবে। 'পড়িবে' শব্দটির অর্থ লক্ষ্য কর; ইহাকে ইংরাজীতে 'phrasal sense' বলে ('ভূমিকা' দেখ)। ২৪। ঠাট—বাহ্য আচরণ। ৩১-৪৪। এই অংশটিতে এই কবিতার সবচেয়ে মূল্যবান কথা আছে। মানুষ যদি সত্যকার মানুষ হয়, অর্থাৎ সত্যনিষ্ঠ, পরিশ্রমী ও আত্মনির্ভরশীল হয়, তবে তাহার দুর্গতি হইতে পারে না। ৩৫। দিন্-দুনিয়াটা—(চলতি বাংলা) অর্থ, ইহলোক-পরলোক।

(দীন্—ধর্ম্ম ; দুনিয়া—জগৎ)। ৩৬। ব্যবসায়ে মূলধন খাটাইলে যেমন সম্পদ বৃদ্ধি হয়, তেমনই ভগবান মানুষকে খাটাইয়া তাঁহার ঐশ্বর্য্য বিস্তার করিতেছেন। ভাবার্থ, :— মানুষ পরিশ্রমের দ্বারাই ভগবানের মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখে। ৪০। সংহতি—একদিকে বা একমুখে প্রয়োগ করিলে যেরূপ দুর্জ্জয় হয়। ৪৫-৫০। যথার্থ শিক্ষার অভাবেই মানুষের অধঃপতন হয় ; যে শিক্ষায় ধর্ম্মবোধের প্রয়োজন নাই—নকল সভ্যতা ও নিরর্থক মস্তিষ্ক-চর্চ্চা যাহার আদর্শ, সে শিক্ষার ফলে কেবল চাকরী-রূপ ভিক্ষায় বাহির হইবার একটা পোষাক মাত্র মেলে। সে শিক্ষা লাভ করিয়া যাহারা কৃতার্থ হয়, তাহারা যেন ছিন্নমস্তার মত নিজেদের মাথা কাটিয়া সেই রক্ত উল্লাসে পান করিয়া থাকে। বাহির হইতে শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে চলিবে না—নিজেদের দেহ, মন ও প্রাণের প্রয়োজন-মত শিক্ষা নিজেদেরই ঠিক করিয়া লইতে হইবে ; নতুবা সর্ব্বনাশ হইতে রক্ষা পাইবার উপায় নাই। ৪৮। ভেক্—'ভেক নহিলে ভিক্ষা মেলে না'—প্রবাদ বাক্য। ভিক্ষা যাহাদের জীবিকা তাহাদিগকে একরূপ বেশ বা পরিচ্ছদ ধারণ করিতে হয়, তাহাকে 'ভেক' বলে। ৬০। এখো-গুড়—আখ (ইক্ষু) হইতে তৈয়ারী গুড়।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা :—হরেক রকম ; আগড় ; দড় ; ছিন্নমস্তা ; ভোল ; ভেক-নেওয়া ; দেশ-জোড়া।

(৭৩)

সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দ-রচনার যে আশ্চর্য্য শক্তি ছিল—এই কবিতা তাহারই একটি দৃষ্টান্ত। ইহার ছন্দটিকে ভাল করিয়া বুঝিয়া ও ভাল করিয়া অভ্যাস করিয়া আবৃত্তি করিবে। ঝর্ণার দ্রুত-গতি এবং তাহার ঝঙ্কার এই কবিতার ছন্দে ধরা পড়িয়াছে ; তা ছাড়া, ঝর্ণার পথে যত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ছড়াইয়া থাকে, কবি তাহারও আভাস দিয়াছেন।

ছন্দ—পর্ব্বগুলি চার অক্ষরের (পর্ব্বভাগের ছন্দ) ; কিন্তু মাঝে মাঝে দুই পর্ব্ব যুক্ত হইয়া আট অক্ষরের পরে ছেদ সৃষ্টি করিতেছে, যথা—

৪ ৪ ৪ ৩
পান্নার—অঞ্জলি | দিতে দিতে—আয় গো,

কিন্তু—

৪ ৪ ৪ ৩
গিরি মল্—লিকা দোলে | কুন্তলে—কর্ণে

ইহার খণ্ডপর্ব্বগুলি তিন অক্ষরের ; প্রথম লাইনে আসলে তিনটি পংক্তি আছে, প্রথম দুই পংক্তিতে দুইটি খণ্ড পর্ব্ব মাত্র ('ঝর্ণা' !) । তৃতীয় পংক্তিতে একটি পূরা পর্ব্ব ('সুন্দরী'), এবং একটি খণ্ডপর্ব্ব ('ঝর্ণা') আছে।

৩। গৈরিকে—গিরিমাটির লাল রং। ৫। তাপসী অপর্ণা—'অপর্ণা' উমার একটি নাম; উৎপত্তি-স্থানে—রুক্ষ পর্ব্বতভূমির মধ্যে, শীর্ণতনু (ক্ষীণধারা) তপস্বিনী উমার মত ; অথচ যৌবন-চঞ্চলা, অর্থাৎ, বেগবতী। ৭। তুষারের বিন্দু—হিমকণার মত শীকরময়ী ; ক্রমাগত উচ্চ হইতে নিম্নে সবেগে পতিত হওয়ার জন্য ধোঁয়ার মত জলকণার সৃষ্টি হয়। ১০। ঝর্ণার সর্ব্বাঙ্গে চাঁদের আলো খণ্ড খণ্ড সোনার পাতের মত উজ্জ্বল দেখায়। ১৬। শ্যামলিয়া—যেমন—'মোহনিয়া' ; কবিতার ভাষায় এইরূপ হইয়া থাকে, গদ্যে চলিবে না। ১৭। ভর্ণা—'অফুরন্ত' অর্থে ; যাহা কাণায় কাণায় পূর্ণ। ১৯। তনুগাত্রী—['তনু' অর্থে কৃশ), তন্বী। ২১। দুই পাশে সবুজের শোভা বৃদ্ধি করিতে করিতে। 'সুপর্ণী'—'সুপর্ণ' বা 'গরুড়ের' মাতা। গরুড় স্বর্গ হইতে সুধা হরণ করিয়াছিল। 'সুপর্ণ' অর্থে—সুন্দর পক্ষ যাহার। এখানে গরুড়ের মাতা নয়,—ঝর্ণাকেই স্ত্রী-গরুড় বলা হইয়াছে। ২৩। উপমাটি মন্দ হয় নাই। অতি ঊর্দ্ধ স্থান হইতে ঝর্ণা অমৃত-শীতল বারি বহিয়া আনে, তাহার অঙ্গও ছায়ালোক-রঞ্জিত। বেলোয়ারি আওয়াজ—কাচ-দ্রব্যের ঠুন্ ঠুন্ ধ্বনি। ২৭। মোতিয়া মতির কুঁড়ি—মুক্তার (মতি) মত বেলফুলের (মোতিয়া বেল) কুঁড়ি ; শুভ্র ফেনবিন্দু। ২৯। যাহার সহিত কেবল স্বপ্নে দেখা হয় সেই অপ্সরীর (বিদ্যুৎপর্ণা) মত।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা :—তরলিত চন্দ্রিকা ; চিত-লোল ; চুম্‌কী ; ধর্ণা ; লাস্য ; তনুগাত্রী ; হরিচরণচ্যুতা ; সুপর্ণা ; বেলোয়ারি ; মঞ্জুল ; মেখলা।

(৭৪)

এই কবিতাটি সত্যেন্দ্রনাথের অপর সকল কবিতা হইতে ভিন্ন ; ইহার ভাষাও যেমন অতিশয় সাধু, সুন্দর ও সংযত, ছন্দও তেমনই ধীর, গম্ভীর—নৃত্যচপল নয় ; আগের কবিতাটির ছন্দের সহিত তুলনা কর। বনভূমির বর্ণনা, মঞ্জুভাষার রূপ-চিত্র এবং কথোপকথনের অতিশয় স্বাভাবিক অথচ মার্জ্জিত মধুর ভঙ্গিটি লক্ষ্য কর। চার্ব্বাক

নাস্তিক ছিলেন, ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন না; এজন্য তাঁহার নামের সহিত একটা শ্রদ্ধাহীনতার ভাব যুক্ত হইয়া আছে; তিনি একজন বড় বিদ্রোহী ছিলেন। কবি এখানে চার্ব্বাকের যৌবন-বয়সের একটি ঘটনা কল্পনা করিয়াছেন। চার্ব্বাক যে কেন ভগবানে বিশ্বাস করিতেন না, এবং একবার মাত্র কোন্ কারণে ক্ষণেকের জন্য তিনি ভগবানের মহিমা স্বীকার করিয়াছিলেন তাহাই এই কবিতায় বলা হইয়াছে। মর্ম্মার্থ:—জ্ঞানের অতিরিক্ত অনুশীলন মানুষের হৃদয়কে শুষ্ক করে—জীবনের দুঃখবোধ আরও বাড়িয়া যায়; কিন্তু হৃদয়ে যদি প্রেম স্নেহ প্রভৃতির উন্মেষ হয়, তাহা হইলে সকল দুঃখের মধ্যেও মানুষের প্রাণ আনন্দে পূর্ণ থাকে, এবং সেই আনন্দের দাতারূপে ভগবানকে সে চিনিতে পারে। যাহার হৃদয়ে প্রেম নাই, তাহার ভগবানও নাই; সৃষ্টির মাধুর্য্য যে অনুভব করিল না, সে সৃষ্টিকর্ত্তাকে জানিবে কেমন করিয়া? চার্ব্বাক শেষে নাস্তিক হইয়া ভগবান, আত্মা ও পরলোক বিশ্বাস করিতেন না; যেমন করিয়া হৌক, জীবনে সুখ ভোগ কর—ইহাই ছিল তাঁহার উপদেশ।

ছন্দ—প্রধানতঃ চার লাইনের স্তবক—পদভাগের ছন্দ, প্রতি চরণে ১০ অক্ষর। মধ্যে ছন্দের পরিবর্ত্তন হইয়াছে, স্তবকের লাইনগুলি সমান নয়—১৪ অক্ষর ও ৬ অক্ষর। মিলের রীতি সর্ব্বত্র এক নয়, তাহাও লক্ষ্য কর।

প্রথম তিনটি স্তবকে মধ্যাহ্নের বনভূমির বর্ণনা। ২, ও ১১-১২ পংক্তিগুলিতে, মধ্যাহ্নের উত্তাপ এবং আলোক কত সংক্ষেপে অথচ চিত্রবৎ বর্ণিত হইয়াছে! ৪। মধ্যাহ্নকালে, প্রকৃতির রাজ্যে যাহা কিছু চলিতেছে,—যেমন, আকাশে মেঘেদের আনাগোনা, মাঠের প্রান্তে নদীর জলস্রোত, বনের ভিতরে ক্ষণে ক্ষণে বৃক্ষশাখার আন্দোলন ও বায়ু-মর্ম্মর, অথবা আলো ও ছায়ার স্থান-পরিবর্ত্তন—এ সকলের কিছুতেই যেন কোন কাজের তাড়া নাই, সর্ব্বত্র একটি অলস মন্থর ভাব ফুটিয়া উঠিতেছে। ১১-১২। বনতলে, ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষরাজির পত্রপুঞ্জের ফাঁকে সূর্য্যকিরণ ধারার মত ঝরিতেছে। মদির—উন্মাদক, এখানে 'তপ্ত'। মধুচক্র ও মধুর উপমাটি ভাল করিয়া বুঝিয়া লইবে। ১৬। শিশিরের পদ্মকলিসম—শীতকালের পদ্মকলি যেমন অল্প উত্তাপের অভাবে ফুটিবার সময় হইলেও ফুটিতে পারে না, তেমনই চার্ব্বাকের হৃদয় জ্ঞানের শীতল স্পর্শে, যৌবনেও (ফুটিবার কালেও) ফুটিতে পারিতেছে না। দুই বিপরীত ভাবের টানাটানিতে ক্ষুব্ধ অথচ স্থির হইয়া আছে। ৩৩-৫২। এই কয়টি

স্তবক বার বার পড়িবে, পারিলে মুখস্থ করিবে। 'মঞ্জুভাষা'কে কবি যথার্থ 'বনদেবী'-রূপেই চিত্রিত করিয়াছেন—উপমাগুলি দেখ। ৪১-৪৪। এই পংক্তিগুলিতে ভাষার সৌন্দর্য্য চরমে উঠিয়াছে—মুখস্থ কর। পর্ণরাশি-মর্ম্মর-মঞ্জীর—শুষ্ক পত্ররাশির উপর দিয়া চলিবার সময়ে যে 'মর্ম্মর'-শব্দ হইতেছে—সে যেন তাহার পায়ের নূপুরের শব্দ। ৪৭-৪৮। তাহার প্রকৃতি অতিশয় ধীর বলিয়া মনের আনন্দ চোখে-মুখে উছলিয়া উঠে না ; তাই তাহার গণ্ড দুইটি মহুয়া ফুলের মত ঈষৎ পাণ্ডুর। ৬৩। চিত্রিত—গোল গোল দাগযুক্ত (spotted)। ৮৭। ভাষাহীন—প্রাণ পূর্ণ থাকিলে বাক্য ফুরাইয়া যায়। ৮৯-৯২। আরম্ভের মন্তব্য দেখ। ৯৫। 'নির্গুণ'—অর্থাৎ, কেবলমাত্র সূক্ষ্ম দার্শনিক বিচারের দ্বারা ভগবান সম্বন্ধে যে ধারণা হয় ; 'গুণ' অর্থাৎ কোন 'বিশেষণ' নাই যাঁহার ; মানুষের সুখ-দুঃখ, ভাবনা-বাসনার অতীত নির্ব্বিকার পরম পুরুষ।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা :—দৃঢ় ওষ্ঠাধর ; শিশিরের পদ্মকলি ; নিধান ; ডুবু-ডুবু ; নীবার-মঞ্জরী ; বাহুলতা ; তন্তু ; চন্দ্রিকা ; কিরাত ; মরাল-গমনে ; মঞ্জুলীলাভরে ; দয়ার ঠাকুর।

(৭৫)

সত্যেন্দ্রনাথের আর একটি উৎকৃষ্ট কবিতা। শিশুর মৃত্যুতে কবি যে শোক করিতেছেন তাহার ভাষা যেমন সরল, ভাবও তেমনই আন্তরিক। শিশুর দেহের ক্ষুদ্রতা, এবং বয়সের অল্পতা—এই দুইটি কথা লইয়া কবি তাহার মৃত্যুর ঘটনাটিকে কিরূপ করুণ করিয়া তুলিয়াছেন !—প্রাণের সত্যকার অনুভূতির সঙ্গে কতকগুলা এমন চিন্তার উদয় হইয়াছে, যাহা বলিবামাত্র সকলের মনে সাড়া জাগাইবে। অতিশয় সহজ কথায় এমন গভীর শোকের ভাব প্রকাশ করা উৎকৃষ্ট কবিত্বের লক্ষণ।

ছন্দ—ছড়ার ছন্দের স্তবক—প্রত্যেকটিতে আটটি সমান লাইন আছে। লাইনগুলি এইরূপ (দুইটি পর্ব্ব ও একটি খণ্ডপর্ব্ব) :—

ছোট থালায় | হয় নাক' ভাত | বাড়া ;
জল ভরে না | ছোট্ট গেলা | সেতে।

'ছিন্ন-মুকুল'—নামটির সার্থকতা কি? (মৃত্যু যাহাকে ছিঁড়িয়া লইল—ফুটিতে দিল না)।

৫-৮। ছোট পীঁড়ি, ছোট থালা, ও ছোট গেলাস—শিশুর জন্য এই যে আয়োজন, ইহাতে গৃহস্থ-ঘরের একটি বড় মধুর দৃশ্য মনে পড়ে; শিশুকে এমন করিয়া খাওয়ানো যেন স্নেহের একটি নিত্য-উৎসব। এমন করিয়া যাহাকে খাওয়ানো হয় তাহার বয়স কত অনুমান কর; সে-বয়সের শিশুর একটি বিশেষ মনোহারিত্ব আছে। কবি এই খাওয়ার কথাটিই সর্ব্বাগ্রে স্মরণ করিয়াছেন, কারণ, প্রত্যহ আহারে বসিবার সময় সেই কথাই মনে পড়ে,—যে সকলের আগে খায়, তাহাকে আর কেহ খাইতে ডাকে না—এখন, তাহাকে না খাওয়াইয়া সকলকে খাইতে হইবে! 'ঘুচেছে'—এইখানে এই ক্রিয়াপদের বিশেষ ব্যবহার লক্ষ্য কর। ১৫-১৬। বড়ই অপূর্ব্ব উক্তি! অন্ধকারে একা থাকিতে যে ভয় পাইত, সে-ই—সবচেয়ে ভয়ঙ্কর যাহা, বড়রাও যাহাতে ভয় পায়—সেই মহা অন্ধকার ঘরের চাবি খুলিল, অর্থাৎ, মৃত্যুর গৃহে প্রবেশ করিল! বিধাতার কি বিচিত্র বিধান! 'ভয়-তরাসে'—একটি চল্‌তি কথা (ভয়+ত্রাস)—সামান্য কারণে যে ভয় পায়। ২১। পড়তে চোখের পাতা—এক নিমেষে। ২২। বিসর্জ্জনের বাজনা—সম্ভবতঃ কোন প্রতিমা-বিসর্জ্জনের দিনে (বিজয়া দশমীতে) শিশুটির মৃত্যু হয়। ২৫। বোল-বলা সেই বাঁশী—সত্যেন্দ্রনাথের ভাষার একটি সুন্দর উদাহরণ। অতিশয় চল্‌তি শব্দের দ্বারা তিনি অতিশয় অর্থপূর্ণ ভাব প্রকাশ করিতে পারিতেন। শিশুর 'আধ-আধ' কথার নাম—'বোল'; 'বাঁশী'র অর্থ—তাহার মধুর কণ্ঠস্বর। যাহার কথা শুনিলে মনে হইত, বাঁশী হইতেই সুরের সঙ্গে বুলি বাহির হইতেছে। ১৮। দুধে-ধোয়া—'ধোয়া'র অর্থ লক্ষ্য কর; 'দুধের মত সাদা'। ৩১-২২। 'ঘর' ও 'শ্মশান', এই দুইটী শব্দ কিরূপ বিপরীতার্থ-বোধক, তাহা লক্ষ্য কর। ৩৪। মেলে—(মেলিয়া) দেওয়া। ৩৯-৪০। এখানে যে অর্থবিরোধ আছে তাহাই ভাবকে আরও সত্য করিয়া তুলিয়াছে—যে সবচেয়ে ছোট, অর্থাৎ যে ঘরের অতি অল্পস্থান জুড়িয়াছিল, তাহার অপসারণে (আর সকলের থাকা সত্ত্বেও) ঘর শূন্য হইয়া গিয়াছে।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা :—ভয়-তরাসে; টের (পেলে না); বোল-বলা; দুধে-ধোয়া কচি দাঁতের হাসি।

(৭৬)

ভাষায় ও ছন্দে, এবং অতি সুকুমার একটি ভাবের সুরে, কবিতাটি একটি উৎকৃষ্ট গীতি-কবিতা হইয়াছে। মুখস্থ করিতে পার। একটি জাপানী কবিতার অনুবাদ হইলেও, কবির নিজের কবিত্বের পরিচয়ও ইহাতে আছে—তিনি যে মূল কবিতাটির ভাব নিজের অন্তরে সম্পূর্ণ গ্রহণ করিয়া আপনার ভাবে পরিণত করিতে পারিয়াছেন, তাহার প্রমাণ এই কবিতায় আছে, কারণ, তাহা না হইলে কবিতাটি ভাষায়, ছন্দে ও সুরে এমন স্বচ্ছন্দ হইয়া উঠিত না। যে ভাবটি অপর এক ভাষার শব্দগুলিতে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সেই ভাবকে আর এক ভাষার শব্দের সাহায্যে, আর এক ভঙ্গিতে ফুটাইয়া তোলাই কবিতার যথার্থ অনুবাদ। সত্যেন্দ্রনাথের অনেক অনুবাদ-কবিতা এইজন্য খ্যাতি লাভ করিয়াছে।

জাপানী কুমারীদের এই 'বর-ভিক্ষা' অনেকটা আমাদের দেশের হিন্দুকুমারীর শিবপূজার মত। এ প্রথা ঠিক ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধি নয়—জাতীয় বা দেশজ প্রথা। জাপানীদেরও অনেক প্রাচীন কুলদেবতা ও গৃহদেবতা আছে। এমনই এক দেবতার নিকটে এইরূপ প্রার্থনা যে কত কবিত্বময়, তাহার প্রমাণ এই কবিতায় পাইবে।

ছন্দ—'বাংলা কবিতার ছন্দ' দেখ।

৩। 'চেরী' ও 'চন্দ্রমল্লি' এই দুইটিই জাপানের দুই বিখ্যাত ফুল। 'চন্দ্রমল্লি' বা 'চন্দ্রমল্লিকা'র আর একটি দেশী নাম 'গুল্ দাউদী'; ইংরেজী নাম—Chrysanthemum. ১১। পাহাড়ের নির্জ্জন সানুদেশে, নিম্ন হইতে ঝরণার যে কলধ্বনি কাণে আসিয়া পৌঁছে, তাহার মত মৃদু ও মধুর আওয়াজ। ১৮। সে সুখে কোন তীব্রতা বা মাদকতা থাকিবে না। পরবর্ত্তী লাইনগুলিতে ইহার অর্থ আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে যে সহজ শান্ত মধুর ও উদার ভাব আছে—সে সুখও যেন সেইরূপ তৃপ্তির সুখ হয়। ২৭-২৮। বাস্তব জীবনের সকল ভাবনা-চিন্তার মধ্যেও যাহার সান্নিধ্য আমাকে সর্ব্বদা কবিতার রাজ্য স্মরণ করাইবে; অর্থাৎ হাত-পা মাটিতে বাঁধা থাকিলেও প্রাণ সর্ব্বদা সুন্দরের স্বপ্ন দেখিবে। ২৯-৩০। উপমাটি বড় সুন্দর—অর্থ বুঝিয়া দেখ। ৩৫-৩৮। এই কয়টি লাইনে, বৌদ্ধ ধর্ম্মবিশ্বাসের একটি সংস্কার—অতি গভীর ভাব-সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াছে। হিন্দুর মত বৌদ্ধগণও জন্মান্তরবাদী;

সেই বিশ্বাসেই কুমারী ওহারু তাহার ভবিষ্যৎ স্বামীকে জন্ম-জন্মান্তরের স্বামী মনে করিয়া গভীর প্রেম অনুভব করিতেছে। 'জন্ম-তোরণে—হারায়ে ফেলেছি'—অর্থাৎ "এ জন্মে পূর্ব্বজন্মের পরিচয় ভুলিয়া গিয়াছি—জনতার মধ্যে উভয়ে উভয়কে হারাইয়া ফেলিয়াছি; হৃদয়ে তাহার মূর্ত্তি আঁকা আছে, কিন্তু বাহিরে তাহার সাক্ষাৎ পাইতেছি না; --হে দেবতা, তুমি তাহাকে মিলাইয়া দাও।" ৪১-৪৪। এই লাইন কয়টিতে ভাবের সৌন্দর্য্য চরমে উঠিয়াছে। ৪৭-৪৮। প্রত্যেক স্তবকের শেষে এই যে দুইটি লাইন (ঈষৎ পরিবর্ত্তিত আকারে) বার বার ফিরিয়া আসিতেছে—এই 'refrain' বা 'আবৃত্ত-পদ' এ কবিতার সৌন্দর্য্য কিরূপ বৃদ্ধি করিয়াছে, তাহা লক্ষ্য কর। ইহার দ্বারা স্তবকের ছন্দ-সঙ্গীত যেমন মধুরতর হইয়াছে, তেমনই কুমারী পূজারিণীর মুখ ও বুকের সঙ্গে ফুলের সাদৃশ্য বার বার স্মরণ করাইয়া দেওয়াতে, তাহার সেই রূপের মতই—অন্তরের পবিত্রতা ও সৌকুমার্য্য কবিতাটির মধ্যে আমরা আগাগোড়া অনুভব করিতেছি।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা:—চিত্তহারিণী; অভিরাম; গোপন সানুর মর্ম্মরসম; বাসন্তী চাঁদ; কাব্যভুবনে জোছনার মত; নিদাঘের শ্যাম-ছায়া; অহরহ; জন্ম-তোরণে জন-অরণ্যে।

(৭৭)

একটি অতি সুন্দর 'নীতি-কবিতা'। যতগুলি বিষয়ে কবি উপদেশ দিতেছেন, তাহার প্রত্যেকটি ভাবিয়া দেখিবার মত। কেবল মাত্র ভগবানে ভক্তি রাখিয়া, নিঃস্বার্থ ও নিরহঙ্কার হইয়া, মানুষ যদি সংসারের কাজ করিয়া চলে, তবে সে সকল দুঃখ সকল অভাব সকল লাঞ্ছনা সত্ত্বেও, মানুষহিসাবে মহত্ত্ব লাভ করিবে—তার চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কি আছে? কবি কুমুদরঞ্জন একজন পরমভক্ত—বৈষ্ণব-ভাবের কবি; এই কবিতাটিতে আদর্শ বৈষ্ণব-সাধুর চরিত্র কিরূপ হয়, তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

ছন্দ—পর্ব্বভাগের ছন্দ; ছোট বড় লাইন আছে, তাহাদের পর্ব্বচ্ছেদ এইরূপ:—

যদি তুমি বশে | রেখে দিতে পার
চঞ্চল তব | চিত্তকে

পর্ব্বগুলি ৬ অক্ষরের, প্রথম লাইনে দুই পর্ব্ব আছে; দ্বিতীয় লাইনে একটি পূরা পর্ব্ব ও একটি ৪ অক্ষরের খণ্ডপর্ব্ব আছে। মিলগুলি প্রায়ই ডবল-মিল ('বাংলা কবিতার ছন্দ' দেখ)।

৩। ন্যাস—গচ্ছিত বস্তু; ভগবান তোমাকে তাঁহার কাজের জন্য খরচ করিতে দিয়াছেন; তোমার নিজের জন্য নয়; ১২। যতই বিফল হও, হতাশ হইবে না—মনে করিবে, একদিন না একদিন সিদ্ধিলাভ হইবেই। ২১। অলকা—কুবের-পুরী, যেখানে ধনরত্নের ছড়াছড়ি—কিছুরই কোন অভাব নাই। বাহিরে যাহা পাও নাই, অন্তরের সন্তোষ-ভাবের দ্বারা তাহার দুঃখ দমন করিতে পারো। তুলনীয়—

The mind is its own place, and in itself
Can make a heaven of hell, a hell of heaven.
—Milton.

৩৩-৩৪। চারিদিকে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, কলহ-বিবাদ হইতেছে—তথাপি তোমার কেহ শত্রু নাই বলিয়া তুমি নির্ভয়ে দুয়ার খুলিয়া ঘুমাইতে পারো। ৩৫-৩৬। পরে যতই অত্যাচার অপমান করুক—নিজের কাছে নিজে যদি নিরাপদ থাক, তবে তাহা সহ্য করিতে পারিবে। ৩৯। উপমাটির অর্থ কি? 'পান্থ-পাদপ' কাহাকে বলে? ৪০। ক্ষীর—দুগ্ধ। ৪১-৪২। বাক্যটি বড় সুন্দর হইয়াছে—অতিশয় অল্প কথায় একটি গভীর অর্থ প্রকাশ করা হইয়াছে। 'ভাব, ভাষা ও কর্ম্মকে'—অর্থাৎ 'কায়মনোবাক্যে'। যাহা যথার্থ মনে ভাবিয়াছ তাহাই বলিবে, এবং যাহা বলিবে তাহা করিবে। পরশ-মাণিক—কাহাকে বলে?

ভাষা ও শব্দশিক্ষা :—ন্যাস; চিরাগত; অলকা; বিগ্রহ; আতুর; পরশ-মাণিক।

(৭৮)

এই কবিতাটিও কবি কুমুদরঞ্জনের কবিত্বের একটি উৎকৃষ্ট নমুনা। কবিতার ভাবটি এই যে—প্রাণের সরল বিশ্বাস ও সত্যকার উক্তির আবেগে অশিক্ষিত ব্যক্তিও এমন কথা বলিতে পারে, যাহা পণ্ডিতেরা বহু শাস্ত্র পড়িয়াও তেমন সরল অথচ গভীরভাবে

উপলব্ধি করিতে পারেন না। যুক্তি বা তর্কে যাহাকে ধরা যায় না—প্রাণের অকপট বিশ্বাসে তাহা অন্তরের সত্য হইয়া উঠে।

ছন্দ—পূর্ব্বের কবিতার মত; কেবল দ্বিতীয় লাইনের খণ্ড পর্ব্বটি ৪ অক্ষরের পরিবর্ত্তে দুই অক্ষরের, যথা—

শুভ ফাল্গুনে | দেখা হ'ল মোর
এক কৃষকের | সাথে

১৩। ধর্ম্মরাজ—গ্রাম্য দেবতা। দেয়াসী—মন্দিরের পূজারী বা পাণ্ডা। ২০। একটি চল্‌তি বচন, অর্থ—অতিশয় নির্ব্বোধ। ২২। ফোঁটা—দোপাটি ফুলে, এক রঙের উপরে আর এক রঙের ছোট ছোট দাগ থাকে। ২৪। গরদ গোটা—একখানি আস্ত গরদের কাপড়; কলাগাছের বাকলগুলি (গায়ের ছাল) ছিঁড়িলে রেশমের মত সূতা বাহির হয়। ২৩-৩০। পিতে—পিতা; কৃষক বলিতেছে—পিতা কেবল ভরণ-পোষণ করিতে পারে; কিন্তু মা না হইলে এমন স্নেহে, এমন রং-বেরঙের পোষাক পরাইয়া সন্তানকে সুন্দর করিবার চেষ্টা করে কে? অতএব, যিনি এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি নিশ্চয়ই পিতা নহেন—জননী। এই সঙ্গে ৪১-৪৪ পংক্তিগুলি পড়। ৪৯-৫২। চণ্ডীপাঠ—চণ্ডী বা শক্তিরূপিণী পরমেশ্বরী (ঈশ্বরের মাতৃরূপ)—শাক্ত-সাধকদিগের ইষ্টদেবতা। ইহার মাহাত্ম্য-বর্ণনা আছে যে সংস্কৃত পুরাণে, তাহার সেই অংশ পাঠ করাকে 'চণ্ডীপাঠ' বলে। কবি বলিতেছেন—তোমার এই মাঠই পবিত্র ধর্ম্মশিক্ষার স্থান, এবং তুমি তোমার অন্তরের পুঁথিতে সত্যকার 'চণ্ডীপাঠ' করিয়াছ।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা :—দেয়াসী; ঘুন্সী; পানা; ফুল-কাটা; দোলাই।

(৭৯)

কবিতাটির মূল মর্ম্ম এই দুই লাইনে আছে—

সহেনা প্রাণে ওগো আসিয়া চলে' যাওয়া।
পাওয়ার চেয়ে ভাল ছিল যে পথ-চাওয়া॥

সকল উৎসব, সকল মিলন-মেলার অবসানে হৃদয় যখন শূন্যতার বিষাদে ভরিয়া উঠে তখন মনে হয়, উৎসবের আশায় আমরা অধীর হইয়া উঠি বটে, কিন্তু যতক্ষণ সেই দিন

না আসে ততক্ষণই ভালো ; আসিয়া যখন শেষ হইয়া যায়, তখন প্রাণ আরও নিরানন্দ হইয়া পড়ে, মানুষের প্রাণের এই অবস্থাটি কয়েকটি চিত্র ও উপমার দ্বারা অতিশয় স্পষ্ট করিয়া তোলা হইয়াছে।

ছন্দ—পর্ব্বভাগের ছন্দ ; প্রতি ভাগে—(৩+৪) এইরূপ ৭ অক্ষরের পর্ব্ব আছে, যথা—

যেতেছে + পায়ে-পায়ে | মুছিয়া + আলিপনা (৩+৪ | ৩+৪)

—'কবিতার ছন্দ' দেখ।

১। ধূলোট—(ধূলায় লুট) বৈষ্ণবদের উৎসবে, সঙ্কীর্ত্তনের শেষে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়া যে ধূলা-মাখা হয়, তাহাকে 'ধূলোট' বলে। ২। ঠোঙা—কোন কোন অঞ্চলে যাহাকে 'ঠোস' বলে। ১৩-১৪। চমৎকার উপমা। রাকা—পূর্ণিমা।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা :—ধূলোট ; রাকা-শশী।

(৮০)

কবিতাটির মর্ম্মার্থ কিছু গভীর বলিয়া, একটু মনোযোগ সহকারে পাঠ কর। বসন্তের বনভূমি ফুলে ও পল্লবে সহসা শোভাময় হইয়া উঠে ; কোকিলের ঝঙ্কার এবং ফুলের মধু, বর্ণ ও সৌরভ—সকলই সেই বসন্তের প্রসাদে। কোকিল আম্রমুকুলের মধুপান করিবার পূর্ব্বে ভাবিয়াছিল, সেই মধু আম্রমুকুলেরই প্রসাদ, তাই তাহার জয়গান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল। কিন্তু মধুপান করিয়া তাহার প্রাণে এমন একটি উদ্দীপন হইল যে, সে আম্রমুকুলের গৌরব বিস্মৃত হইয়া, বসন্তের জয়গান করিতে লাগিল। তাহাতে আম্রমুকুলের নিকটে তাহার সত্যভঙ্গ হইল বটে, কিন্তু এই বলিয়া সে তাহাকে বুঝাইল যে, তাহার মধুপান করিয়া সে যে একেবারে বসন্তের বন্দনা করিয়া ফেলিল, ইহাতে মধুরই গৌরব বাড়িয়া গেছে। মর্ম্মার্থ :—সৃষ্টির যত কিছু সুন্দর ও সুস্বাদ বস্তু—তখনই আমরা যথার্থরূপে ভোগ করি, যখন তাহার আবেগে স্রষ্টার মহিমা কীর্ত্তন না করিয়া পারি না।

ছন্দ—পদভাগের ছন্দ ; পয়ারের মত মিলযুক্ত ১৮ অক্ষরের চরণ।

কবিতাটির নাম অতিশয় যথার্থ হইয়াছে ; 'যথাগত' অর্থে, যাহা আপনা হইতে আসিয়া পড়ে—ইচ্ছা করি বা না করি।

২। সমধিক—প্রচুর। ৭। বঞ্চক—একটা বড় গালি। ৮। আচারে-প্রচারে—কাজে ও কথায়। ৯। মধু-দিব্য-উদ্দীপনা—মধুপান করিয়া শুধুই একটা দৈহিক উত্তেজনা নয়—'দিব্য-উদ্দীপনা' অর্থাৎ, অন্তরের অন্তরে স্বর্গীয় ভাবের প্রেরণা।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা—চূত-মুকুল ; অহর্নিশি ; মঞ্জু ; দিব্য-উদ্দীপনা।

(৮১)

কবি কিরণধন চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার দুইটি লক্ষণ সহজেই চোখে পড়ে ; প্রথম,—এখানকার এই দুই কবিতায় যেমন (পরের কবিতা দেখ), তেমনই, প্রায় সর্ব্বত্র, তিনি সকল শিক্ষা, সকল সভ্য-আদর্শ ও সামাজিক রীতিনীতির আবরণ ভেদ করিয়া মানুষের প্রাণের সুস্থ ও সহজ প্রবৃত্তি, হৃদয়ের অকপট ভাব সন্ধান করিয়াছেন ; মানুষের সেই হৃদয়ের সৌন্দর্য্য, দেহের স্বাস্থ্য ও প্রাণের শক্তি অপেক্ষা আর কোন মহিমা তিনি স্বীকার করেন না। এই কবিতাটিতে তিনি যে একটি বালক-চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, সমাজের চক্ষে সে নিশ্চয় 'ভালো ছেলে' নয়, কিন্তু কবি তাহাকে কোন্ চক্ষে দেখিয়াছেন, কবিতাটি পড়িলেই বুঝিতে পারিবে। দ্বিতীয় লক্ষণ এই যে,—তিনি, খাঁটি কথ্যবুলি বা মুখের ভাষায়, এবং ছড়ার ছন্দে কবিতা লেখেন ; ইহাও যে তাঁহার ঐ আদর্শেরই উপযুক্ত, তাহা বুঝিতে পারিবে। এ বিষয়ে কবি বিহারীলালের সহিত তাঁহার কিছু সাদৃশ্য আছে।

ছন্দ—ছড়ার ছন্দ ; প্রতি লাইনে চারিটি পর্ব্ব আছে—শেষেরটি খণ্ডপর্ব্ব (তিন অক্ষর) ; যথা—

মন্দ ছেলে | বোলে আমার | রট্‌ল পাড়ায় | অখ্যাতি।

৪। শুধু মাথায়—যেমন 'শুধু হাতে' ; তুলনীয় 'খালি পায়ে'। ঝম্‌ঝমে—খুব ভারি বৃষ্টি ('ঝম্ ঝম্'—বৃষ্টির শব্দ)। ৫। রোদে যখন কাঠ ফাটে—ইহাও ভাষার রীতি বা idiom ; ব্যবহার সম্বন্ধে সাবধান হইবে। ৬। রক্তমুখে—অধিক পরিশ্রমে বা উত্তাপে মুখ লাল হইয়া উঠে ; ইহাও চল্‌তি বুলি (ভূমিকা দেখ)। ১৩-১৪। পরের শাস্তি আপনার মাথায় তুলিয়া লওয়া—বালক-বয়সেও এরূপ মহত্ত্ব

প্রশংসনীয়। ১৫। নাম-কাটা সেপাই—অতিশয় চল্‌তি কথা ; মূল অর্থ—পদচ্যুত সৈনিক : চল্‌তি অর্থ—দলচ্যুত, নিষ্কর্ম্মা। ২৩। বুকের রক্ত জল-করা—এখানেও ভাষার কথ্যরীতি লক্ষ্য কর। কথ্য বাংলাতেও কয়েকটি শব্দের সমাস করিয়া কেমন একটি পদ করা যায়, তাহার দৃষ্টান্ত। 'যে বিদ্যার পরিমাণ বাড়াইবার জন্য বুকের রক্ত জল করিতে হয়'—অর্থাৎ, দেহ ও মনের সার অংশ ক্ষয় করিতে হয়। এখানে 'জমা' কথাটির একটু বিশেষ অর্থ আছে ; কৃপণ যেমন কেবল 'জমা' করে, অর্থের সদ্ব্যয় তাহার লক্ষ্য নয় ; তেমনই, এ বিদ্যারও কোন উপযুক্ত ব্যবহার হইবে না—যাহারা চাকরী বা দাসত্ব করিবে, তাহাদের এত বিদ্যার প্রয়োজন কি ? শেষ চারিটি লাইনেই কবিতাটির মর্ম্মার্থ রহিয়াছে ;—চিত্তের স্বাধীনতাই মনুষ্যত্বের মূল—তাহাই যদি না থাকে, তবে শিক্ষার গর্ব্বও যেমন, ধন-সম্পদের অভিমানও তেমনই—অতিশয় নিরর্থক।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা :—(ভাষার চল্‌তি রীতির দৃষ্টান্তগুলি অভ্যাস কর)।

(৮২)

এ কবিতাটিতেও কবির সেই এক আদর্শ (পূর্ব্ব কবিতার মত) লক্ষ্য কর। সভ্যতা, অর্থাৎ, বিদ্যা ও বুদ্ধির উন্নতির দ্বারা, মানুষ পৃথিবীর যে অবস্থা করিয়াছে, তাহা অপেক্ষা বিদ্যাহীন বুদ্ধিহীন বর্ব্বরতাও ভাল ছিল। এখানেও কবি অতিশিক্ষিত সভ্য-জীবন অপেক্ষা অশিক্ষিত স্বাভাবিক জীবনের পক্ষপাতী ; বৈজ্ঞানিক কলকজার সহিত হৃদয়-হীনতার যোগে পৃথিবীব্যাপী যে ভীষণ দারিদ্র্যের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে মানুষের বংশ লোপ পাইবে বলিয়া কবি ক্ষোভ ও দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। [(৯০) কবিতা দেখ]

ছন্দ—ছড়ার ছন্দ ; ছোট ও বড় লাইনের চৌপদী স্তবক। বড় লাইনে চারিটি পূরা পর্ব্ব, এবং ছোট লাইনে দুইটি পূরা ও একটি খণ্ডপর্ব্ব আছে।

৮। রাগের মাথায়—ক্রোধের বশে (কথ্য-ভঙ্গি লক্ষ্য কর)। ৯। সটান—সোজাসুজি, তৎক্ষণাৎ। ১-১১। আধুনিক যুদ্ধরীতি। ১৬। কায়দা—কৌশল, পদ্ধতি। ১৯। গাইছে সাফাই—(চল্‌তি ভাষা) ; দোষ নাই, প্রমাণ করিতেছে। ২০। বো'য়ে—বই-তে, পুস্তকে। ২১-২৪। হত্যা করা বরং ভাল, অন্নগ্রাস কাড়িয়া লওয়াই ইহাদের দারুণতর অত্যাচার। 'হাতে মারা' ও 'ভাতে মারা'—এই দুইটি কথা এক সঙ্গে ব্যবহার হইয়া থাকে ; অর্থ মনে রাখ।

২৮। খাচ্চে—'খাওয়া' ক্রিয়াপদের এইরূপ ব্যবহার লক্ষ্য করিবে; যেমন—'হোঁচট্ খাওয়া', 'হিম্‌সিম্ খাওয়া', 'খাবি (নাভিশ্বাস) খাওয়া' ইত্যাদি। ২৯-৩২। হৃদয়-হীনের যুক্তি। ৪০। রক্ত কোরে জল—আগের কবিতা দেখ। 'কাঁচা'—তাজা, সুস্থ। ৪৭। আস্‌মান-জমি ফারাক—('আস্‌মান-জমিন্') একটি চল্‌তি বচন—আকাশ ও মাটির মধ্যে যতখানি ফাঁক, বা তফাৎ। ৫১। ছারেখারে যাক—চল্‌তি বচন; 'ধ্বংস হউক'। ৫৫। 'ভেজাল' ও 'মেকি'—অর্থ প্রায় এক হইলেও, দুয়ের মধ্যে যে তফাৎ আছে তাহা মনে রাখিও। ৫৯। কলের যত ধূলোর ধোঁয়ায়—বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে ধনী ব্যবসায়ীরা কল-কারখানা স্থাপন করিয়া সকল শ্রমশিল্পীর স্বাধীন জীবিকা হরণ করিয়াছে। শেষ তিনটি স্তবকের ভাব অনেকটা এইরূপ :—

To her fair works did Nature link
The human soul that through me ran;
And much it grieved my heart to think
What man has made of man.

—*Wordsworth.*

ভাষা ও শব্দশিক্ষা :—কাক শকুনের লীলাভূমি; আগা-গোড়া; বীজাণু; চর্ব্ব-চোষ্য; নাভিশ্বাস; ভারে ভারে; সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা; পরাণ-পাখী; বিষিয়ে ওঠে; জ্যান্ত।

(৮৩)

কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের নূতন কাব্য 'সায়ম্' হইতে। কবিতাটিতে মহাভারতের মহানায়িকা দ্রৌপদীর দৃপ্ত নারীমহিমা বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার পিতা কুরুবংশের ধ্বংস-কামনায় যে অগ্নিতে আহুতি দিয়াছিলেন দ্রৌপদী সেই যজ্ঞের অগ্নি হইতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার অপর নাম 'যাজ্ঞসেনী'। মহাভারতের কাহিনী দেখ। কুরু-পাণ্ডবের মধ্যে যে জ্ঞাতিবিরোধের ফলে, কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে ভারতের পুরুষসমাজ বা ক্ষত্রিয়শক্তি প্রায় নির্ম্মূল হইয়াছিল, সেই বিদ্বেষ-অগ্নি নানাভাবে বর্দ্ধিত ও অবশেষে প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল এই দ্রৌপদীর কারণে। সভামধ্যে দ্রৌপদীকে টানিয়া আনিয়া ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ তাঁহার দারুণ লাঞ্ছনা করিয়াছিল; অগ্নিশিখা হইতে জন্মিয়াছিল

যে অগ্নি-স্বরূপা নারী, তাহার অন্তরের সেই অপমান-দাহই কুরুক্ষেত্রে সর্ব্বনাশের আগুন জ্বালিয়াছিল; সে অগ্নিতে পাণ্ডবদের শাস্তিও অল্প হয় নাই, তাহাদেরও প্রায় বংশ-লোপ হইয়াছিল। কবি মহাভারতের সেই ভীষণ পরিণাম-কাহিনীর মূলে এই সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন যে, দ্রৌপদী সমগ্র নারীজাতির প্রতীক বা প্রতিনিধি; নারীর মধ্যে যে তেজ প্রচ্ছন্ন আছে, সেই তেজ—নারীর প্রতি পুরুষের অসহ অবিচার ও অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার জন্যই—দ্রৌপদীরূপে মূর্ত্তি ধরিয়াছিল। দ্রৌপদী যেন প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত বিধাতার হস্তে সেই মহা অপরাধের দণ্ড-স্বরূপ—তিনি কাহারও কন্যা, বা পত্নী, বা জননী নহেন। এই কবিতায়, অতি সাধারণ ছন্দে—কেবল ভাষার গুণে—ভাবের অনুরূপ যে প্রখরতা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা লক্ষ্য কর।

ছন্দ—দীর্ঘ চরণকে দুই ভাগ করিয়া দুই লাইনে সাজানো হইয়াছে। পর্ব্বভাগের ছন্দ। পূরা চরণের পর্ব্বচ্ছেদ এইরূপ :—

'কে তাপস প্রতি | হিংসা-যজ্ঞে || কৃষ্ণবর্ত্মে | ঢালিল হবি'—

সর্ব্বশুদ্ধ চারিটি পর্ব্ব; শেষ পর্ব্বটি ৫ অক্ষরের, বাকিগুলির অক্ষর-সংখ্যা ৬।

কৃষ্ণা—দ্রৌপদীর একটি নাম; আরও নাম—পাঞ্চালী, যাজ্ঞসেনী।

৬-৭। রাত্রির আরম্ভ—অর্থাৎ, সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইল। 'জতুগৃহ'—(মহাভারতের গল্প দেখ)। 'স্বয়ংবর'—(১১) কবিতা দেখ। ১৪-১৫। তুমি সর্ব্ব-বিষয়ে নির্ব্বিকার, কারণ তুমি নিয়তি-স্বরূপা—সে কথা মহাভারতের ব্যাসও বোধ হয় জানিতেন না। ১৭। জুয়া হারি—জুয়ায় হারিয়া (কথ্যরীতি—'জুয়া হারি')। ২৮-৩১। ভাষা লক্ষ্য কর। তোমার চক্ষের রোষবহ্নি যেন কালো-মেঘের মধ্যে বিদ্যুতের মত জ্বলিয়া উঠিল; তোমার মনে হইল, পৃথিবী ঘুরিতেছে,—সমস্ত আকাশ যেন উল্টাইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ, সেই দিন হইতে তোমার হৃদয়ে প্রলয়ের বাসনা জাগিল। ৩৩। প্রলয়-বন্যার তরঙ্গের উপরে চড়িয়া সকলকে ধ্বংসের মুখে টানিয়া লইয়া চলিয়াছ। ৩৪-৩৫। পঞ্চ পাণ্ডবকে তোমার নিজের সঙ্কল্পসাধনে নিযুক্ত করিয়াছ—তাহাদের যেন কোন স্বতন্ত্র ইচ্ছা নাই, অন্ধভাবে তোমার দ্বারা শাসিত ও চালিত হইতেছে। পাঁচ-তুরঙ্গী মনোরথ—এই বাক্যখণ্ডের (phrase) একটি পুরাতন অর্থও আছে :—পাঁচ ইন্দ্রিয়ই পাঁচটি তুরঙ্গ (অশ্ব)—দেহের রথে তাহারা যুক্ত হইয়া

আছে, সেই পঞ্চ-অশ্বযুক্ত রথকে মনই চালনা করিয়া থাকে। ৩৯। আরুণি—অরুণ-পুত্র—কর্ণ। 'অরুণ'—সূর্য্যের সারথি; কবি, এখানে অরুণকেই সূর্য্য ধরিয়া, সূর্য্যপুত্র 'কর্ণ'কে 'আরুণি' বলিয়াছেন। ৪৬-৫১। দুঃশাসন দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করিয়াছিল; এজন্য দ্রৌপদী প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন—দুঃশাসনের বক্ষরক্তে রঞ্জিত না করিয়া সেই কেশ বন্ধন করিবেন না; তাই—'মুক্তবেণী'; দ্রৌপদীর দেহ যেন অগ্নি, এবং মস্তকের কেশপাশ সেই অগ্নিশিখার শিখরে পুঞ্জধূমের মত। রক্তসন্ধ্যা—ভয়ঙ্কর সন্ধ্যা। ভগ্ন-উরু—দুর্য্যোধন। ৬০। মহাপথে—মহাপ্রস্থানের পথে; (মহাভারত দেখ)। ৬৪-৬৭। আবার কি ভারতে সেই দিন আসিয়াছে?—নারীর প্রতি পুরুষের পাপ আবার পুঞ্জীভূত হওয়ায় সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য আবার কোন্ যজ্ঞের অনলে তোমার আবির্ভাব আসন্ন হইয়াছে? 'কৃষ্ণসখি'—কৃষ্ণের প্রিয়পাত্রী।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা :—কৃষ্ণবর্ত্ম; চীরবাস; জতুগৃহ; দৌবারিক; দিক্‌চক্র; পাঁচ-তুরঙ্গী মনোরথ; বন্না; উপচার; দেউল; হাতছানি; যুগের শঙ্খ।

(৮৪)

এই কবিতাটি কবি যতীন্দ্রনাথের একটি উৎকৃষ্ট কবিতা—তার কারণ, উপযুক্ত ভাষা, উৎকৃষ্ট বর্ণনাশক্তি, এবং আবেগপূর্ণ উচ্চ কল্পনা, এই সকলই যেমন এই কবিতাটিতে রহিয়াছে, তেমনই, যতীন্দ্রনাথের কবিতায়, ভাবনার যে একটা নূতন ভঙ্গি উৎকৃষ্ট কল্পনায় মণ্ডিত হইয়া বাংলা কাব্যের বৈচিত্র্যসাধন করিয়াছে—ভাবনার সেই ভঙ্গি এই কবিতায় অতিশয় স্পষ্ট ও প্রাণময় হইয়া উঠিয়াছে। যতীন্দ্রনাথ মানুষের দুঃখকে অতিশয় সত্য ও বৃহৎরূপে দেখিয়াছেন; এই দুঃখই সৃষ্টির মূলে সর্ব্বশক্তিমান হইয়া বিরাজ করিতেছে—জগৎময়, মানুষের জীবনময়, ইহারই অলঙ্ঘ্য শাসন প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। আমরা যাহাকে সুখ বলি, যাহার কল্পনায় আনন্দ পাইয়া থাকি, তাহা মিথ্যা,—আমাদের চিত্ত অতিশয় দুর্ব্বল ও সুখলোলুপ বলিয়া আমরা সত্যকে চাপা দিয়া কেবলই মিথ্যার মোহ-পরবশ হই, যেন নিজকে ঘুম পাড়াইয়া স্বপ্ন দেখিতে চাই। কবি মানুষের দারুণ দুঃখকেই স্বীকার করেন, এবং জগতের সৃষ্টি-কর্ত্তাকে তাহার জন্য দায়ী করিতে চাহিলেও—এই দুঃখের রহস্য ভেদ করা ততটা সহজ বলিয়া মনে করেন

না। আমাদের দেশে বহু প্রাচীনকাল হইতেই, সৃষ্টি যে বড় দুঃখময়—এই চিন্তা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল; সেই দুঃখের কারণ কি, কেমন করিয়া তাহার উচ্ছেদ হয়, তাহার যৎপরোনাস্তি উপায়-সন্ধানও হইয়াছিল, এবং শেষে বুদ্ধ সে বিষয়ে চরম উপদেশ দিয়াছিলেন। অতএব, এই দুঃখ-বাদ আমাদের দেশে নূতন নয়; কিন্তু দুঃখকে ঠিক এইভাবে কবির চক্ষে আর কেহ দেখে নাই, তাহার প্রমাণ তোমরা এই কবিতাটিতেই পাইবে। এখানে কবি, একটি অতি অসহায় গরিব বৃদ্ধের দারুণ দুর্গতি বর্ণনা করিয়া শেষে সেই দুঃখী মানুষটির মধ্যে দুঃখের মহাদেব-মূর্ত্তি দেখিলেন। 'মহাদেব' হিন্দু পুরাণের একটি অতি উচ্চ ধ্যান-কল্পনার আদর্শ; তিনি মহাত্যাগী, শ্মশানে বাস করেন; তিনি মৃত্যুকে জয় করিয়াছেন, সৃষ্টির যতকিছু কটু ও তিক্ত নিঃশেষে পান করিয়াও তাঁহার কোন বিকার নাই—অর্থাৎ, সুখ-দুঃখ, মঙ্গল-অমঙ্গল, এবং সর্ব্ববিধ মমতা বা আসক্তির তিনি অতীত; তাই তিনি 'মহেশ্বর'—সকল দেবতার উর্দ্ধে তাঁহার স্থান। কবি এই কবিতায় সেই পৌরাণিক ভাবটিকে নূতন রূপে কল্পনা করিয়াছেন—তিনি সেই মহাদেবকে মহাদুঃখের দেবতারূপে দেখিয়া, মানুষের দুঃখকে একটি বিরাট মহিমা দান করিয়াছেন। তাঁহার নিজের হৃদয় দুঃখের দারুণ মূর্ত্তি দেখিয়া অশ্রুসাগরে উদ্বেল হইয়া উঠে—দুঃখ যে কেবল মানুষেরই দুঃখ, তাহা মনে করিয়া তিনি শান্তি পান না; যিনি সর্ব্বলোক-মহেশ্বর, তিনিও নির্ম্মম উদাসীন নহেন; দুঃখের বিষ পান করিয়া তিনিও নেশায় আচ্ছন্ন হইয়া আছেন। মানুষের যে দুঃখ—রোগ, শোক এবং দারিদ্র্য, এই তিনের চরম দুর্দ্দশা—মানুষকে মহাবেদনায় মূর্চ্ছিত করিয়া রাখিয়াছে, কবি তাহার পরম রূপটি এই মহাদেবের মূর্ত্তিতে আবিষ্কার করিয়া তাহাকে প্রাণের প্রণতি নিবেদন করিয়াছেন। এই দুঃখই মহাদেব, প্রত্যেক দুঃখী মানুষের দুঃখ তাঁহারই দুঃখ,—দুঃখীর মধ্যে তাঁহাকেই দেখ। এই দুঃখের হাত হইতে মহাদেবেরও নিষ্কৃতি নাই—কারণ, যতদিন সৃষ্টি আছে ততদিন দুঃখও আছে। অতএব দুঃখীর একটা গৌরব এই যে, তাহার সেই দুঃখ সত্য; যাহারা মিথ্যা-সুখে বঞ্চিত, তাহারাই সেই মহাদেবের দলভুক্ত। এই কবিতায়, কবি দরিদ্রকে 'নারায়ণ' না বলিয়া 'মহাদেব' বলিয়াছেন।

ছন্দ—৮ ও ১০ অক্ষরের লাইন—পদভাগের ছন্দ।

৪। ভাষা দেখ—একেবারে গদ্যের মত; ইহাও এ কবিতার এই প্রথম অংশের উপযুক্ত হইয়াছে; কারণ, কবি এক্ষণে অতিশয় স্বাভাবিক ভঙ্গিতে যেন একটি গল্প সুরু

করিয়াছেন। ১০। বাতিক—বায়ুঘটিত রোগ; প্রশমিতে—ঠাণ্ডা করিবার জন্য। ১৪। হাত যদি দাও—'হাত দাও' অর্থ—নামাইতে একটু সাহায্য কর; ভাষার কথ্য-রীতি (Idiom) লক্ষ্য কর। ১৬। কথ্য-ভাষার গুণ দেখ; অর্থের সঙ্গে ভাবটি কেমন চমৎকার প্রকাশ পাইয়াছে। ২৬। বুড়া আর একবার দয়া ভিক্ষা করিতেছে—কিন্তু স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারিতেছে না। ৩৬। এই লাইন হইতে কবিতার ভাষা ও ভাব হঠাৎ কিরূপ মোড় ফিরিয়াছে লক্ষ্য কর। ৩৯-৪১। 'কাব্য-ভালে'—কবিতার 'কপালে' অর্থাৎ 'ভাগ্যে'। আমার বেলায় কবিতা লিখিবার আর কোন ভাল বিষয় জুটিল না। ৪৭। রুদ্র-দেবতার যে ভীষণ নিষ্করুণ নৃত্যের ছন্দে চরাচর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে—তাহার সুর। ৪৮-৬৫। কবিতাটির এই অংশে কবিত্বের চূড়ান্ত হইয়াছে। মুখস্থ কর। 'নটরাজ' এক অর্থে 'মহাদেব' (নর্ত্তক-শ্রেষ্ঠ); এখানে সেই মহাদেবকেই আর এক অর্থে 'নটরাজ' বলা হইয়াছে, অর্থ—'নট' বা অভিনেতার মত, দুঃখের নিত্য নূতন সাজ করিতে যাহার মত আর কেহ নাই। 'অশ্রুর সাগরমন্থ'—অশ্রুসাগর-মন্থনকারী; দুঃখ সহ্য করিবার অসীম শক্তি যাহার (আরম্ভের কথাগুলি দেখ)। কবি মহাদেবের রূপকে চরম দারিদ্র্যের রূপ করিয়া তুলিয়াছেন। 'দিগম্বর' 'দিশাহীন', 'পথচর'—দরিদ্রেরই অবস্থা। মহাদেবের যে 'নেশা' (ভাঙ্ খাইয়া ভোর হইয়া থাকা)—এখানে তাহা দারুণ অনাহারের ফল, তাহারই জন্য মাতালের মত দেহ টলিতেছে। 'অন্তর-মশানে চিতা' ইত্যাদি—কত প্রিয়জনের মৃত্যুশোক অন্তরে জাগিয়া আছে ('মশান'—শ্মশান)। 'নির্ব্বাপিতা'—অর্থাৎ, সাক্ষাৎ জ্বলিতেছে না বটে, কিন্তু তাহাদের স্মৃতি মুছিয়া যায় নাই। 'হাড়ের মালা', 'ফণীর জ্বালা' প্রভৃতিরও কিরূপ নূতন ব্যাখ্যা হইয়াছে দেখ। মহাদেবের মাথায় জটার মধ্যে যে জাহ্নবী আছেন—তাহার ধারা উতলা হইয়াছে; চক্ষের অবিরল অশ্রুধারাই সেই জাহ্নবীর জল! 'কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী শেষে' ইত্যাদি—মহাদেবের ললাটে যে সরু চাঁদখানি দেখা যায়, তাহা শুক্লা-দ্বিতীয়া বা তৃতীয়ায় নব-শশিকলার মত পূর্ণিমা-রাত্রির সূচনা করে না; তাহা কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীর বিলীয়মান ক্ষীণ শশিকলা—ঘোর অন্ধকার অমাবস্যার পূর্ব্বাভাস। ৬৬-৭১। শেষ কয় পংক্তির অর্থ কি? কবি বলিতেছেন, তিনি দুঃখ-দেবতার পূজা করিয়া ধন্য হইয়াছেন। 'তামার চাকি'—পয়সা। ৭১। সোনা, বা অধিক অর্থ দিলে, সেই দেবতার অপমান করা হইত; কারণ, দুঃখের

শেষ কোথায় ? তোমার ওই মূর্ত্তিই ত মহাদেবের মূর্ত্তি !—মানুষের এমন স্পর্দ্ধা হইবে যে, ধনগর্ব্বে সে সেই বিরাট চিরন্তন দারিদ্র্যদুঃখকে দয়ার দ্বারা নিবারণ করিতে চাহিবে ? আমিও ত' সেই দুঃখীর দলে।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা :—শ্রবণমূলে ; নটরাজ ; সাগরমন্থ ; নীলকণ্ঠ ; দিগম্বর ; দিশাহীন ; মশান ; বিভূতি ; চাকি।

(৮৫)

এই কবিতাটি—গ্রন্থকারের নিজের রচনা ; এজন্য ইহার সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করা শোভন নয়। কবিতাটি কেমন, সে বিচার তোমরাই করিবে। ইহার কোনরূপ ব্যাখ্যাও আমি করিব না, তার কারণ শুনিলে তোমরা খুসী হইবে ;—আমার কবিতার একটা বড় দুর্নাম আছে যে, তাহা কেহ বুঝিতে পারে না ; তোমরা যদি কাহারও সাহায্য বিনা বুঝিতে পারো, তবে আমার সেই দুর্নাম দূর হইবে। অতএব তোমাদের নিজেদেরই খুব ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করা উচিত নয় কি ? তথাপি, তোমরা বুঝিতে পারিলে কিনা তাহা বুঝিবার জন্য, আমি একটু সাহায্য করিতে পারি। যেমন ;—শিউলির বাপ কুলীন এবং রুক্ষ-স্বভাব হইবে কেন ?—কোন্ সমাজের কুলীন ? বিয়ের আগেই 'গায়ে হলুদ'—কথাটা নিশ্চয় বুঝিয়াছ ? ২১-২২—এই দুই লাইনের অর্থ কি ? শিউলি স্বয়ম্বরা হইল—অর্থাৎ, নিজের পছন্দমত বরকে বিবাহ করিল—তাহাতে, তোমরা তাহার পছন্দ বা আদর্শ সম্বন্ধে কি বুঝিলে ? জ্যোৎস্নার চেহারা এবং তার বেশ-ভূষা ঠিক হইয়াছে কি ? ৩৫-৩৬। লাইন দুইটির অর্থ কি ? ৪১। নিশুত্ রাত—চল্তি ভাষায় 'রাত নিশুতি হয়েছে'। 'নিশুতি' (সংস্কৃত 'নিষুপ্ত' হইতে)—রাত্রের সেই প্রহর যখন চরাচর গভীর নিদ্রামগ্ন, নিস্তব্ধ (ইংরেজী—'dead of night')। ৬৭-৬৮। এই লাইন দুইটিরও অর্থ কি বুঝিলে? এই কান্না শিউলিকে এত মুগ্ধ করিল কেন ? কারণ এই নয় কি যে—ইহাতে শিউলি তাহাকে অতিশয় হৃদয়বান বলিয়া চিনিয়া লইয়াছিল ?—এ কান্না জগতের দুঃখে দুঃখ পাওয়ার কান্না।

ছন্দ—ছড়ার ছন্দ ; প্রতি লাইনে তিনটি পর্ব্ব, ও একটি—এক বা দুই অক্ষরের খণ্ডপর্ব্ব : যেমন—

সবাই্ তারে | ফেল্‌বে চিনে | শিউ্‌লি যে নাম্ | তার
বল যদি | দিন্ করি এই্ | মাসের একু | শে

[(১৩) লাইনের 'সেয়ানা তুমি'—এখানে ছন্দভঙ্গ হইয়াছে ; কারণ, ৪ অক্ষরের না হইয়া ৫ অক্ষরের পর্ব্ব হইয়াছে। পড়িবার সময়ে 'সেয়ানা' শব্দটি 'সেয়্‌না' এই রকম উচ্চারণ করিলে ছন্দ রক্ষা হইতে পারে। আশা করি, তোমরা এরূপ ছন্দভঙ্গ পছন্দ করিবে না।]

ভাষা ও শব্দশিক্ষা :—সমান ঘর ; একটু টেরে ; সেয়ানা ; টোপর ; জর্দ্দা ; নিশুতি রাত ; টের পাওয়া ; আব্‌ছা ; মাড়িয়ে ('পাড়িয়ে' নয়) ; গলায় দড়ি ; ছাদ্‌না-তলা।

(৮৬)

কবি কালিদাস রায়ের কবিতার দুই রূপ আছে। একটির আদর্শ সংস্কৃত ; তাহার ভাবে, ভাষায় ও রচনার ভঙ্গীতে—অতীত ভারতের কীর্ত্তি, ধ্যান ও জ্ঞান কীর্ত্তিত হইয়াছে ; আর একটি যে রূপ, তাহাতে বাংলার পল্লীপ্রকৃতি ও পল্লীজীবন অতিশয় সহজ সরল ভাষায়, খাঁটি বাংলা ভঙ্গিতে, চিত্রিত হইয়াছে। এই শেষের রূপটির পরিচয় তোমরা এই কবিতাটিতে পাইবে। পল্লী-জীবনের প্রতি এই মমতা আধুনিক কবিদের একটি সজ্ঞান কবিত্ব হইলেও—বর্ত্তমান কবি বহু কবিতায় পল্লীর বাস্তব সৌন্দর্য্য চিত্রিত করিয়াছেন ; এইরূপ অনেক চিত্রে তিনি কৃষ্ণের ব্রজলীলার মাধুর্য্য আরোপ করিয়া, পুরাতন বৈষ্ণব-ভাবের সুরটি নূতন করিয়া জাগাইয়াছেন,—তাহাতে বাংলার মাঠ-বাট একটি প্রীতিস্বপ্নময় কবিতার দেশ হইয়া উঠে। আধুনিক বাংলাকাব্যে, এই খাঁটি পল্লীপ্রীতি ও পল্লীজীবনের প্রতি মমতা, উচ্চাঙ্গের কাব্যশ্রীতে মণ্ডিত হইয়াছে আর দুইজন কবির দ্বারা, তাঁহারা—কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী ও কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক। বর্ত্তমান কবিতাটিতে, কবি কৃষ্ণের ব্রজলীলাকাহিনীর ছলে পল্লী ও নগরের তুলনা করিয়াছেন ;—কোথায় মানুষের সহিত প্রকৃতির সেই অকৃত্রিম প্রীতির সম্বন্ধ, আর কোথায়

নগরের সেই রাজপ্রাসাদ, ধনীসমাজ, এবং প্রীতিস্নেহহীন স্বার্থসিদ্ধির প্রতিযোগিতা! কৃষ্ণ তখন ব্রজলীলা শেষ করিয়া মথুরার রাজধানীতে গুরুতর কর্ত্তব্যসাধনের জন্য গমন করিয়াছেন—তাঁহার বাল্যসখা পল্লীর রাখালেরা সে সকল বড় ব্যাপার কিছুই বোঝে না; তাহারা কেবল ইহাই মনে করিয়া চিন্তাকুল হইয়াছে যে, পল্লীর এই স্নেহনিকেতন ছাড়িয়া কৃষ্ণ কতই না কষ্ট পাইতেছেন! ইংরাজীতে যাহাকে Pastoral কবিতা বলে—ইহা সেই জাতীয়।

ছন্দ—ছড়ার ছন্দের স্তবক; চরণগুলি অবিকল (৭৫) কবিতার মত; কেবল মধ্যের দুই লাইন একটু ছোট। স্তবকের লাইনগুলি কিরূপ সাজানো—মিলের রীতি, এবং মোট পংক্তি সংখ্যা,—তোমরা নিজেরাই বুঝিয়া লও।

২। গোকুল—গ্রামের নাম; গোয়ালাদের বসতি। ৬। জোট—কথাটি লক্ষ্য কর; চল্‌তি শব্দ, অর্থ—'অনেকগুলির একত্র হওয়া'। ১৮। বনমালা—বনফুলের মালা। ২৫। কালিদহ—একটি বৃহৎ 'দহ' বা গভীর জলাশয়ের নাম; এখানে কালিয় নামক সর্প বাস করিত; কৃষ্ণ সেই সর্পকে শাসন করিয়া জলাশয়টি নিরাপদ করিয়াছিলেন। আমাদের গ্রামের বৃহৎ দীঘিগুলি স্মরণ কর। ৩১-৩২। গ্রাম্য বালক-জীবনের একটি বাস্তব চিত্র। ৩৩। ধড়া-চূড়া—ধুতি ও চূড়া; কৃষ্ণের সাজসজ্জা—চূড়ার বা মাথার ময়ূরপুচ্ছযুক্ত কেশ-বন্ধনী হইতে একখানি বস্ত্র উড়ানির মত পৃষ্ঠদেশ ঢাকিয়া থাকিত।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা:—গোঠ; জোট; স্বেদকণা; ধড়া-চূড়া।

(৮৭)

একটি নূতন ভাবের সুন্দর কবিতা। মানুষের সমাজে ধনী-দরিদ্র অবস্থাভেদই মানুষকে অমানুষ করিয়া তোলে। কবিতার মর্ম্মার্থ:—দারিদ্র্য অপেক্ষা ধনীর অবজ্ঞাই অধিকতর দুঃখকর; ধনও সুখকর নয়,—যদি চতুর্দ্দিকে দরিদ্রের হাহাকার শুনিতে হয়। একদিকে আত্মসম্মানে আঘাত লাগে, আরেক দিকে হৃদয়ে আঘাত লাগে। ইহাই মানুষের মত কথা।

ছন্দ—স্তবকের মত হইলেও ঠিক স্তবক নয়—কবিতার দুই ভাগ। পদভাগের ছন্দ—সাধারণ ত্রিপদী (৩৭ কবিতা দেখ)।

৬। চল-নৃত্য—'চল' অর্থ—চঞ্চল, অতিশয় দ্রুত। ৭। সম্ভোগ-সুখ—'সম্ভোগ', শ্রেষ্ঠ ভোগ; যেমন, শুধুই ক্ষুধার অন্ন নয়—উৎকৃষ্ট অন্ন; শুধুই দেহের ভদ্র আচ্ছাদন নয়—অতিশয় মহার্ঘ, সুন্দর ও আরামদায়ক বেশ-ভূষা, ইত্যাদি। ১১। গিরির মেয়ে—নদী, স্রোতস্বিনী। ১৯-২০। রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতা স্মরণ কর—'হের ওই ধনীর দুয়ারে দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে'। ২৪। 'ঋতুরাজ' অর্থে 'বসন্ত'; 'পাখা না গুটায়' বলিলে 'কোকিল' মনে আসে; কবি হয়ত এই দুইকেই এখানে ভাবের অর্থে এক করিয়া লইয়াছেন। হঠাৎ যেন বসন্তঋতু বা আনন্দের দিন না ফুরায়।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা ঃ—কলতান; চল-নৃত্য; সম্ভোগ-সুখ; সোহাগ; ধিক্কার হানে; ঋতুরাজ; মুকুলিত লতিকা।

(৮৮)

এই কবিতাটিতে, কবি, ভারতচন্দ্রের ঈশ্বরী পাটনীর (১৬ কবিতা দেখ) পরিচয়টিকে আরও উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন—তাহার সেই সরল গ্রাম্য প্রকৃতির মধ্যে ভক্তি, সন্তোষ, এবং অলোভ—এই তিনটি মহৎ গুণ লক্ষ্য করিয়া তিনি তাহাকেই খাঁটি বাঙালী-চরিত্র হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। সেইজন্য, দেবীর কাছে তাহার যে সেই একটি প্রার্থনা—'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে' তাহাই, অল্পে-সন্তুষ্ট, স্নেহ-প্রবণ, শান্তিপ্রিয় পল্লীপরায়ণ বাঙ্গালী জাতির যথার্থ কামনা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ছন্দ—ত্রিপদী, পদভাগের ছন্দ; আগের কবিতাটির মত।

৩। নৌকা বাঁধি বটতলে—আমাদের দেশের খেয়াঘাটের বটগাছ স্মরণ কর। মাঝিরা সাধারণতঃ তাহাই করে। ৫। বসিয়াছে পাটে—এখানে ভাষার রীতি লক্ষ্য কর। ১২। অর্থাৎ আমি ত' তোর কাঠের সেঁউতিকে সোনা করিয়া দিয়াছি। ১৭। গাঙ্গিনী—ভারতচন্দ্রের কবিতায় এই নামই আছে—এখন ইহা অপ্রচলিত।

২০। দাগা পেয়ে—কথ্য-রীতি—বিশেষ অর্থ, 'হৃদয়ে আঘাত পাওয়া'। ২৮। প্রত্যয় না পাই—ইহাও একটি বাক্যভঙ্গি; 'বিশ্বাস হয় না', 'ভরসা পাই না'। ৩৬। দুধে ভাতে—পাটনী ইহার অধিক চায় না; ইহাও কম নয়—শাক-ভাত ও মাছ-ভাতের চেয়ে অনেক বেশি; 'দুধ-ভাত' অর্থে—যথেষ্ট স্বচ্ছল অবস্থা। ৩৭-৪০। একটি সুন্দর চিত্র। ৪৯-৫২। এই কথা কয়টিতে পাটনীর যে চরিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়া লইবে।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা :—পাটে বসিয়াছে; বলাকা; দাগা পেয়ে; সাধনভজন-হীন; অলক্ত-রঞ্জিত; দুধে-ভাতে।

(৮৯)

কবি নজরুল ইস্‌লামের একটি অতি উৎকৃষ্ট কবিতা বা গান। 'বাঙ্‌লা মা'র রূপ এমন করিয়া গানের আকারের বর্ণনা করিতে, এমন কবিত্বময় করিয়া তুলিতে আর কেহ পারেন নাই; কারণ এই কবিতায় আগাগোড়া 'বাংলা মা'র চেহারা যেমন একটি জীবন্ত নারীর মত হইয়া উঠিয়াছে, তেমনই, সেই নারীর বাহিরের ও অন্তরের প্রকৃতি সম্পূর্ণ সুসঙ্গত হইয়াছে; পরিচয়টিও বাস্তব এবং যথার্থ হইয়াছে। এই কল্পনাও এক রকমের Personification,—(৫৩) ও (৫৭) কবিতা দেখ; কিন্তু এখানে বাহিরের প্রাকৃতিক মূর্ত্তি অপেক্ষা ভিতরের ভাব-মূর্ত্তিটিই মুখ্য।

ছন্দ—ছড়ার ছন্দ; গান বলিয়া প্রথম দিকের লাইনগুলি কিছু ছোট। প্রথম লাইনের প্রথম শব্দটি ('আমার') ছন্দের বাহিরে ধরিতে হইবে। খণ্ডপর্ব্বগুলি সর্ব্বত্র সমান নয়, কিন্তু সাধারণতঃ তিন অক্ষরের, যথা—

(আমার) শ্যাম্‌লা-বরণ্ ৪ | বাঙ্‌লা মায়ের্ ৪ | রূপ্ দেখে যা ৪ | আয়্‌রে আয়্ ৩

বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের-চিত্র এই লাইনগুলিতে বড় সুন্দর ফুটিয়াছে—৯, ১০, ১১, ১৫, এবং ১৭। প্রাকৃতিক প্রতিবেশের সঙ্গে বাঙালীর ভাব-জীবনের যে গভীর যোগ আছে, বাঙ্গালীর গানের কয়েকটি সুরে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়; কবি তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন এই দুইটি লাইনে—৭ ও ১৮।

৭-৮। পশ্চিমবঙ্গের রুক্ষ শুষ্ক লাল মাটির দেশে (আসল রাঢ়-ভূমিতে) যে উদাস ভাবের রূপটি জাগিয়া থাকে, কবি সম্ভবতঃ তাহারই আভাস দিয়াছেন। বৈরাগ্যের গানও বাংলাদেশে অল্প রচিত হয় নাই। ১০। ঝারি—পূর্ব্বের (৬৯) কবিতা দেখ। ১১-১৯। এই লাইনগুলি মুখস্থ করিবে। সমস্ত কবিতাটিতে, একটি অতি কোমল, করুণ, স্নেহপ্রবণ ও ভাববিহ্বল প্রকৃতির পরিচয় স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে—বাঙালী-চরিত্রের পক্ষে ইহা সত্য। ১৩। বেদের সাথে সাপ নাচায়—বাংলার খুব আদিম সমাজের একটু আভাস। ১৫। বাংলার ভূমি সমতল বলিয়া আকাশের কিনারা পর্য্যন্ত দেখা যায়; সেইরূপ দৃশ্যের জন্য সন্ধ্যাতারার বড় শোভা হয়। ১৮। 'বাউল' ও 'ভাটিয়াল'—এই দুইটিই খাঁটি বাংলা গানের রূপ; ইহার সঙ্গে তোমরা 'কীর্ত্তন' যোগ করিয়া লইবে। এই প্রসঙ্গে কবি সত্যেন্দ্রনাথের এই দুইটি লাইনও স্মরণীয়:—

"কীর্ত্তনে আর বাউলের গানে আমরা দিয়েছি খুলি'
মনের গোপনে নিভৃত ভুবনে দ্বার ছিল যতগুলি।"

ভাষা ও শব্দশিক্ষা:—বৈরাগিনী বীণ্ বাজায়; মেঘের ঝারি; ভাটির স্রোত।

(৯০)

এই কবিতাটিতে কবি গভীর ক্ষোভের সহিত দারিদ্র্যের দহন-শক্তির বর্ণনা করিয়াছেন। এযুগে পৃথিবী জুড়িয়া অন্নাভাবের হাহাকার উঠিয়াছে—মনুষ্য-সমাজে কু-বিধি প্রবল হওয়ায়, বঞ্চিত বুভুক্ষুর দলই সর্ব্বত্র বৃদ্ধি পাইয়াছে। মানুষের সেই দুর্ব্বল দারিদ্র্য-পীড়িত অবস্থাকেই, কবি একরূপ বিষ-জ্বালার উদ্দীপনারূপে—এক মহাশক্তিরূপে—বন্দনা করিয়াছেন; আবার, নিরুপায়ভাবে সেই অমঙ্গলকে বক্ষে বরণ করিয়া দীর্ঘশ্বাসও ফেলিয়াছেন। এই কবিতার সহিত (৮৪) কবিতাটির তুলনা কর—এবং সেই কবিতার কল্পনা যে কত ভিন্ন, তাহাও লক্ষ্য কর। আরও তুলনীয়—(৮২)।

ছন্দ—১৪ অক্ষরের—পদভাগের ছন্দ; ইহাই আধুনিক পয়ার। ইহার লাইনগুলি মিলের জায়গাতেই থামে না—পরের লাইনের কোনখানে গিয়াও থামিতে পারে।

২-৩। খ্রীষ্টের সম্মান কণ্টক-মুকুট-শোভা—খ্রীষ্টের ললাট বিদ্ধ ও রক্তাক্ত করিয়া একটি কাঁটার মালা পরাইয়া, খ্রীষ্ট-শত্রুগণ তাহাই তাঁহার রাজমুকুট বলিয়া ব্যঙ্গ করিয়াছিল ; কিন্তু খ্রীষ্টের সেই বেদনা ও লাঞ্ছনাই তাঁহাকে জগৎপূজ্য করিয়াছে। ৪। যাহার কিছু নাই, এবং কোন আশাও নাই, তাহার সত্যকথা বলিতে কোন ভয় থাকে না। ৫। দর্পী তাপস—সব-হারানোতেই যাহার গর্ব্ব। ৬। আমার দেহের স্বর্ণ-কান্তিকে বিবর্ণ করিয়াছে। বিরস—মলিন, বিবর্ণ। ৭-১০। দরিদ্রের পক্ষে সর্ব্ববিধ রস-চর্চ্চা—প্রাণের উচ্চতর পিপাসা চরিতার্থ করা—অসম্ভব। ১২-১৬। দরিদ্রের বলবৃদ্ধি হয় দারিদ্র্যের জ্বালায়—অতএব দুর্ব্বল দরিদ্রের পক্ষে জ্বালাহীন অমৃত উপকারী নয়। ১৬। 'কালিয়' (বা 'কালীয়') নামক সর্প বৃন্দাবনে যমুনার এক 'দহে' বাস করিত ; এখানে সেই পৌরাণিক কাহিনীর ঈঙ্গিত (allusion) রহিয়াছে। ১৭-২৪। এখন দুর্ভিক্ষের আর কালাকাল নাই ; সেই দারুণ অন্নাভাবে পৃথিবীময় যেন একটা পৈশাচিক নরমেধ-যজ্ঞ চলিতেছে, এবং ক্ষুধাতুর মানুষের দল আক্রোশের বশে ধনীদের যত-কিছু শ্রী ও সম্পদ ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছে। ২৫-২৭। দারিদ্র্য মানুষকে যতই কঠিন করিয়া তুলুক, এক জায়গায় হৃদয়কে বড় দুর্ব্বল করে—যখন সেই দারিদ্র্যকে সে স্ত্রী-পুত্রের চক্ষে অশ্রুধারারূপে দেখিতে পায়। ২৯। আগমনী—দুর্গাপূজার 'আগমনী'—অর্থাৎ, উৎসবের আনন্দ-গান ঃ দরিদ্রের কানে তাহাও ক্রন্দনের মত শোনায়।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা ঃ—দুরন্ত সাহস ; বুভুক্ষু ; করপুট ; কল্লোলক ; মৃত্যুপথ-যাত্রিদল ; কিরীট।

(৯১)

এই কবিতাটিতে কবি সাধারণ সত্যকে উণ্টাইয়া কতকগুলি বিপরীত উপমার সাহায্যে একটি গভীর অনুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। কবিতার মর্ম্ম বুঝিবার জন্য তোমরা আলোর যতকিছু গুণ তাহা অন্ধকারের উপরে আরোপ করিয়া লইবে, তাহা হইলেই কবির বক্তব্য অনেকটা স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। আলো চোখ ধাঁধিয়া দেয়, তাই কবির নিকটে তাহাই অন্ধকার ; আবার, অন্ধকার চোখ জুড়াইয়া দেয়, তাহাতে দৃষ্টি

প্রাণ যে-মমতায় বিহ্বল সেই মমতাই এই কবিতার ছন্দে ও সুরে উৎসারিত হইয়াছে। এই কবিতার ছন্দের অনর্গল গতি লক্ষ্য কর। এই কবির ছন্দরচনা-শক্তির পরিচয় পাইবে—তাঁহার 'পথ চলতে ঘাসের ফুল' নামক ক্ষুদ্র কাব্যখানিতে।

ছন্দ—এই কবিতার ছন্দ আগাগোড়া এক নয়, তাহা লক্ষ্য কর। প্রথম কয়েক লাইন (১—৭) পয়ারের ত্রিপদী; তাহার প্রথম দুই পদে চার অক্ষরের দুইটি পর্ব্ব, তৃতীয় পদটিতে একটি তিন অক্ষরের খণ্ডপর্ব্বও আছে। ইহার পর, হঠাৎ কবিতার ছন্দ পরিবর্ত্তন হইয়াছে;—সেই ত্রিপদীই বটে, কিন্তু এবার তাহাতে আট অক্ষরের 'পদভাগ' দেখা দিতেছে, শেষের পদগুলিতে একটি অতিরিক্ত দুই অক্ষরের শব্দ আছে—তাহার দ্বিতীয় যুক্তাক্ষর। পদভাগের ছন্দে যুক্তাক্ষরের গণনা এক অক্ষরের মত, কিন্তু এই শব্দগুলি মিলের শব্দ বলিয়া এগুলিতে ছন্দ অপেক্ষা মিলেরই ঝঙ্কার বাড়িয়াছে—কেবল শেষের দিকে ছন্দ একটু দোল খাইতেছে। এইরূপ কৌশল সত্ত্বেও মূল ছন্দের জাতি ঠিক থাকে, অর্থাৎ, চরণের আর কোথাও (পর্ব্বভাগের মত) যুক্তাক্ষরের পৃথক হিসাব আবশ্যক হয় না। এ যেন পদভাগ-ছন্দেরই একটু বৈচিত্র্য—তাহাও ঐ মিলের শব্দগুলিতেই সম্ভব। কবিতার হঠাৎ এই ছন্দ-পরিবর্ত্তন বোধ হয় কবির অজ্ঞাতসারেই ঘটিয়াছে, তাহাতে তোমাদের একটা বড় শিক্ষার সুবিধা হইল। কারণ, তোমরা লক্ষ্য করিবে, প্রথম কয় ছত্রের ছন্দ কথোপকথনের ভাব ও ভাষার উপযোগী হইয়াছে; কিন্তু তার পরে, কবিতায় বর্ণিত আকস্মিক ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে—ভাবও যেমন সহসা অন্যরূপ—ছন্দের সুরও তেমনই গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে, তোমরা কবিতার ভাবের সঙ্গে তাহার ছন্দের সম্বন্ধ কত ঘনিষ্ঠ তাহা বুঝিতে পারিবে।

২। গড় করি'—প্রণাম করিয়া। ৮। শন্ শন্—এইরূপ শব্দ বাংলা ভাষার অনেক আছে; এই কবিতায় আর একটি পাইবে—'ছম্ ছম্'; বইখানিতে আরও অনেক আছে, তাহা দেখাইয়াছি। এগুলিকে ঠিক জায়গায় ঠিক মত ব্যবহার করিতে না পারিলে অতিশয় হাস্যকর ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। এজন্য, কোথায়, কি অর্থে ব্যবহার হয়, তাহা ভাল করিয়া দেখিয়া লইবে। ১৩। বন্ধ্যা—নিষ্ফলা; (এখানে) যে সময়ে সকল কাজ বন্ধ করিতে হয়। ১৪। সহসা শুনিনু সুর—কানে-শোনা কথা নয়—অন্তরের মধ্যে একটা সুর বাজিয়া উঠিল! (উপরের মন্তব্য দেখ)। ২৯। যাপিব কি—এই 'কি'র ব্যবহার লক্ষ্য কর। যেমন—'ঘরের মধ্যে প্রবেশ

করিব কি—দুয়ার তালাবন্ধ', অথবা, 'ছুটিয়া চোর ধরিবে কি—ভয়েই অস্থির;' ইহা কথ্য-রীতির একটি ভঙ্গি—অর্থ, "কেমন করিয়া" (ক্রিয়া-বিশেষণ)। পর্ব্ব—নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সময়।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা :—বন্ধ্যা; ছম্ ছম্ করে গাত্র; দেউল; বিভাবরী; আগার; টীকা-ভাষ্য।

(৯৩)

এই কবিতা ও পরের দুইটি একসঙ্গে পড়; পড়িলে বুঝিতে পারিবে, পূর্ব্বের সকল কবিতার সঙ্গে ইহাদের তফাৎ কোথায়। এই কবিতাগুলির ভাব, ভাষা ও কল্পনা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের নয় কি? সকল দেশেই এইরূপ কৃষকের গান, বা পল্লীর অশিক্ষিত জীবনের একরূপ কাব্য—সভ্য ও অশিক্ষিত সমাজের সাহিত্য-সাধনা হইতে দূরে পৃথকভাবে রচিত হইয়া থাকে। অতিশয় অসভ্য জাতির মধ্যেও কবিতা বা গানের অভাব নাই। যেমন, শিশু বা বালকদিগের অতি সরল, কলাকৌশলহীন বচন-বিন্যাসে একটি মাধুর্য্য আছে, তেমনই, এইরূপ কবিতায় মনুষ্যসমাজের বাল্য-মাধুর্য্যের আভাস পাওয়া যায়। কবি জসীম উদ্দীন এই পল্লী-প্রকৃতি ও পল্লীবাসী কৃষকদের সহিত তাঁহার প্রাণ এমন মিলাইতে পারিয়াছেন যে, যেন তাঁহারই কলম দিয়া পল্লীর সেই মানুষ একেবারে নিজের প্রাণের কথা নিজের ভাষায় লিখিতেছে! এজন্য, তাঁহার একখানি কাব্য—('নক্সীকাঁথার মাঠ') একজন ইংরাজ মহিলা ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন; কারণ, বিভিন্ন দেশের রূপকথার মত, এইরূপ পল্লীগাথা সংগ্রহ করিবারও প্রয়োজন আছে।

এই কবিতাটিতে, পল্লীপ্রকৃতির সঙ্গে পল্লীবাসী কৃষকের জীবনের যে নিবিড় মধুর সম্পর্ক—তাহাই চিত্রিত হইয়াছে; প্রকৃতির বুকে, খোলা মাঠের হাওয়ায়, তাহারা ফসল ফলাইবার জন্য যে পরিশ্রম করে তাহাও যেন একরূপ খেলা; কারণ, তাহাতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য এবং স্বাস্থ্যসুখ, ক্লান্তির পরিবর্ত্তে উৎসাহ ও আনন্দই বৃদ্ধি করে।

ছন্দ—ছড়ার ছন্দ; (৮৫) দেখ।

৩। নীল-নোয়ান'—নীল আকাশ যাহার উপরে নুইয়া পড়িয়াছে। ১১-১৬। লাইনগুলি ঘুমপাড়ানি ছড়ার মত যেমন মধুর, তেমনই কবিত্বময়।

২৪। মুর্শিদা গান—একরূপ সাধন-সঙ্গীত; হিন্দুর 'বাউল' গানের মত মুসলমান-সমাজে প্রচলিত আছে। ২৬। অর্থাৎ, বিশ্রাম করিতে ইচ্ছা হয় না—কারণ, কাজ করিতেই ভালবাসি, তাহাতেই আনন্দ পাই।

(৯৪)

কবি একটি প্রাচীন কিংবদন্তী অবলম্বনে এই কবিতাটি লিখিয়াছেন। আমাদের দেশের নানা স্থানে, নানা প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ বা লুপ্তপ্রায় চিহ্ন সম্পর্কে, এইরূপ নানা কাহিনী প্রচলিত আছে। এই কবিতায় আমরা কবির মারফতে একটি সুন্দর কাহিনী শুনিলাম। কবে কোন্ মহাপ্রাণা জমিদার-গৃহিণী দেশের দারুণ জলকষ্ট নিবারণের জন্য প্রাণদান করিয়াছিলেন—দেবতাও সদয় হইয়াছিলেন,—এবং তাহার ফলে যে আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা আজও স্থানীয় নরনারীগণ বিস্মৃত হয় নাই; কমলারাণী তাহাদের মনে দেবী হইয়া বিরাজ করিতেছেন। ভাষা ও ভঙ্গিতে কবিতাটি একটি রূপকথার মত হইয়াছে; এই ভঙ্গিটিই এ কবিতার কবিত্ব। গ্রামবাসীদের সরল বিশ্বাস, তাহাদের মনের নানা অদ্ভুত সংস্কার,—এবং সর্ব্বোপরি, প্রাচীন কালের বেশভূষা এবং আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতির উল্লেখ থাকায়, এই কবিতাটিতে খাঁটি পল্লীগাথার নমুনা পাইবে; এবং কবি জসীম উদ্দীনের শক্তি কোথায়, কি ধরণের কবিতা লিখিতে তিনি সিদ্ধহস্ত—তাহাও বুঝিতে পারিবে।

ছন্দ—পর্ব্বভাগের ছন্দ; ছয় অক্ষরের তিনটি, ও (শেষে) দুই অক্ষরের একটি খণ্ডপর্ব্ব লইয়া এক একটি চরণ; (৭৬) দেখ।

২। গলাগলি ধরি—চলতি রীতি—'গলাগলি করি'। ৬। টুকে—(প্রাদেশিক ভাষা) খুঁটিয়া, কুড়াইয়া লয়; (এখানে) খুঁজিয়া খুঁজিয়া (কারণ ঘাস সব শুকাইয়া গিয়াছে) একটু যাহা পায় তাহাই দাঁতে কাটিয়া লইতেছে। ১৫। কোদালি—চলতি ভাষায় 'কোদাল'। ১৭-২৪।—দৈবজ্ঞ, গণৎকার প্রভৃতির গণনা-কার্য্যে যে সব মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়। আকাশের তারা, পাতালের নাগরাজ-বাসুকি—ঈশান কোণ, দক্ষিণ দিক প্রভৃতির দেবতা, এবং পীর—কেহই বাদ যায় নাই। 'ভাট' (সং—'ভট্ট' হইতে) পুরাতন বংশের পরিচয় বা প্রাচীন কীর্ত্তিকাহিনী

গান করা যাহাদের ব্যবসায়। 'ঈশানী'—তান্ত্রিক দেবতা। 'শাহ্ মাদ্দার'—বিখ্যাত পীর। 'দশটি দিক'—আমাদের জ্যোতিষ-শাস্ত্র অনুসারে দিকের সংখ্যা—দশ। ২৫। জোড়-মন্দির—সে কালের মন্দিরাকৃতি খড়ের ঘর; রাণীর শয়ন-ঘর—এইরূপ দুইটি মন্দির জোড়-করা। ৩২। 'আকাশের পাখী' অর্থে, মানুষের আত্মা যাহা আকাশের বা অনন্তের যাত্রী; 'ছায়া' অর্থে দেহ—যাহা সত্য বস্তু নয়। অথবা, 'মানুষ চলিয়া যায়, তাহার স্মৃতিমাত্র অবশিষ্ট থাকে'। ৩৬। উপমাটি যেমন ভাবপূর্ণ, তেমনই এখানে বড়ই উপযোগী হইয়াছে। ৩৩-৩৬। কেমন একটি পুরাতন আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছে দেখ। লহর—(এখানে) কাপড়ের ভাঁজ। ৪১। খাড়ু-জলে—যেমন, 'হাঁটু-জল' 'বুক-জল'; জল যখন পায়ের খাড়ু পর্য্যন্ত উঠিয়াছে—অর্থাৎ 'গোড়ালি-জল'। এখানে একটু লক্ষ্য করিবার আছে; প্রাচীন বাংলায়—এবং এখনও পূর্ব্ববঙ্গের ভাষায়—'খাড়ু' 'মল'-এর মতই একপ্রকার পায়ের অলঙ্কার; কিন্তু পশ্চিম বঙ্গে 'খাড়ু' অর্থে—'বালা' বা 'কঙ্কণের' মত হাতেরই গহনা। ৫৪। লাইনটি বড় সুন্দর। ৫৬। কি চমৎকার প্রথা! সেই পুণ্যবতীর পুণ্য-স্থানটিকে তাহারা সবচেয়ে মঙ্গলপ্রদ মনে করে। ৫৭-৫৮। গ্রামবাসীদের মনের বিশ্বাস—তাহাদের এই সম্মান দেবী আনন্দের সহিত গ্রহণ করেন। 'আলেয়া' কাহাকে বলে?

(৯৫)

এই কবিতায় কবি বলিতেছেন, তোমরা শহরের ভদ্র-সমাজে যাহাকে রূপবান যুবা বল, তাহার তুলনায় গ্রামের চাষী যুবক কুৎসিত ত নহেই, বরং তাহার সেই কালো স্বাস্থ্যবান দেহে এমন একটা লাবণ্য আছে, যাহা তোমাদের ঐ শহুরে বাবুদের নাই। হঠাৎ এমন কথা শুনিলে তোমরা হয়ত হাসিবে, কিন্তু কবিতাটি পড়িবার পর তোমরাও স্বীকার করিবে যে, কবি মিথ্যা বলেন নাই।

ছন্দ—পূর্ব্বের (৯৩) কবিতার মত।

২। চুলগুলির রং ঘোর কালো—যেন সেগুলি একদল ভ্রমর, এবং তাহারা রঙীন ফুল ছাড়িয়া, তারও চেয়ে সুন্দর ঐ কালো ফুলের (মুখের) উপরে বসিয়াছে।

৭। বাদল-ধোয়া মেঘে—অর্থ, বর্ষার মেঘের মত উজ্জল কালো। 'বাদল-ধোয়া'—বাদলের জলে ধোয়া বা পরিষ্কার নয়—'বাদল-কালো' [তুলনা কর—'দুধে-ধোয়া' (৭৫ কবিতা)] ৮। ভুলিয়ে—ভুলিয়া গিয়া ; 'আলোর খেল্', অর্থাৎ, হঠাৎ-আলোর ভেল্‌কি। 'খেল্' কথাটির অর্থ অন্যত্র দেখ [২৭ (৩)]। ১২। দ'ত—দোয়াত। 'লেখি'—প্রাদেশিক উচ্চারণ। ১১-১৮। এই লাইনগুলিতে কবি কালো রঙের প্রশস্তি করিয়াছেন। ১৫-১৮। পংক্তিগুলির যুক্তি ও দৃষ্টান্ত বড় যথার্থ হইয়াছে। ২৫। জারীর গান—এক রকম মিশ্র পাঁচালী ও কবি-গান ; কারবালার কাহিনী লইয়া রচিত পালা-গানকেও 'জারী' গান বলে। ২৬। 'শাল-সুন্দী বেত'—এক জাতের খুব মজবুত বেত। ২৭। পাগাল লোহা—ইস্পাত। ৩০। নামী—নামজাদা, বিখ্যাত।

(৯৬)

এই কবিতাটির মধ্যে কেবল রচনার নৈপুণ্য নয়,—ভাবের আন্তরিক অনুভূতি আরও ভাল করিয়া লক্ষ্য করিবে ; এবং ইহাও বুঝিবে যে, কবিতা উৎকৃষ্ট হইতে হইলে, কবির প্রাণের সত্যকার সাড়া তাহাতে থাকা চাই। বর্ত্তমান কবিতাটী কবি কারাগারে অবস্থানকালে লিখিয়াছিলেন। যেখান হইতে ভাল করিয়া আকাশ দেখা যায় না, সেই উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত কারাগৃহে বসিয়া একদিন শরতের প্রভাতে কবি সেই প্রাচীরের উপরেই একটুখানি সূর্য্যালোক দেখিয়া যে আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন, তাহাই এই কবিতাটিতে কিরূপ প্রকাশ পাইয়াছে, লক্ষ্য কর ; মনে হইবে, তোমরাও যেন সেই কারাগৃহে বসিয়া ঐ সোনার আলো দেখিতেছ।

ছন্দ—ছড়ার ছন্দ—ত্রিপদী ; প্রত্যেক পদে দুইটি করিয়া ৪ অক্ষরের (হসন্ত-বাদ) পর্ব্ব আছে ; কেবল শেষেরটিতে একটি তিন অক্ষরের খণ্ডপর্ব্বও আছে। যেমন—

শরত্ রবির্ | সোনার্ আলো | ঝরিছে (৪ + ৪ + ৩)

১১-১২। আমার মত পিপাসা তোমাদের নাই, তাই মাঠ-ভরা আলোক দেখিয়াও তোমাদের আনন্দ হইবে না, কিন্তু এখানে ঐটুকু আলোতেই আমার কি আনন্দ

১৪। শ্যাওলা-ধরা—যেমন, 'পোকা-ধরা', 'ছাতা-ধরা'; এখানে 'ধরা'র অর্থ দেখ। ১৯। দূরের স্বপন, ইঃ—কথাটি চমৎকার। অর্থ—পাখীদের পাখা দেখিলে দূর-দূরান্তরে উড়িয়া বেড়ানোর কথা মনে পড়ে, বন্দীর জীবনে তাহার মত আকাঙ্ক্ষা আর কি আছে? ২১-২৮। বর্ষার জল লাগিয়া প্রাচীরের গায়ে যে সব দাগ পড়ে, সেগুলিকে যেন কাহারও হাতের আঁকা নানারূপ চিত্র বলিয়া মনে হয়; যেন কাহারা ঐরূপ রেখার সাহায্যে কত কথা বলিতে চাহিয়াছিল। আজ আবার তাহারাই শরতের পরিপূর্ণ আনন্দের আবেগে যেন দস্যুর মত সকল নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া সর্ব্বত্র আপনা-দিগকে জাহির করিতেছে—দেওয়ালের শেওলা আরও সবুজ হইয়া উঠিয়াছে, লাল ইঁটগুলাও যেন আরও লাল দেখাইতেছে। কারাগৃহের জানালায় বসিয়া কবি ইহার বেশি কিছু দেখিতে পান না—ঐ ইঁট আর ঐ শেওলা ছাড়া প্রকৃতির শোভা আর কিছুরই মধ্যে দেখিবার উপায় নাই। তবু তাহাতেই কি আনন্দ! ৩৫-৩৬। এই দুই লাইনেই এই কবিতার মূল মর্ম্মটি ধরিতে পারিবে। 'রঙীন'—ভালবাসার রঙে রঙীন্; (এখানে) রৌদ্রের সোনা-রং। ৪০। বাক্যটি উপমামূলক; এইরূপ ভাষা ভাব-প্রকাশের কিরূপ উপযোগী, দেখ 'যাহা পূর্ব্বে দৃষ্টি আকর্ষণ করিত না, তাহাই ওই আলোর রং মাখিয়া সুন্দর দেখাইতেছে'। ৪৫-৪৮। শেষ কয়টি লাইনে, লক্ষ্মী-মেয়ের মত ঐ আলোর করুণ চোখে, কবির বন্দী-জীবনের ব্যথাই কি সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে! প্রকৃতির সহিত মানুষের প্রাণের যে সহানুভূতি—তাহার বিষয়ে অনেক কবিতা তোমরা পড়িবে; এখানেও, সেই সহানুভূতিরই একটি সত্যকার প্রমাণ পাওয়া গেল। মানুষ যখন সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আপনার দুঃখ আপনিই একা ভোগ করিতে বাধ্য হয়, তখন, স্নেহময়ী প্রকৃতির করুণ করস্পর্শ তাহাকে বারবার সঞ্জীবিত করে।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা:—মেঘ্‌লা দিন; শ্যাওলা-ধরা; প্রসাদ; ভুবনপ্লাবিনী; ফ্যাকাসে।

(৯৭)

আকবরের সমাধি সেকেন্দ্রা শুধু সৌন্দর্য্যের জন্য নয়—মহাপুরুষের কবর বলিয়া, চিরদিন তীর্থস্থানের মত দর্শনীয় হইয়া আছে। প্রাচীন ভারতের যেমন অশোক,

তেমনই মধ্যযুগের ভারতীয় সম্রাটগণের মধ্যে আকবর—ভারতের, তথা পৃথিবীর, দুই শ্রেষ্ঠ নৃপতি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। তার কারণ, অশোক যেমন প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যের অধীশ্বর এবং অশেষ শক্তিশালী হইয়াও, তাঁহার সেই রাজশক্তিকে জনগণের কল্যাণসাধনে নিয়োগ করিয়াছিলেন,—আকবরও তেমনই, প্রায় সমগ্র ভারত এক রাজশাসনের অধীন করিয়া অবশেষে এই মহাদেশে জাতি ও ধর্ম্মের মিলন সাধন করিয়া, চিরকালের জন্য এক মহা অনর্থের মূল উৎপাটন করিতে চাহিয়াছিলেন। ভারতে এত রাজা এবং রাজবংশ রাজত্ব করিয়াছে—এমন মহৎ উদ্দেশ্য আর কাহারও অন্তরে স্থান পায় নাই। এই কবিতায়, কবি সেই মহাপুরুষের স্মৃতি-মন্দিরে বসিয়া আজিকার এই অন্তর্দ্বন্দ্ব-সর্ব্বনাশের দিনে, আকবরের রাজমহিমা অপেক্ষা, সেই অপর মহিমা স্মরণ করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়াছেন, এবং তাঁহার সেই মহামিলন-মন্ত্র আবার ভারতে ঘোষিত হউক, এই প্রার্থনা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের 'শিবাজী' কবিতাটি এই সঙ্গে পড়িতে পারো।

ছন্দ—পদভাগের ছন্দ; দুইটি ছোট ও দুইটি বড় চরণের একান্তর (alternate) মিল—রবীন্দ্রনাথের 'শিবাজী' কবিতার মত; প্রথম লাইন—১৮ অক্ষর, দ্বিতীয়টি—৬ অক্ষর; যথা—

হে সম্রাট বসে আছি | আজি তব সমাধির পাশে (৮+১০)
একান্ত বিজনে (৬)

('কোন দূর শতাব্দের কোন্ এক অখ্যাত দিবসে
নাহি জানি আজি'—'শিবাজী')

৯-১০। আকবরের সমাধি-স্থানটি অতিশয় নির্জ্জন, নিকটে লোকালয় নাই। এইখানে, বর্ত্তমানের কলকোলাহল হইতে দূরে, নির্জ্জন নিস্তব্ধ সমাধিভবনের ছায়াতলে বসিয়া কবি অতীত-স্মৃতির মধ্যে ডুবিয়া যাইতেছেন; ইহার পরবর্ত্তী লাইনগুলিতে সেই ভাব আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ইহা একরূপ ধ্যানের অবস্থা। ১৭-২৪। সম্রাট আকবরের মহা-স্বপ্ন কি ছিল, তাহাই এই কয়টি লাইনে কবি অতিশয় সংক্ষেপে অথচ সম্পূর্ণভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। তখন হইতেই হিন্দু ও মুসলমান, এই দুই বৃহৎ সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যস্থাপনই সবচেয়ে বড় সমস্যারূপে দেখা দিয়াছিল। ২৫-৪০। এই কয়টি স্তবকে, বর্ত্তমান কালে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যে বিরোধ-বিদ্বেষ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে,

কবি তাহার বর্ণনা করিয়া গভীর দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। 'কাহার সন্ধানে' ?—অর্থাৎ, ইহার শেষ কোথায়? ইহার ফলে আমরা কোন্ সদ্গতি লাভ করিব? ৪৭-৪৭। যাহারা অতিশয় নিকট জ্ঞাতি বা আত্মীয় তাহাদের মধ্যে এরূপ বিবাদ ঘটিলে শুধুই সর্ব্বনাশ নয়, তাহার সঙ্গে আরও এই দুর্গতি হয় যে, পরের কাছে আমরা ঘোরতর লজ্জা পাই; এবং আমাদের এই অবস্থায় যাহাদের সুবিধা হইবে, তাহারাও আমাদিগকে সম্মানের চক্ষে দেখিবে না। ৫১। সাম্যবাদ—এই শব্দটির আধুনিক অর্থ—ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ, প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার ভেদ দূর করিয়া সমাজে সকল ব্যক্তির সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা। সম্রাট্ আকবরের অভিপ্রায় অতিশয় মহৎ হইলেও, তিনি যে তাহাতে সাফল্য লাভ করেন নাই, তার কারণ, সেই মধ্যযুগের ধর্ম্মসংস্কার ও সামাজিক সংস্কার তাহার পক্ষে একটা বিরাট বাধা হইয়াছিল; আজ মানুষের সে সকল সংস্কার দূর হইতেছে—সাম্যবাদের নূতন নীতি আজ পৃথিবীতে জয়ী হইতে চলিয়াছে, তাই কবি আশা করেন, এতদিনে সম্রাটের প্রাণের কামনা পূর্ণ হইবে। ৫৩। মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মত—এই সুন্দর বাক্যখণ্ডটি রবীন্দ্রনাথের 'উর্ব্বশী'-কবিতায় আছে; অর্থ,—মন্ত্রের দ্বারা যেমন বিষধর সর্পও বশীভূত হয়।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা :—উত্তাল; স্মৃতির কন্দর; একনিষ্ঠ; সৌম্য; আত্মদ্বন্দ্ব-সর্ব্বনাশ; কম্বুকণ্ঠ; সাম্যবাদ।

(৯৮)

এই কবিতাটির বিষয় এবং বর্ণনাভঙ্গি এমন যে, ইহা পড়িয়া তোমরা আরও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে—কবিতা কত রকমের হইতে পারে। এখানে কবি একটি অতিশয় বাস্তব, এবং ভীষণ ও আকস্মিক ঘটনা বর্ণনা করিতেছেন; বর্ণনাটি এমন যে, আমরা যেন সেই স্থানে সেই সময়ে তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি, এবং প্রত্যক্ষ করার ফলে আমাদের প্রাণে ঠিক সেই ভাব জাগিতেছে। এজন্য এ কবিতাটি এই শ্রেণীর রচনার একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

ছন্দ—পর্ব্বভাগের ছন্দ; প্রতি চরণে ৬ অক্ষরের তিনটি পূরা—ও শেষে ৫ অক্ষরের একটি খণ্ডপর্ব্ব আছে। ঠিক (৮৩) কবিতার মত।

৪। শঙ্খ-রবে—ভূমিকম্পের সময়ে হিন্দুদের মধ্যে এইরূপ শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইবার রীতি আছে ; খুব সম্ভব, ইহা সকলকে জাগাইবার বা সাবধান করিয়া দিবার জন্য একটা অতিশয় প্রাচীন বিধি। ৮। চূরমার—(কথ্যভাষা—বিণ) প্রবল আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ। মাতালের মতো—ঠিক এইরূপই দেখায় ; ভাঙ্গিয়া পড়িবার পূর্ব্বে বাড়ীগুলি যেরূপ দুলিতে থাকে, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়। ১০। ভূমিকম্পের সময়ে মানুষের একটি অতিশয় যথার্থ ও অতিশয় স্বাভাবিক মনের ভাব। এই লাইনটি বড় সুন্দর হইয়াছে। ১৪। খণ্ডিবে—'ললাট-লিখা'র সঙ্গে ঠিক এই ক্রিয়াপদটিই ব্যবহার করা হয়—ইহাও ভাষার রীতি। এইরূপ অনেক সংস্কৃত শব্দ—একটুও না বদলাইয়া খাঁটি বাংলা হইয়া গিয়াছে। ('খণ্ডন করা'—নাকচ করা, কাটিয়া দেওয়া)। 'ললাট-লিখা'—ভাগ্যলিপি ; 'ললাট' বলিবার কারণ কি ? ১৫। ঘোলাটে—এইরূপ 'টে'-বিভক্তিযোগে অর্থ হয়—ঈষৎ, বা অল্প। কোন কোন স্থানে 'চে' যোগ করিয়াও এইরূপ অর্থ হয়, যেমন—'লাল্‌চে'। ১৮। হেরি—নির্নিমিখ—মৃত্যু যে অবধারিত তাহা বুঝিতেছি। ২৭। অনল-হল্‌কা—আগুনের শ্বাস বা উচ্ছ্বাস। ৪০। নর-নারায়ণ—(এখানে) নররূপী নারায়ণ, কারণ মানুষের আত্মা ভগবানেরই অংশ। ৪২। হি-হি করে—শীতে কাঁপার ভাব। 'হি-হি' করিয়া হাসাও হয়।

ভাষা ও শশিক্ষা :—চুর্‌মার ; সর্ব্বংসহা ; ললাট-লিখা ; নির্নিমিখ ; হল্‌কা ; করাল ; রুদ্রপাণি ; নর-নারায়ণ ; ব্যোমপথ ; রম্যনগরী ; সলিল-সমাধি।

(৯৯)

আর একটি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের কবিতা—পুস্তকে এই একটিই আছে। ইংরাজীতে যাহাকে 'mock-heroic' বলে—হাস্যরসকে গাম্ভীর্য্যে মণ্ডিত করার সেই ভঙ্গি—এই কবিতায় লক্ষ্য কর ; ইহার বাহিরের ভঙ্গিটি করুণ, কিন্তু ভিতরে হাস্যরস বহিতেছে। কবিতাটির ভাষা যেমন শুদ্ধ ও সরল, রচনারীতিও তেমনই পরিচ্ছন্ন। কবি কালিদাস রায়ের একটি কবিতার সহিত সাদৃশ্য থাকিলেও এই কবিতাটি মৌলিক কবিতার মতই সার্থক ও সুন্দর হইয়াছে। আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিবে : বাঙালীর কাব্যে টুপির কথা এ পর্য্যন্ত ছিল না, কারণ, বাঙালী জাতির মাথায় টুপি নাই ; কিন্তু এক্ষণে যে

কারণে খাঁটি বাংলায় বাঙালী কবিও টুপির মমতা প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে আশা হয়, আমরা বাংলাসাহিত্যে অনেক নূতন বস্তু লাভ করিব, এবং তাহা দ্বারা বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হইবে।

ছন্দ—ছড়ার ছন্দ; বড় লাইনগুলিতে চার, ও ছোটগুলিতে দুইটি করিয়া পর্ব্ব আছে। বড় লাইনগুলি (৮২) কবিতার মত।

৭। বৈশাখী ঝড়—কারণ, হঠাৎ আসিয়া পড়ে ('কাল-বৈশাখী')। ১০। কারচুপি—দুষ্ট কৌশল। ২০। অলকা—কুবের-পুরী; সেখানে মহামূল্য মণিরত্ন ভিন্ন আর কিছুই থাকিবার যো নাই। কবির অভিপ্রায়—তাঁহার সেই টুপি এমনই মূল্যবান, যে অলকা ভিন্ন আর কোথাও তাহার স্থান হইতে পারে না। ৩২। 'চাঁদ্‌নি'—কলিকাতার প্রসিদ্ধ সুলভ-দ্রব্যের (বিশেষতঃ পোষাকের) বাজার। ৩৫। 'চসার'—পুরাতন ইংরেজীর প্রসিদ্ধ কবি, তাঁহার কাব্যের ভাষা আধুনিক ইংরেজীর তুলনায় দুর্ব্বোধ্য। টুপির এমনই গুণ যে, মাথায় পরিলে দুই মিনিটে তেমন ভাষার কবিতাও বুঝিয়া ফেলা যায়। ৪৯-৫০। এই শেষের লাইন দুইটিতে কবির টুপি-শোক প্রচণ্ড হইয়া উঠিয়াছে।

(১০০)

কবির 'বিল্বদল' নামক কাব্য হইতে এই কবিতাটি উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতাগুলির ভাষা যেমন সংক্ষিপ্ত ও সরল—তেমনি, সর্ব্বত্র কোমল মধুর সৌন্দর্য্য-প্রীতির সঙ্গে একটা উচ্চ আদর্শ-প্রীতিও আছে। যে সকল ভাব অতিশয় সত্য বলিয়াই পুরাতন, কবি তাহাদিগকেই শুভ্র ও সুরভি ফুলের মত ফুটাইয়া তোলেন—সে ভাবের মধ্যে উগ্রতা নাই, ঋজুতা ও শুচিতা আছে।

ছন্দ—পদভাগের ছন্দ—৮ ও ৬ অক্ষরের ছোট-বড় আটটি চরণ লইয়া এক একটি স্তবক।

৫। কুয়াসার আবরণে। ৯। প্রাণ—কবি 'প্রাণ' বলিতে কি বুঝেন, তাহা পরবর্ত্তী লাইনগুলিতে দেখ। প্রত্যেকের নিজ নিজ আদর্শ-অনুযায়ী কর্ত্তব্য-সাধনে যে শক্তি আমাদিগকে অটল অবিচলিত রাখে—তাহাই 'প্রাণ'; এই শক্তি যাহার মধ্যে অল্পেই নিঃশেষ হইয়া যায়, তাহার বাঁচিয়া থাকা বৃথা, কারণ, সে জীবন পশুর জীবন মাত্র। ১৭-২৫। এই শেষ স্তবকটিতে কবি, তাঁহার নিজের কাব্যসাধনার আদর্শ কি,

তাহা জানাইয়াছেন। যেখানে প্রাণ ও গানের মধ্যে যোগ নাই, সেখানে গান কতকগুলা মিথ্যাকথার তুফান মাত্র; সে গানে মানুষ জাগে না। আমাদের কথা ও কাজের মধ্যে মিল থাকা যেমন অত্যাবশ্যক, তেমনই গান বা কবিতা সেই কথা ও কাজের সত্যকার প্রেরণা হওয়া চাই। সকলই সম্ভব হয়—যদি প্রাণে শক্তি থাকে। অতএব আর সকলের আগে, এমন কি, গানেরও আগে—প্রাণকেই প্রয়োজন।

[কবিতা-পাঠের পূর্ব্বে, আমি তোমাদিগকে যেটুকু সাহায্য করিব বলিয়াছিলাম, তাহার অনেক বেশি করিয়া ফেলিয়াছি—অনেক কথা তোমরা নিজেরাই একটু মনোযোগ দিলে বুঝিয়া লইতে পারিতে; তথাপি, আমি এই কারণে একটু অধিক পরিশ্রম করিলাম যে, তোমরা আমার সঙ্গে এতগুলি কবিতা এমন ভাবে পাঠ করার ফলে, শুধুই কবিতা নয়—ভাষা আরও ভাল করিয়া শিখিতে পারিবে। ভাষা-শিক্ষার মত শিক্ষা আর নাই। এই জন্য, আমি কবিতার মধ্যে যেখানে যে কথাটি বা শব্দটি একটু বাঁকা, বা ভিন্ন ধরণের দেখিয়াছি, সেইখানেই তোমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছি। অনেক শব্দ বা খণ্ডবাক্য (phrase) সর্ব্বদা চোখে পড়িলেও, তাহাদের মধ্যে যে ভাষা-রীতি বা চল্‌তি-বুলির বাঁধন আছে তাহা তোমরা প্রায় লক্ষ্য কর না, এবং সেজন্য নিজেরা লিখিবার সময় ঠিক মত লিখিতেও পারো না; অতএব এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিবে। 'ভাষা ও শব্দশিক্ষা'র নামে আমি যে সকল শব্দ বা খণ্ডবাক্য তুলিয়া দিয়াছি তাহার অধিকাংশ তোমাদের খুবই পরিচিত হইতে পারে—কিন্তু তবু রচনাকালে মনে পড়ে না; কারণ, বহুবার পড়িয়া থাকিলেও, সে গুলিকে হয়ত তেমন অভ্যাস কর নাই। অতএব, ইহাও তোমাদের কাজে লাগিবে। কবিতার মারফতে ভালো ভালো শব্দ শিখিবার সুবিধা আরও বেশি হয় এই জন্য যে, কবিতার ছন্দে ও ভাষায়, সেগুলি শুনিতে আরও সুন্দর হয়, এবং আবৃত্তি করিয়া পড়িলে সহজেই মনে গাঁথা হইয়া যায়।

অনেক স্থলে, আমি যে ব্যাখ্যা দিয়াছি, তাহাই হয়ত' একমাত্র ব্যাখ্যা নয়, এমন কি, আমি হয়ত' ভুলও করিয়াছি। সে সকল স্থানে তোমরা যদি তোমাদের নিজেদের জ্ঞানবুদ্ধির দ্বারা আরও ভাল অর্থ করিতে পারো—তাহা হইলে, আমি খুবই খুসী হইব। উৎকৃষ্ট কবিতার একটা গুণ এই যে, তাহার ভাবার্থ নানা রকমের হইতে পারে; পাঠক আপনার কল্পনা ও আপনার বোধশক্তি অনুসারে যদি তাহার ভিন্ন অর্থ করে, তাহাতে দোষ হয় না; অবশ্য সেই অর্থ দ্বারা কবিতার সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধি হওয়া চাই—অন্ততঃ সৌন্দর্য্যের হানি না হয়। তোমরাও সেরূপ স্থলে নিজেদের মনোমত করিয়া কবিতার ভাব গ্রহণ করিবে। কিন্তু ছাত্র হইয়া পরীক্ষা দিবার সময়ে, একটু সাবধান হওয়াই ভালো; কারণ, সেখানে কেবল নিজের মনোমত হইলেই চলিবে না, পরের কাছেও সেই ব্যাখ্যাটি বুদ্ধি-সঙ্গত হওয়া চাই। অর্থাৎ, নিজের মত করিয়া পড়িয়া যতটা বুঝি ও যেটুকু আনন্দ পাই—তাহাই যথার্থ কবিতা-পাঠের আনন্দ বটে, তথাপি, সেই আনন্দ অপরের কাছে যথেষ্ট নয়; তোমাদের সেই আনন্দের কারণটিও ভাল করিয়া বুঝাইতে হইবে। যদি তাহা পারো, তবে তাহার তুল্য গৌরব আর নাই। কিন্তু এখনও তোমাদের সেইরূপ বিদ্যা বা কাব্য-রসবোধ হয় নাই; এজন্য, ব্যাখ্যার সময়ে—শুধু ভাব নয়, অর্থের দিকেও বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। সেই অর্থ যদি কোনখানে আমার অর্থ অপেক্ষা উত্তম মনে হয়, তবে তাহাই গ্রহণ করিবে; কিন্তু শিক্ষকমহাশয়কেও বিচারের ভার দিবে।

আরও একটি কথা। 'কবিতা-পাঠের' মধ্যে যদি কোথাও বানানের ভুল বা অনিয়ম চোখে পড়ে, তবে তাহা বুঝিয়া ঠিক করিয়া লইবে; বার বার অভিধান দেখিবে, এবং ব্যাকরণের নিয়মগুলিও স্মরণ করিবে। কারণ, বানান-ভুলের মত অপরাধ শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে অমার্জ্জনীয়;

সকল দেশের শিক্ষিত-সমাজে বানান-ভুল (এবং উচ্চারণ-ভুল) অতিশয় অশ্রদ্ধার উদ্রেক করে। ইংরাজী 'Illiterate' এবং আমাদের 'বর্ণ-জ্ঞানহীন মূর্খ'—একই অর্থের গালি। যে লিখিতে গিয়া বানান-ভুল করে, সে—যত বড় কবি বা ভাবুক হৌক—বিদ্বান নয়, অর্থাৎ, সে রীতিমত শিক্ষালাভ করে নাই; কারণ, বানান-ভুলের দ্বারাই প্রমাণ হয়—কোন কিছু ভালো করিয়া জানার অভ্যাস তাহার নাই; অতএব, সে যাহা লেখে বা বলে, তাহার সম্বন্ধে তাহার নিজেরই কোন পরিষ্কার ধারণা নাই। বাংলা শব্দের বানান-বিধি সুনির্দ্দিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও, চলিতি বা কথ্যভাষার কতকগুলি শব্দের বানান এখনও সুনিয়মিত হয় নাই, তাই সেগুলির সম্বন্ধে তোমরা অন্ততঃ সজাগ থাকিবে। বাংলা বানানের গোলযোগ ও তাহার কারণ সম্বন্ধে তোমরা যদি বিশেষ জ্ঞান লাভ করিতে চাও, তাহা হইলে শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ প্রণীত 'বাঙ্গালা ভাষা ও বানান' নামক বইখানি পড়িয়া দেখিতে পারো।

এই পুস্তকের শেষে কবিদের যে পরিচয় দিয়াছি, তাহা নিতান্তই সংক্ষিপ্ত; এ বিষয়ে আরও অধিক জানিবার চেষ্টা করিবে। কবিদের জন্ম প্রভৃতির যে তারিখ আমি দিয়াছি, তাহা ঠিক আছে কিনা পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। দুইজন আধুনিক কবির তারিখ আমি নিজেও চেষ্টা করিয়া ঠিক করিতে পারি নাই,—কবি গোবিন্দচন্দ্র রায়ের এবং যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের। শেষোক্ত কবির যে তারিখ দিয়াছি, তাহা ভুল হওয়াই সম্ভব। আর একটি ভুল আছে, ভারতচন্দ্রের উপাধি 'কবি-গুণাকর' নয়—'রায় গুণাকর'। তোমরা নিজেরাই যদি সন্ধান করিয়া এই সকল সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারো, তবে এখন হইতেই একটু গবেষণার কাজ করিতে শিখিবে—আমাদের দেশে এইটুকু সংবাদ সংগ্রহ করাও যে কত দুরূহ, তাহা বুঝিতে পারিবে। এজন্য এই কাজ করিবার আগ্রহ আরও অধিক হওয়া উচিত।

শব্দার্থ-সূচী

অলকা-তিলকা (১২)—(সাধারণ অর্থে) বধূ-সজ্জা—মুখে চন্দন-কুঙ্কুমাদির তিলক (ফোঁটা), কপালের উপরে কেশের (অলকের) পরিপাট্য।

আর্কফলা (৬৫)—মস্তকের শিখা, টিকি।

আগড় (৭২)—বেড়া; ঝাঁপ।

আগুসার (৫)—অগ্রগামী।

আচাভূয়া (১৫)—অদ্ভুত; কিম্ভুত কিমাকার।

আজান (৪৯)—নামাজ পড়িবার জন্য সকলকে জানান দিবার শব্দ বা আহ্বানবাণী।

আথিবিথি (৫৭)—ব্যস্ত সমস্ত হইয়া; অতিশয় ব্যগ্রভাবে।

আদুল (৬৮)—('আদুড়') অনাবৃত; 'উদলা'।

আন (৫)—অন্য, ভিন্ন।

আলাভোলা (৬৯)—উদাস, এলোমেলো চেহারা। (মূল অর্থ—সাধাসিধা; অচতুর)।

আয়তি (১৫)—সধবার চিহ্ন।

ইথে (১৬)—ইহাতে; এইজন্য।

উচল (২)—উচ্চ; উঁচু।

উজাড়িয়া [ঘর] (১৫)—বাস উঠাইয়া।

উতরোল (৩৩)—অতিশয় আকুল।

উভরায় (৩৩)—উচ্চরবে চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া।

কাঁঠি (৯)—গোল লৌহখণ্ড, মাছ ধরিবার জালে লাগান থাকে।

কারফরমা (৮)—তত্ত্বাবধায়ক।

কুঁজি (১৫)—চাবি।

কুন্দে (৯)—কঁদিবার যন্ত্রদ্বারা কাটিয়া।

কুড়া (১৫)—(এখানে) সিদ্ধি ঘুটিবার পাত্র।

কোক (৮)—নেকড়ে বাঘ।

কোঙর (১১)—কুমার; পুত্র।

কোঁড়া (৯)—অঙ্কুর।

কিস্তি (৬১)—মাল-বোঝাই বৃহৎ নৌকা।

খেল্ (২৭)—খেয়াল; ক্রীড়া।

গাছ গাড়ু (১৫)—বড় গাড়ু।

গাঁট্টা (৮১)—বদ্ধ মুষ্টিতে অঙ্গুলির অস্থি-সন্ধি (আঙুলের গাঁট),—তদ্দ্বারা আঘাত।

ঘুন্সী (৭৮)—কোমরের সুতো।

ঘোটনা (১৫)—পেষণদণ্ড।

চাট (৭২)—মাদক দ্রব্য সেবনের কালে ব্যবহৃত মুখরোচক খাদ্য।

চিক (৬৮)—বাঁশের কাঠির দ্বারা তৈরী পর্দ্দা।

চুম্‌কী (৭৩)—সোনা রূপা ইত্যাদির চক্‌মকে পাত।

ছাদ্‌নাতলা (৮৫)—বিবাহের ছায়ামণ্ডপ। (ছান্‌লা বা ছাদ্‌না-তলা)

ঝাঁকা (৮৪)—বড় ঝুড়ি।

ঝারা (৪৮)—'শিকা'র আকারে শোলা-নির্ম্মিত খেলনা।

ঝি (৫)—কন্যা।

ঝিকিমিকি (৭০)—একবার উজ্জ্বল, আরবার অনুজ্জ্বল বা ম্লান।

ঝিলিমিলি (৩)—ঝিক্‌মিকে এবং লম্বমান।

টিপ্ (৭৮)—চিহ্ন, কপালের মধ্যভাগে ফোঁটা।

টিপ (৮২)—লক্ষ্য ; নিশানা।

টুকে (৯৪)—খুঁটিয়া সংগ্রহ করে (এখানে) খুঁটিয়া খায়।

টোপর (৯)—(বিবাহকালে) বরের মাথার মুকুট।

ঠাট (৭২)—ঢং ; ভঙ্গী।

ঠোঙা (৭৯)—কাগজ অথবা পাতার তৈয়ারী পাত্র।

ডগমগ (৪৭)—অধীর।

ঢোলকাণ (৮)—মৃগজাতি বন্য পশু-বিশেষ ; (যাহার কাণ 'ঢোল্' অর্থাৎ ঢুলিয়া থাকে)।

তথি (৮)—তথায় ; সেইখানে।

তাড় (৩)—বাহুর অলঙ্কার।

তুয়া (১)—তোমার।

তুঁহু (৭)—তুমি।

তেঁই (৪১)—তাই ; তজ্জন্য।

তোহারা (৭)—তোমার ; তোমারি।

থেহা (৬)—স্থৈর্য্য ; স্থিরতা। (এখানে) যাহা গড়াইয়া যায় না—গাঢ় রস।

দড় (৭২)—মজবুত ; দক্ষ।

দাওয়া (৪৮)—মাটীর ঘরের বারান্দা ; রক।

'দীন্' (৩৯)—ধর্ম্ম ; ধর্ম্মবিশ্বাস।

দোলাই (৭৮)—ছিটের কাপড়ের শীতবস্ত্র।

দোঁহাকার (৩৫)—দুজনের ; উভয়ের।

দেদার (৩২)—প্রচুর ; অসংখ্য।

দেয়ালা (৫২)—শিশুর স্বপ্নে হাসি-কান্না। ('দেহালা', 'দিয়ালা')।

দেয়াসী (৭৮)—গ্রাম্য দেবতার পুজারী ; পাণ্ডা।

ধর্ণা (৭৩)—দেবতার অনুগ্রহ লাভের জন্য বা অভীষ্ট লাভের আশায় দেবতার

গৃহদ্বারে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া বসিয়া থাকা।

ধড়ী (৯)—(ধটী) ধুতি; 'বীর-ধড়ী' অর্থে, মল্লকচ্ছ বা মালকোচা।

ধূলোট (৭৯)—(ধূলায় লুট) সংকীর্ত্তনের পর ধূলায় গড়াগড়ি দেওয়া।

নয়ালি (৭২)—বৎসরের নূতন (ধান)।

নাটা (৯)—বর্ত্তুলাকার ফলবিশেষ; করঞ্জা (*করমচা)।

নিয়ড়ে (৯)—নিকটে; কাছে।

নীলকণ্ঠ (৮)—পুরাণে দেবীর বলি-পশুর তালিকায় 'নীলগ্রীব পশু'র নাম আছে। এক জাতীয় হরিণ।

নেজা (৯)—বাঁটুল; বাণ; বর্শা।

নেয়াই (৬৮)—(নেহাই) যে লৌহখণ্ডের উপর রাখিয়া কর্ম্মকার লৌহ পিটে।

পাছড়া (৩)—উত্তরীয় বস্ত্র; ওড়না।

পাঁজা (৮)—(ফা° পঞ্জাহ=পঞ্চাশ) পঞ্চাশ জন সৈন্যের অধিনায়ক।

পাঁতি (১৩)—পংক্তি; শ্রেণী।

পানা (৭৮)—পুকুরের জলের শেহালা।

পিপে (৬১)—কাঠের মৃদঙ্গাকৃতি বড় চোঙ্গা বা খোল।

ফাউড়া (৯)—ছোট লাঠি; ডাণ্ডা।

ফাগ (৫২)—আবীর।

ফুঁকো (৭২)—('ফুৎকার' হইতে) অন্তঃসার-শূন্য।

ফেরফার (১৬)—বিঘ্ন; বিভ্রাট।

ফেরু (৮)—শৃগাল।

বট' (১৬)—হও; আছ।

বস্তা (৩২)—বড় থলি।

ব্যাজ (৪২)—কালবিলম্ব।

বাড়ে (১৬)—কিনারায়।

বারশিঙ্গা (৮)—যে হরিণের শৃঙ্গে বারো সংখ্যক ডাল আছে।

বালাই (৭১)—অমঙ্গল।

বুঁদি (৭২)—বড় আঁটি।

বেশর (৩)—নাকের অলঙ্কার।

বেড় (১৫)—বেষ্টন; ঘের। (এখানে) আস্তানা।

ভণয়ে (১)—বলে; কহে।

ভণ্ডন (১১)—ভাঁড়ান; শঠতা।

ভিস্তি (৬১)—(মোশক্) মশকে করিয়া যাহারা জল বহন করে।

ভেল (২)—হইল।

ভোল (৭২)—ছল।

মশক্ (৬১)—চর্ম্মনির্ম্মিত জলাধার।

মিত্থা (৮)—(ফা°—মীর-ই-দহ্) দশজন পাইকের সর্দ্দার।

মিনার (৪৯)—মস্‌জিদ প্রভৃতির চূড়া।

মোয়া (৬৮)—খই, মুড়ি, মুড়কি প্রভৃতির তৈয়ারী গোলাকার মিষ্টান্ন; (এখানে) ক্ষুদ্রাকার বস্তুর কতকগুলি একত্র বাঁধিয়া যে গোলাকার বৃহত্তর বস্তু হয়।

মোয়াজ্জিন (৪৯)—মুয়াজ্জিন; যে মস্‌জিদে আজান দেয়।

মেলানি (৫)—বিদায়।

যিহোবা (২১)—(Jehovah) ইহুদিদিগের উপাস্য দেবতা।

যুবজানি (৩৫)—যুবতী জায়ার পতি।

যোব (২১)—(Jove) প্রাচীন গ্রীক ও রোমক জাতির দেবরাজ।

রসান (২৫)—স্বর্ণ বা রৌপ্যের অলঙ্কারে রং করিবার গন্ধকাদি-মিশ্রিত জল।

রাতুল (১২)—রক্তবর্ণ; লাল।

রায়বার (৮)—স্তুতিপাঠক।

রেঝা (৯)—লক্ষিত স্থান; নিশানা।

শশারু (৯)—শশক; খরগোশ।

শরভ (৮)—মৃগবিশেষ।

সন্ধ (৬১)—সন্দেহ।

সাফাই (৮২)—দোষ-ক্ষালন।

সারদ্র (৬)—পীত; হরিদ্রাবর্ণ।

সিনান (২)—স্নান।

সেঁউতি (১৬)—নৌকা হইতে জল সেঁচিবার কাঠের পাত্র।

সেরেফ (৮২)—কেবল; মাত্র।

হাজরা (৮)—(হাজারী) হাজারের অধিনায়ক।

কবি-পরিচয়

অক্ষয়কুমার বড়াল—(১৮৬০—১৯১৯) রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক বিখ্যাত গীতি-কবি। ইঁহার কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে 'এষা' সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। অপর কয়েকখানি কাব্যের নাম—'প্রদীপ' 'কনকাঞ্জলি' ও 'শঙ্খ'। ইনি কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর কাব্য-শিষ্য ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ সেনের মত, ইঁহার কবিতাও রবীন্দ্রযুগের গীতি-কবিতা হইতে স্বতন্ত্র। অক্ষয়কুমারের কবিতার প্রধান লক্ষণ দুইটি,—(১) ভাষার অত্যধিক শব্দ-সংক্ষেপ বা মিত-ভাষিতা, এবং তজ্জন্য ভাবের গাঢ়তা; তাঁহার ভাষার বিশুদ্ধিও লক্ষণীয়; (২) আধুনিক গীতিকবিতার যাহা প্রধান লক্ষণ সেই আত্মভাবপ্রধান কল্পনা, বা কল্পনার মন্ময়তা (subjectivity); এজন্য তাঁহার কাব্যে (বিশেষতঃ 'প্রদীপ' ও 'কনকাঞ্জলি'তে) একটি অতি মধুর ভাবাবেশ-বিহ্বল গীতি-মূর্চ্ছনা আছে—এই সুর তিনি বিহারীলালের নিকটে পাইয়াছিলেন, ও তাহাকে স্বকীয় প্রেম-কল্পনায় অধিকতর ঝঙ্কৃত করিয়াছিলেন। [৫৫, ৫৬, ৫৭]

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত—(১৮১২—১৮৫৯)—নদীয়া জেলার কাঁচড়াপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র পুরাতন যুগের শেষ খাঁটি বাঙ্গালী কবি। তাঁহার রচনার কোন কোন লক্ষণে, এবং তাঁহার নানা সাহিত্যিক প্রচেষ্টার মধ্যে, নূতন যুগের সূচনাও লক্ষ্য করা যায়। তিনি 'সংবাদ প্রভাকর' নামক বিখ্যাত কবিতার সম্পাদক ছিলেন, এবং তাহার পরিচালনাসূত্রে সাহিত্যের বহু উপকার করিয়াছিলেন। এই 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় পরবর্ত্তী যুগের কয়েকজন বিখ্যাত লেখক—বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু প্রভৃতির সাহিত্য-চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছিল। তাঁহার প্রধান কাব্য 'বোধেন্দু বিকাশ'—ইহা নাটকাকারে রচিত। 'হিত-প্রভাকর' নামে তিনি গদ্যে ও পদ্যে আর একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। এই দুইখানিরই মূল সংস্কৃত। ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার সময়ের বাঙ্গালী সমাজের বহু বাস্তব চিত্র, কখনও ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ, কখনও হাস্যরসমণ্ডিত করিয়া, অতিশয় সহজ ছন্দে ও খাঁটি বাংলাভাষায় রচনা করিয়াছিলেন; এই গুলির জন্যই তিনি অতিশয়

লোকপ্রিয় হইয়াছিলেন। তিনি বহু নীতি ও ধর্ম্মবিষয়ক কবিতাও রচনা করিয়াছিলেন। [২১, ২২, ২৩]

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী—(খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ) বর্দ্ধমান জেলার সেলিমাবাদ পরগণার রায়না থানার অধীন দামোদর নদীর তীরবর্ত্তী দামুন্যা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জাতিতে রাঢ়ী শ্রেণীর শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহার পিতার নাম হৃদয় মিশ্র। স্থানীয় শাসনকর্ত্তার অত্যাচারে কবি দেশত্যাগ করিয়া আরড়া গ্রামের জমিদার বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই আরড়া গ্রাম এক্ষণে মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। এইখানে বসিয়া কবি তাঁহার বিখ্যাত 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। মুকুন্দরাম ষোড়শ শতাব্দীর লেখক হইলেও ('চণ্ডীমঙ্গল' ঐ শতাব্দীর শেষে রচিত), তিনিই বাংলা ভাষায় প্রথম সাহিত্য-রচয়িতা ; এজন্য তিনি পুরাতন বাংলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। গল্প বলিবার শক্তি, হাস্যরস, বাস্তব বর্ণনা এবং চরিত্রাঙ্কণ, এই কয়টি বিষয়ে মুকুন্দরাম যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহার তুলনা করিতে হইলে একেবারে ভারতচন্দ্রে আসিতে হয়। তিনিই বাংলা সাহিত্যের প্রথম আখ্যান-শিল্পী। মুকুন্দরামের কাব্যে তৎকাল-প্রচলিত বাংলা শব্দের বহুল প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। ইহার কারণ, সকল বস্তুর সম্বন্ধে তাঁহার সমান কৌতূহল ছিল, এবং তাহাদের যতদূর সম্ভব বিস্তারিত ও যথার্থ বর্ণনাও তাঁহার অভিপ্রায় ছিল ; এজন্য ভাষার সকল শব্দকে কাজে লাগাইতে হইয়াছে। আরও কারণ, শব্দমাত্রের প্রতিই তাঁহার বোধ হয় একটা মমতা ছিল। ইহার ফলে, আমরা সেকালের বাংলা ভাষার একটি খাঁটি রূপ তাঁহার রচনায় চাক্ষুষ করিতে পারি। এই হিসাবে তাঁহার কাব্যের একটি পৃথক মূল্য আছে। [৮, ৯]

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন—(জন্ম, আনুমানিক ১৭১৮—২৩ খৃঃ) জাতিতে বৈদ্য ; জন্মস্থান চব্বিশ পরগণার অন্তঃপাতী হালিসহরের নিকট কুমারহট্ট গ্রামে—এখন সে স্থানকে হালিসহরই বলে। রামপ্রসাদ তাঁহার কালীবিষয়ক সাধন-সঙ্গীতের জন্য বিখ্যাত হইয়াছেন। বাংলা ভাষায় এই ধরণের গীতি আর আর নাই ('কবিতা-পাঠ' দেখ)। এই কবিই (সম্ভবতঃ যৌবনে) দুইখানি কাব্য

রচনা করিয়াছিলেন—একখানি 'বিদ্যাসুন্দর' ; এবং অপরখানি কয়েকটি গানের সমষ্টি, তাহার বিষয় গৌরী বা উমার বাল্যলীলা—যদিও তাহা পরে 'কালীকীর্ত্তন' নামে মুদ্রিত হইয়াছে। বাংলা কাব্যের ইতিহাসে রামপ্রসাদের কাব্য দুইখানির স্থান যেমনই হৌক (তাঁহার কাব্যরচনার শক্তিও অল্প নহে)—ঐ গানগুলিই তাঁহাকে অমর করিয়াছে। [১৭, ১৮, ১৯]

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়—(১৮৭৭—)—১২৮৪ সালের ৫ই অগ্রহায়ণ, নদীয়া জেলার শান্তিপুর সহরে জন্ম হয়। সাক্ষাৎ রবীন্দ্র-শিষ্যগণের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। কবি বিহারীলাল ও দেবেন্দ্রনাথ সেনের ভক্ত। করুণানিধানের কবিতায় ভাষার লাবণ্য, শব্দচয়নের অসাধারণ নৈপুণ্য, এবং শব্দের সাহায্যে প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণ ও রূপ চিত্রিত করিবার শক্তি—এই তিনটি গুণ বিশেষ ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। ভাবের দিক দিয়া তিনি যেমন নিছক সৌন্দর্য্য-প্রীতির কবি, তেমনই ছন্দের অনুযায়ী ভাষা, ও ভাবের অনুযায়ী শব্দ-সঙ্গীত রচনাতেও তিনি আশ্চর্য্য দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন, এবং ভাষার ললিত-মধুর ও উদাত্ত-গম্ভীর—দুই সুরেরই সাধনা করিয়াছেন। তথাপি, করুণানিধান বাংলা গীতিকাব্যে যে একটি নূতন ধরণের প্রকৃতি-প্রেম যুক্ত করিয়াছেন তাহাই তাঁহার প্রতিভার মৌলিকতা, ও কবিত্বের প্রধান নিদর্শন। ইঁহার রচিত কাব্যগুলির নাম—'প্রসাদী', 'ঝরাফুল', 'শান্তিজল', 'ধান-দুর্ব্বা'। [৬৭, ৬৮, ৬৯]

কাজি কাদের নওয়াজ—(১৯০৯ —) নিবাস বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত মঙ্গলকোট গ্রাম। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদ জেলায় মাতুলালয়ে জন্ম হয়। অতি অল্প বয়স হইতেই কবিতা লিখিতেছেন। বহরমপুর কলেজ হইতে বি-এ, এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম-এ পাশ করেন, পরে বি-টি পরীক্ষাও পাশ করিয়া সরকারী শিক্ষাবিভাগে অধ্যাপনা-কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। 'মরাল' নামে তাঁহার একখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। এক্ষণে তিনি প্রাগ্-ইস্লামিক যুগের এক বিখ্যাত বেদুইন-কবির কাব্য অনুবাদ করিতেছেন। অপেক্ষাকৃত আধুনিক বাঙালী মুসলমান কবিদিগের মধ্যে ইঁহার রচনাও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। [৯৯]

কাজি নজরুল ইস্‌লাম—(১৮৯৯—) কবির জন্মস্থান বর্দ্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে। গত মহাযুদ্ধের সময়ে অতি অল্প বয়সে, তিনি 'বেঙ্গল রেজিমেণ্ট' নামক বাঙালী পলটনে যোগদান করিয়া মেসোপটেমিয়া যাত্রা করেন, এবং 'হাবিলদার' পদ লাভ করেন। যুদ্ধশেষে দেশে ফিরিয়া তিনি 'মোস্‌লেম ভারত' নামক একখানি নূতন সাহিত্য-পত্রিকায় কবিতা প্রকাশ করিতে থাকেন। সেই কবিতাগুলির আশ্চর্য্য ছন্দোনৈপুণ্য ও প্রবল কবিত্বপূর্ণ আবেগ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এবং ক্রমে তিনি একজন অসাধারণ কবি-বালক রূপে সর্ব্বত্র খ্যাতি লাভ করেন—তেমন খ্যাতি ইদানিং আর কোন কবি লাভ করেন নাই। কবি নজরুলের কবিতায় আধুনিক যুব-মনের একটি বিশেষ প্রবৃত্তি—অর্থাৎ প্রাচীন সমাজের জীর্ণ ও অস্বাস্থ্যকর নানা সংস্কার ও নির্জ্জীব আচারের বন্ধন ছিন্ন করার যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা—তাহারই ভৈরীরব অতিশয় দৃপ্ত ও অধীর ছন্দে বাজিয়া উঠিয়াছিল; তাই তিনি এত জনপ্রিয় হইয়াছেন। তাঁহার দ্বারা আরও একটি উপকার হইয়াছে। তিনি এ যুগের প্রথম মুসলমান কবি—যাঁহার রচনায় সারা বাঙলা দেশ সাড়া দিয়াছে, এবং একজন বড় কবি বলিয়া যাঁহার খ্যাতি রটিয়াছে। ইহার ফলে, বাঙালী মুসলমান-সমাজে মাতৃভাষায় সাহিত্য রচনার উৎসাহ এবং তাহাতে গৌরব-বোধ জাগিয়াছে; কবি নজরুল ইস্‌লাম যেন একটি আত্মবিস্মৃত সমাজকে নিজের শক্তিসম্বন্ধে উদ্‌বুদ্ধ করিয়াছেন। শেষের দিকে তিনি অজস্র গান রচনা করিয়াছেন—সেই গানগুলিতেই তাঁহার প্রতিভার বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। কবি নজরুলের বহু কাব্যগ্রন্থের মধ্যে এইগুলি উল্লেখযোগ্য—'অগ্নিবীণা', 'বিষের বাঁশী', 'দোলন চাঁপা', 'সিন্ধু-হিন্দোল', 'ছায়ানট', 'বুলবুল'। [৮৯, ৯০; ৯১]

কামিনী রায়—(১৮৬৪—১৯৩৩) বরিশাল জেলার অন্তর্গত বাসণ্ডা গ্রামে জন্ম। বিখ্যাত ঐতিহাসিক লেখক চণ্ডীচরণ সেনের কন্যা ও সেসন্স জজ কেদারনাথ রায়ের পত্নী। বাংলার মহিলা-কবিগণের মধ্যে ইঁহার স্থান খুব উচ্চে। ইঁহার রচিত কাব্যগুলির মধ্যে প্রথম কাব্য 'আলো ও ছায়া'ই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; অপরগুলির নাম—'নির্ম্মাল্য', 'পৌরাণিকী', 'দীপ ও ধূপ' প্রভৃতি। কবিত্বের পরিচয় 'কবিতা-পাঠে'র প্রসঙ্গে পাইবে। [৫০, ৫১]

কালিদাস রায় (কবিশেখর)—(১৮৮৯—) ১২৯৬ সালের আষাঢ় মাসে, রাঢ়ীয় বৈদ্যবংশে, বর্দ্ধমান জেলার কড়ুই গ্রামে ইহার জন্ম হয়। বিখ্যাত বৈষ্ণব কবি লোচনদাস ঠাকুর ইঁহার পূর্ব্বপুরুষ। কবিত্বের পরিচয় 'কবিতা-পাঠের' যথাস্থানে পাইবে। ইনি 'কুন্দ', 'কিশলয়', 'পর্ণপুট', 'বল্লরী', 'ব্রজবেণু', 'ঋতু-মঙ্গল', রসকদম্ব', 'বৈকালী' প্রভৃতি বহু কাব্য রচনা করিয়াছেন। [৮৬, ৮৭, ৮৮]

কাশীরাম দাস—(খ্রীঃ ষোড়শ—সপ্তদশ শতাব্দী) ইঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভ—'বাঙালীর মহাভারত'। 'মহাভারতে'র রচনা-কাল আনুমানিক ১৬০০—১৬১০ খ্রীষ্টাব্দ। কাশীরাম দাসের জন্মস্থান বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত সিঙ্গি গ্রাম। ইনি দেব-উপাধিক কায়স্থ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ('কবিতা পাঠ' দেখ) [১০, ১১, ১২]

কায়কোবাদ—(১৮৫৯—) গতযুগের কবিগণের মধ্যে একমাত্র ইনিই এখনও জীবিত আছেন—বয়সে রবীন্দ্রনাথেরও অগ্রজ। ভাবের সহজ উৎসার, ছন্দের মুক্ত-গতি, এবং ভাষার একটি সরল ও বিশুদ্ধ রীতি—এই তিনটি তাঁহার কবিতার প্রধান লক্ষণ, এবং তাহাতে তিনি হেম-নবীনের আদর্শই অনুসরণ করিয়াছেন; অতএব, ইঁহাকে সেই যুগেরই শেষ-কবি বলা যাইতে পারে। ইনি—'মহাশ্মশান', 'বিরহ-বিলাপ', 'কুসুম-কানন', 'অশ্রুমালা' প্রভৃতি কাব্য-রচনা করিয়াছেন। [৪৯]

কিরণধন চট্টোপাধ্যায়—(১৮৮৭—১৯৩১) নিবাস হুগলী জেলার উত্তরপাড়া শহর; বাংলা ৩রা ফাল্গুন, ১২৯৩ সালে ভবানীপুরে মাতুলালয়ে জমিদার-বংশে জন্ম হয়; পিতার নাম কৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায়। কিরণধন ইংরাজী সাহিত্য ও দর্শন দুই বিষয়ে এম-এ,—এবং বি-এল উপাধিও লাভ করেন। ১৯১১ সালে তাঁহার বিবাহ, এবং তাহার নয় বৎসর পরে পত্নীবিয়োগ হয়। কিছুদিন ওকালতী করিলেও তাঁহার কর্ম্মজীবন অধ্যাপনাকার্য্যেই অতিবাহিত হয়। তিনি উত্তরপাড়ার বিভিন্ন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, একটি অবৈতনিক বিদ্যালয়ও স্থাপন করিয়াছিলেন। ইং ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯৩১ সনে তাঁহার মৃত্যু হয়। উত্তরপাড়ার অধিবাসিগণ, তাঁহার

প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ, তাঁহার বসতবাটিতে একটি মর্ম্মরনির্ম্মিত স্মৃতিফলক স্থাপন করিয়াছেন। ১৩৩০ সালে, অর্থাৎ পত্নীবিয়োগের তিন বৎসর পরে, কিরণধনের একমাত্র কাব্য 'নতুন-খাতা' প্রকাশিত হয়; এই একখানি কাব্যের দ্বারাই তিনি সে সময়ে যে কবিখ্যাতি লাভ করেন তাহা আজও অক্ষুণ্ণ আছে। ইহার কারণ, এই কাব্যখানিতে একটি অভিনব কবি-হৃদয়ের পরিচয়—ভাষার অকৃত্রিম ভঙ্গী ও ভাবের অকপট উৎসারে—উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। কবিতার পরিমাণই যে কবিত্বের মানদণ্ড নয়, এই কাব্যখানি তাহাই প্রমাণিত করিয়াছে। এই কাব্যের শব্দ-মুকুরে, এক অতিশয় ভাব-বিহ্বল, বেদনা-কাতর, উদার ও মহৎ হৃদয়ের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে—কবিতার মধ্য দিয়া কবি-মানুষটির এমন পরিচয়-লাভ ক্বচিৎ ঘটিয়া থাকে। 'নতুন-খাতা'র কয়েকটি কবিতায় পত্নীবিয়োগবিধুর কবির স্মৃতি-শোক—বৃষ্টি-সজল আকাশে ইন্দ্রধনুচ্ছটার মত—যে একটি অপূর্ব্ব-সুন্দর করুণ রসের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা বাংলা কাব্যে অন্যত্র দুর্লভ। [৮১, ৮২]

কুমুদনাথ লাহিড়ী—(১৮৮০—১৯৩৩) ১২৮৬ সালের মাঘ মাসে ফরিদপুর জেলার কোড়কদী গ্রামে জন্ম হয়; ১৩৪০ সালের আষাঢ় মাসে কলিকাতায় মৃত্যু হয়। স্বদেশী-আন্দোলনের যুগে, বিনয়কুমার সরকার, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ যে কয়জন তরুণ অতিশয় সাত্ত্বিক শুভ আদর্শে দেশ-সেবা করিতে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন—কুমুদনাথ ছিলেন তাঁহাদেরই একজন। এই তরুণ সাধকমণ্ডলীর দ্বারা পরিচালিত 'গৃহস্থ' নামে একখানি পত্রিকা সে সময়ে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল—কুমুদনাথ এই পত্রিকায় নিয়মিত সাহিত্য-চর্চ্চা করিতেন। পরে, রাজনৈতিক অবস্থার বশে, ও সেকালের প্রবল ঘটনা-বর্ত্তে সেই তরুণ-সংঘ, আরও অনেক সংঘের মতই, বিনষ্ট হইয়া গেল; কুমুদনাথ আপনার একক সাধনায় স্বপ্রতিষ্ঠ থাকিয়া সারাজীবন অন্তরালে কাটাইয়াছিলেন। 'সাহিত্য' 'প্রবাসী' 'উপাসনা' 'বিচিত্রা' 'বঙ্গবাণী' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁহার কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত। শেষ জীবনে তিনি আসানসোলের ইংরাজী স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন। 'সাগরের ডাক', 'বিল্বদল' এবং 'পাপ ও পুণ্য' নামে তাঁহার তিনখানি কাব্য প্রকাশিত হইয়াছিল।

শ্রীযুক্তা সরলাবালা সরকার তাঁহার একটি জীবনী লিখিয়াছেন। 'কবিতা-পাঠে'র যথাস্থানে কবিত্বের পরিচয় দ্রষ্টব্য। [১০০]

কুমুদরঞ্জন মল্লিক—(১৮৮২—) বর্দ্ধমান জেলার 'উজানী' গ্রামে বৈদ্যবংশে জন্ম হয়। ইনি দীর্ঘকাল মাথরুণ-(বর্দ্ধমান জেলা)-উচ্চ ইংরাজী স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন, এখন অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। কবিহিসাবে ইঁহাকে প্রাচীন বৈষ্ণব কবিগণের আধুনিক বংশধর বলা যাইতে পারে—ইঁহার প্রাণ-মন সেই প্রেম ও ভক্তিরসে পূর্ণ। কবি কুমুদরঞ্জন পুরা রবীন্দ্রযুগের কবি হইলেও, এবং তাঁহার কবিতার ভাষায় ও ছন্দে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ প্রভাব লক্ষিত হইলেও, তিনিই বোধ হয়, তাঁহার সমকালীন কবিগণের মধ্যে, কাব্যের ভাববস্তু ও প্রেরণার বিষয়ে, সর্ব্বাপেক্ষা সেই প্রভাবের বাহিরে থাকিতে পারিয়াছেন। এ বিষয়ে তিনি দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমারের সমকক্ষ। পূর্ব্বকালের বাঙালী সাধক-কবিগণের যে গান ভাবের সরলতা ও প্রাণের আকুলতায় মর্ম্মস্পর্শী হইয়া উঠিত—সেই গানই যেন কুমুদরঞ্জনের রচনায়, ভাব ও বিষয়-বৈচিত্র্যে, ছন্দে ও উপমা-অলঙ্কারে কবিতার আকার ধারণ করিয়াছে। তাঁহার কবিতার প্রধান লক্ষণ তিনটি,—(১) অতিশয় সরল অথচ চমকপূর্ণ ক্ষিপ্র-গভীর অনুভূতি ; এজন্য তাঁহার কবিতাগুলিতে ভাবের একাগ্রতা যেমন, কল্পনার বিস্তার তেমন নয়—খাঁটি গীতি-কবিতার মত তাহারা একটিমাত্র ভাবের উৎসারে নিঃশেষ হইয়া থাকে। (২) তাঁহার সৌন্দর্য্যদৃষ্টি সর্ব্বত্র ভক্তি অথবা প্রীতির আবেগে অশ্রুসজল হইয়া উঠে ; দুঃখেও কোন অসন্তোষ বা বিদ্রোহ নাই ; যাহা অতি তুচ্ছ ও সুলভ তাহাও তাঁহার কল্পনায় হাসি-অশ্রুর অপূর্ব্ব উৎস হইয়া উঠে। ইহার মূলে আছে—বাঙালীর জাতিগত একটি বিশিষ্ট কাল্‌চার (culture) বা চিত্তোৎকর্ষ—বৈষ্ণবসাধনার প্রভাব। এই হিসাবে কুমুদরঞ্জনের কবিতা এক শ্রেণীর খাঁটি বাংলা কবিতা ; কুমুদরঞ্জন বাংলার পল্লীকেই তীর্থমহিমায় মণ্ডিত করিয়াছেন, এজন্যও তাঁহার কবিতাকে খাঁটি বাঙালী-প্রাণের উৎসার বলা যাইতে পারে। (৩) তাঁহার ভাবপ্রকাশের প্রায় একমাত্র ভাষা—উপমা ; এই উপমা তাঁহার কবিতার কেবল অলঙ্কারই নয়, উহাই তাঁহার হৃদয়ের অতি গভীর ও অকপট অনুভূতি প্রকাশ

করিবার একমাত্র উপায়, এবং উহার মধ্যেই তাঁহার কাব্যের যতকিছু কৌশল ও কবিশক্তি প্রকাশ পাইয়াছে। ইনি 'অজয়', 'উজানি', 'একতারা', 'নূপুর', 'বনতুলসী', 'বনমল্লিকা' প্রভৃতি বহু কাব্য রচনা করিয়াছেন; কাব্য-গুলির নামেও তাঁহার বিশিষ্ট কবি-ভাবের পরিচয় রহিয়াছে। [৭৭, ৭৮, ৭৯]

কৃত্তিবাস ওঝা—(খৃঃ পঞ্চদশ শতাব্দী)। জন্ম তারিখ লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে বিস্তর মতভেদ আছে। ইনি নদীয়া জেলার অন্তর্গত ফুলিয়া গ্রামে পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রায় শেষে জন্মগ্রহণ করেন। মুখুটি-বংশীয় ব্রাহ্মণ—উপাধি ওঝা, অর্থাৎ উপাধ্যায়। অনেকের মতে কৃত্তিবাস গৌড়েশ্বর দনুজমর্দ্দন গণেশের আদেশক্রমে তাঁহার অমর কীর্ত্তি 'রামায়ণ' অনুবাদ করেন। এই 'রামায়ণে'র ভাষার বহু পরিবর্ত্তন হইয়া এখন এমন দাঁড়াইয়াছে যে, তাহাতে কৃত্তিবাসের নিজের ভাষা কতখানি আছে বলা কঠিন। তথাপি ইহাই কৃত্তিবাসের কবিত্বের নিদর্শন বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। ('কবিতা-পাঠ' দেখ)। [৩, ৪, ৫]

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার—(১৮৩৮—১৯০৭) বাংলা ১২৪৫ মাসে খুলনা জেলার সেনহাটি গ্রামে বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। এই দুই সাহিত্যের প্রভাব তাঁহার কবিতায় দেখা যায়—বিশেষ করিয়া পারস্য-কবি শেখ সাদীর ভাব তাঁহার রচনার বহু স্থলে আছে। 'সদ্ভাব-শতক'ই ইঁহার একমাত্র প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ। কবি যশোহর জেলার এক স্কুলের হেড পণ্ডিত ছিলেন; তিনি কয়েকখানি পত্রিকার সম্পাদকতাও করিয়াছিলেন। [৪০]

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী—(১৮৫৮—১৯২৪)—কলিকাতার ভবানীপুরে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম হারাণচন্দ্র মিত্র, আদি নিবাস পানিহাটি গ্রাম। ১৮৬৮ সালে বহুবাজারের সম্ভ্রান্ত জমিদার অক্রূর দত্তের প্রপৌত্র নরেশচন্দ্র দত্তের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। ১৫ বৎসর বয়সেই ইনি কবিতা রচনা করিয়া প্রশংসা লাভ করেন। ইনি চিত্রকলার চর্চ্চাও করিয়াছিলেন। ১৮৮৪ সালে তিনি বিধবা হন, এবং ইহার পরে তাঁহার প্রসিদ্ধ কাব্য 'অশ্রুকণা' রচনা করেন। 'শিখা' ও 'অর্ঘ' নামে তাঁহার আরও দুইখানি কাব্য আছে।

গিরীন্দ্রমোহিনীর কবিতায়, অতি সহজ সৌন্দর্য্যবোধ এবং সরল ভাবের সরল ভাষা—সেকালের একজন মহিলার পক্ষে বিশেষ প্রশংসার বিষয় ছিল, এবং মানকুমারী বসুর মত তিনিও এককালে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। [৪৮]

গোবিন্দচন্দ্র দাস—(১৮৫৫—১৯১৮)—ঢাকা জেলার ভাওয়ালের বিখ্যাত কবি, এবং তাঁহার কালে পূর্ব্ববঙ্গের শ্রেষ্ঠ গীতি-কবি। ভাওয়ালের অন্তর্গত জয়দেবপুর গ্রামে বাংলা ১২৬১ সালের ৪ঠা মাঘ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার সমসাময়িক আধুনিক কবিগণের তুলনায় গোবিন্দদাস তেমন শিক্ষিত না হইলেও, তাঁহার রচনায় আধুনিকতার ছাপ স্পষ্ট আছে, এবং ভাষায় ও কল্পনায় পাণ্ডিত্যের পরিচয়ও আছে। তাঁহার কল্পনার প্রসার বড় অল্প ছিল—কিন্তু ভাবের একাগ্রতা বা অনুভূতির তীব্রতা কিছু অধিক ছিল। তিনি যে সত্যকার স্বভাব-কবি ছিলেন, তাহার আর এক প্রমাণ—তাঁহার জীবন; সামাজিক বুদ্ধি বা বিচক্ষণতার অভাবে, এবং অতিশয় উদ্দাম ভাবপ্রবণ হওয়ায়, তিনি জীবনে বড় কষ্ট পাইয়াছিলেন—শুধু শোকতাপ ও দারিদ্র্যদুঃখই নয়, তাঁহাকে দারুণ উৎপীড়নও সহ্য করিতে হইয়াছিল। তাঁহার কাব্যগুলির মধ্যে এইগুলিই প্রধান—'কুঙ্কুম', 'কস্তুরী', 'প্রেম ও ফুল', 'বৈজয়ন্তী'। ('কবিতা-পাঠ' দেখ)। [৪৬, ৪৭]

গোবিন্দচন্দ্র রায়—(খৃঃ ১৯ শতক)—বরিশাল জেলার মীরপুর গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে প্রবাসী ছিলেন। ইঁহার কবিখ্যাতি কিছু বিচিত্র বলিতে হইবে, কারণ, ইঁহার কেবল দুইটি মাত্র কবিতা বাংলা ভাষায় অমর হইয়া আছে—'কতকাল পরে বল ভারত রে' এবং 'নির্ম্মল সলিলে বহিছ সদা তটশালিনী সুন্দরী যমুনে ও', (৪৩); তাহাতে কবিও অমর হইয়াছেন, এমন ভাগ্য অল্প কবির হয়। ইঁহার কবিতার এই পংক্তিটি প্রায় প্রবাদ-বাক্যে পরিণত হইয়াছে—"পর-দীপশিখা নগরে নগরে। তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।" [৪৩]

চণ্ডীদাস—(ষোড়শ শতাব্দী) প্রাচীন বাংলার আদি গীতি-কবির নাম বড়ু চণ্ডীদাস—ইঁহার জীবিত-কাল পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। এই চণ্ডীদাস ছাড়াও একাধিক চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব অস্বীকার করিবার

উপায় নাই। বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' নামে যে কাব্যখানি পাওয়া গিয়াছে—পরবর্ত্তী কালের চণ্ডীদাস-ভণিতার উৎকৃষ্ট পদগুলি তাহারই অনুকৃতি, কিম্বা তাহা হইতে ভাঙ্গিয়া পৃথক গীত-রচনা হইয়াছে—এইরূপ সিদ্ধান্ত পণ্ডিতেরা করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্ত আদৌ বিচারসহ নয়; তাহার প্রধান কারণ, এ বিষয়ে সামান্য কিছু প্রমাণ থাকিলেও—বাকী সবটাই অনুমান। বাংলাসাহিত্য ও বাংলা কাব্যের অনুরাগী বাঙালী পাঠক, এবং নবশিক্ষার্থী ছাত্রগণের পক্ষে ইহাই জানিয়া রাখিলে যথেষ্ট হইবে যে, চণ্ডীদাস নামে একাধিক কবি ছিলেন; তাঁহাদের একই নামের ভণিতাযুক্ত পদগুলির মধ্যে যেগুলি কীর্ত্তনিয়াদের কণ্ঠে, নানা ভঙ্গিতে নানা আখর-যুক্ত হইয়া, বাঙ্গালীকে এতকাল মুগ্ধ করিয়াছে, সেই পদগুলির রচয়িতা যিনি—সেই কবি চণ্ডীদাস ষোড়শ শতাব্দীর বিখ্যাত পদকর্ত্তাগণেরই একজন। আদি চণ্ডীদাস যে সত্যই বাংলার আদি কবি, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু পরবর্ত্তী যুগের বৈষ্ণব গীতি-কাব্য যে তাঁহারই প্রবর্ত্তিত ধারার অনুসরণ করিয়াছে—ইতিমধ্যে আর কোন ভাব-তরঙ্গ বা অভিনব কাব্য-প্রেরণার কারণ ঘটে নাই, এবং ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর প্রাণ-মনের একটি গভীরতর ও সর্ব্বাঙ্গীণ জাগৃতি ঘটে নাই—ইহা ঐতিহাসিক সত্যের বিপরীত। অতএব এই শতাব্দীতে চণ্ডীদাস নামে অপর একজন উৎকৃষ্ট কবির আবির্ভাব আদৌ অসম্ভব নহে। সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে ঐ 'চণ্ডীদাস' নামটিতে। চণ্ডীদাস-ভণিতায় অনেক উৎকৃষ্ট পদ এখন অন্য কবির রচিত বলিয়া জানা গিয়াছে; তৎসত্ত্বেও বাকি পদগুলির মধ্যে যেগুলি চণ্ডীদাস-ভণিতাযুক্ত—এবং উৎকৃষ্ট, সেগুলির কবি যে একজন শ্রেষ্ঠ গীতি-কবি, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই চণ্ডীদাসকেই অধুনা 'দ্বিজ চণ্ডীদাস' নামে পৃথক চিহ্নিত করা হইয়াছে; এবং ইনিই চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত প্রায় সকল উৎকৃষ্ট পদের রচয়িতা। [৬]

জসীম উদ্দীন—(১৯০৩—) কবি লিখিয়াছেন—তাঁহার "জন্মস্থান তাম্বুলখানা—ফরিদপুর সহর হইতে ১৬ মাইল দূরে একখানা বুনো জঙ্গলপূর্ণ গ্রাম"। পৈতৃক বাসস্থান উক্ত জেলার গোবিন্দপুর গ্রাম। তিনি বাংলার পল্লীজীবন ও

পল্লীপ্রকৃতির সহিত মনে-প্রাণে এমন ভাবে যুক্ত হইয়া আছেন যে, উচ্চশিক্ষা (এম-এ ডিগ্রি) লাভ করিয়া, অথবা বিদ্বান সমাজে বাস করিয়াও (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরূপে) তিনি তাঁহার সেই আজন্ম পল্লী-প্রেম এবং পল্লীজীবনের সংস্কার কিছুমাত্র ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহেন। আধুনিক বাঙালী কবিগণের মধ্যে এমন পল্লীপ্রেমিক কবি আর কেহ নাই, তাই তিনি শিক্ষিত সমাজের মনোভাব বা উচ্চতর সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা করিতে পারেন না; বাংলার—বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গের—মুসলমান চাষী-সমাজের জীবন-যাত্রা তাঁহাকে যেরূপ মুগ্ধ করে—তাহাদের নিজেদেরই রচিত ভাটিয়াল, জারী, মুর্শিদা প্রভৃতি গান, তাঁহার হৃদয় যেরূপ বিগলিত করে, তাহাতে তিনি বাংলার ঐ জীবন এবং ঐ সমাজকেই মানুষমাত্রের আদর্শ বলিয়া বিশ্বাস করেন, এবং নিজেকেও তাহাদেরই একজন মনে করিয়া গর্ব্ব অনুভব করেন। এইরূপ শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতা আছে বলিয়াই, কবি জসীম উদ্দীন এমন সুন্দর পল্লীগীতি রচনা করিতে পারিয়াছেন। তাঁহার কবিতায় আমরা বাঙ্গালী-জীবনের একটি অবজ্ঞাত দিক এবং তাহার মাধুর্য্যের পরিচয় পাইয়া বড় উপকৃত হইয়াছি। এ পর্যান্ত কবি এই কয়েকখানি কাব্য রচনা করিয়াছেন—'রাখালী' 'বালুচর', 'ধান-খেত', 'রঙিলা নায়ের মাঝি', 'নক্সীকাঁথার-মাঠ', 'সোজন বাদিয়ার ঘাট'। তাঁহার 'নক্সীকাঁথার মাঠ'-এর—"The Field of the Embroidered Quilt" নামে—ইংরাজী অনুবাদ হইয়াছে। [৯৩, ৯৪, ৯৫]

জ্ঞানদাস—(ষোড়শ শতাব্দী)—শ্রেষ্ঠ পদকর্ত্তাদিগের অন্যতম। প্রাচীন বর্দ্ধমান জেলার কাঁদড়া (কান্দুরা) গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইনি 'ব্রজবুলি' ভাষায় বহু পদ রচনা করিলেও, ইঁহার বাংলা পদগুলিই উৎকৃষ্ট। এই পদগুলির গভীর আন্তরিকতা, ভাবের স্বাভাবিকতা, এবং ভাষার গাঢ় অথচ সহজ ভঙ্গির গুণে ইনি চণ্ডীদাসের সমকক্ষ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন। [৭]

দেবেন্দ্রনাথ সেন—(১৮৫৫—১৯২০)—ইঁহার পিতা লক্ষ্মীনারায়ণ সেন হুগলী জেলার বলাগড় গ্রামের মজুমদার-উপাধিক এক সুপ্রাচীন বৈদ্যবংশ-সম্ভূত মহদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি দেশ ত্যাগ করিয়া বিহারের গাজীপুর শহরে গিয়া বসবাস কালে খেতাব-উপাধি (মজুমদার) ত্যাগ করিয়া বংশের 'সেন'

(সেনগুপ্ত) উপাধি গ্রহণ করেন। তথায় তিনি নানা ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়াও শেষ পর্য্যন্ত লক্ষ্মী-লাভ করিতে পারেন নাই ; ইহার কারণ, সাহস ও কর্ম্মশক্তি থাকা সত্ত্বেও তিনি অতিশয় সৌখীন ও মুক্তহস্ত ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের মাতাও সম্ভ্রান্তবংশের কন্যা ছিলেন ; তিনি যেমন বুদ্ধিমতী ছিলেন, তেমনই তাঁহার মনের শক্তিও ছিল অসাধারণ, তদুপরি প্রখর আত্মসম্মান-বোধ ছিল। ইহার বলে, স্বামীর মৃত্যুর পর দুরবস্থায় পড়িয়াও তিনি পাঁচটি পুত্রকে মানুষ করিয়া তুলিতে পারিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথই জ্যেষ্ঠ, অপর সহোদরগণও সকলেই বিদ্বান্ ও কৃতী হইয়াছিলেন ; সর্ব্বকনিষ্ঠ সুরেন্দ্রনাথ সেন এলাহাবাদ হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত জজ। ইনিও 'বড়দাদা'র ভক্তশিষ্য ও সুকবি। দেবেন্দ্রনাথ সম্ভবতঃ গাজীপুরেই জন্মগ্রহণ করেন। পরে তাঁহারা বিহার ত্যাগ করিয়া কর্ম্মোপলক্ষে যুক্তপ্রদেশের একাধিক স্থানে বাস করিয়াছেন ; তন্মধ্যে এলাহাবাদই প্রধান, দেবেন্দ্রনাথ এইখানেই ওকালতী করিতেন। তিনি কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি-এ পাশ করেন, পরে এম-এ উপাধিও লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনে নানা বিপর্য্যয় ও অবস্থান্তর ঘটিয়াছিল। শেষ-জীবনে তিনি দেরাদুনে বাস করিয়াছিলেন এবং সেইখানেই দেহত্যাগ করেন। কলিকাতায় 'শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা' নামক বিখ্যাত বৃহৎ স্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়া, তাহার সম্পর্কে বাংলার রাজধানীতে তিনি গতায়াত করিতেন ; কিন্তু তখনও বিষয়কর্ম্ম অপেক্ষা কাব্যের উন্মাদনা ও সাহিত্যিক বন্ধুগণের সঙ্গে আলাপ-আলোচনাতেই অধিকাংশ সময় কাটিত। আধুনিক গীতিকবিগণের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথের একটি অতি উচ্চ স্থান আছে। উচ্চশিক্ষার সহিত স্বাভাবিক কবি-প্রতিভা যুক্ত হইলে যাহা হয়, দেবেন্দ্রনাথের কাব্যে তাহাই হইয়াছে। তাঁহার কবিতার ভাষায়, ভাবে, ও ছন্দে এমন একটা কবি-প্রকৃতির পরিচয় আছে, যাহা অতিশয় মৌলিক। তিনি অসংখ্য কবিতা লিখিয়াছিলেন ; শেষে সেগুলিকে সংগ্রহ করিয়া কয়ভাগে প্রকাশিত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু নানাকারণে তাহা সুপ্রচারিত হয় নাই। তাঁহার এই কাব্যসংগ্রহের মধ্যে—'অশোকগুচ্ছ'ই (প্রথম সংস্করণ) সর্ব্বোৎকৃষ্ট। অন্যান্য-গুলির নাম—'পারিজাত গুচ্ছ', 'শেফালী গুচ্ছ', 'অপূর্ব্ব ব্রজাঙ্গনা', 'অপূর্ব্ব বীরাঙ্গনা' প্রভৃতি। [৫২, ৫৩, ৫৪]

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর—(১৮৩৯—১৯২৬)—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র—রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ সহোদর। ইনি সাহিত্য, দর্শন ও অঙ্কশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। সবচেয়ে বড় ছিল তাঁহার চরিত্র—তিনি ছিলেন ঋষির মত জ্ঞানী, শিশুর মত সরল, এবং প্রকৃত মহাপুরুষের মত সর্ব্বভূতে প্রীতিসম্পন্ন। প্রথম জীবনে তিনি কবিতা লিখিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন, তাঁহার রচিত 'স্বপ্নপ্রয়াণ' নামক কাব্য বাংলা কাব্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। [৪১]

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—(১৮৬৩—১৯১৩)—বিখ্যাত কবি ও নাট্যকার। দ্বিজেন্দ্রলাল ব্রাহ্মণকুলে এক অতি উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় কৃষ্ণনগরের মহারাজার দেওয়ান ছিলেন, এবং সেকালের শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সমাজে চরিত্র এবং বিদ্যার গুণে সম্মানিত হইয়াছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল অতিশয় মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১২৯১ সালে এম-এ পাশ করার পর ষ্টেট স্কলারশিপ পাইয়া বিলাত হইতে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করিয়া আসেন, পরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হন। দ্বিজেন্দ্রলালের কবিত্বশক্তি বাল্য হইতেই উন্মেষ লাভ করিয়াছিল। প্রথমে তিনি তাঁহার কয়েকটি ইংরেজী কবিতা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন—সেগুলিতে তাঁহার গভীর স্বদেশপ্রীতির প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহার পরে, তিনি হাসির গান ও কয়েকখানি হাস্যরসাত্মক নাটক রচনা করিয়া অতি সত্বর খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার হাস্যরসের রচনাগুলিতে এমন একটি নূতন সুর ও ভঙ্গি আছে যাহা বাংলা সাহিত্যে পূর্ব্বে বা পরে আর দেখা যায় নাই—সেই হাসির গানগুলিই তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। 'মন্দ্র', 'আলেখ্য' ও 'আষাঢ়ে'—এই তিনখানি কাব্যে তিনি যে কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতেও একটি নিজস্ব ভাব ও ভঙ্গি আছে। শেষের দিকে, বাংলার স্বদেশী-আন্দোলনের যুগে, দ্বিজেন্দ্রলাল দেশবাসীর চরিত্র উন্নত এবং তাহাদের মনে স্বদেশপ্রীতি ও স্বজাতি-গৌরব জাগ্রত করিবার অভিপ্রায়ে, অনেকগুলি নাটক রচনা করিয়াছিলেন—সেগুলি সেকালে অতিশয় জনপ্রিয় হইয়াছিল; ইহাদের মধ্যে—'দুর্গাদাস', 'রাণাপ্রতাপ', 'চন্দ্রগুপ্ত' ও 'মেবার পতন'—উল্লেখযোগ্য। [৬৩, ৬৪, ৬৫]

নবীনচন্দ্র দাস—(১৮৫৩—১৯- ?)—চট্টগ্রাম জেলার আলামপুর গ্রামে বৈদ্যবংশে জন্ম হয়। বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিত রায়-বাহাদুর শরচ্চন্দ্র দাস সি, আই, ই ইঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন। ছাত্র নবীনচন্দ্র এণ্ট্রান্স হইতে এম-এ পরীক্ষা পর্য্যন্ত অতি উচ্চস্থান ও বৃত্তি লাভ করিয়া--বি-এল পরীক্ষাতেও সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। প্রথমে চট্টগ্রাম কলেজে আইনের অধ্যাপক ও পরে ১৮৭৯ সনে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হন, এবং ৩১ বৎসর এই কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তন্মধ্যে দুইবার অস্থায়ী ডিষ্ট্রীক্‌ট্ ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন। এইরূপ দায়িত্বপূর্ণ রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও তাঁহার সাহিত্য-চর্চ্চা ও বিদ্যাচর্চ্চার বিরাম ছিল না। সংস্কৃত 'রঘুবংশ', 'কিরাতার্জ্জুন' ও 'শিশুপালবধ' (আংশিক), এবং সোমেন্দ্রকৃত 'চারুচর্য্যাশতক' প্রভৃতির অনুবাদ করিয়া তিনি নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজ হইতে 'কবিগুণাকর' উপাধি পাইয়াছিলেন। 'রঘুবংশে'র বঙ্গানুবাদই তাঁহার অমর কীর্ত্তি। [৪৪]

নবীনচন্দ্র সেন—(১৮৪৬—১৯০৯)—বাংলা ১২৫৩ সালে চট্টগ্রাম জেলার নয়াপাড়া গ্রামে জন্ম হয়। ১২৬৮ সালে বি-এ পাশ করিয়া ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হন। নবীনচন্দ্র নূতন যুগের ('পরিবর্ত্তন-যুগ'এর ভূমিকা দেখ) মহাকবিগণের অন্যতম। তাঁহার কবিতায় ভাব ও ভাবুকতার একটা গম্ভীর উন্নত আদর্শ-রক্ষার প্রয়াস আছে। তাঁহার কল্পনাশক্তি—বিশেষতঃ গল্প-রচনার শক্তি—কিছু অবাধ ও স্বাধীন ছিল, :এবং ভাবের উচ্ছ্বাসেও একটু বাড়াবাড়ি ছিল : তথাপি তাঁহার ভাষা অতিশয় প্রাঞ্জল, এবং ছন্দও মধুর-গম্ভীর। একদিকে অবাধ কল্পনা ও ভাবের কিঞ্চিৎ আধিক্য, অপর দিকে, সর্ব্বত্র জীবনের একটা উচ্চ আদর্শ-প্রচার—তাঁহার কাব্যগুলিকে একসময়ে শিক্ষিত হিন্দু-সমাজের বড়ই উপাদেয় করিয়া তুলিয়াছিল। একজন পণ্ডিত তাঁহার—'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র' ও 'প্রভাস'—এই তিনখানি কাব্যকে—'উনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত' নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। নবীনচন্দ্র শেষে কাব্যসাহিত্য হইতে ধর্ম্মজীবন ও ধর্ম্মতত্ত্বের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার কাব্যগুলির মধ্যে "পলাশীর যুদ্ধ" একটি উৎকৃষ্ট রচনা; ইহার প্রবল কবিত্ব এবং রচনার নূতন ভঙ্গি সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল—এই কাব্যের দ্বারাই তিনি সাধারণের মধ্যে কবি-

খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। 'অবকাশরঞ্জিনী' নামে তিনি যে খণ্ডকবিতাগুলি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা এখন প্রায় অপাঠ্য বলিলেই হয়। [৪২]

প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—(১৯০৪—) রবীন্দ্রযুগের সর্ব্বকনিষ্ঠ কবিগণের মধ্যে প্রভাতমোহন একটি বিশিষ্ট স্থান দাবী করিতে পারেন। পৈত্রিক নিবাস হুগলী জেলায়। ইঁহার জননী পরলোকগতা ইন্দিরা দেবী (৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের দৌহিত্রী এবং অনুরূপা দেবীর ভগিনী) এককালে গল্প ও উপন্যাস লিখিয়া সাহিত্যসমাজে পরিচিত হইয়াছিলেন। প্রভাতমোহন অতি অল্প বয়সেই কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। পরে 'বিশ্বভারতী' বিদ্যাপীঠে সাহিত্য ও কলাবিদ্যার চর্চ্চা করেন, এবং উদীয়মান চিত্রশিল্পীরূপে খ্যাতি অর্জ্জন করেন। শেষে রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনে ঝাঁপ দিয়া এবং অশেষ কষ্ট সহ্য করিয়া, চরিত্র ও মানসিক দৃঢ়তার পরিচয় দেন। বর্ত্তমানে তিনি সম্পূর্ণ নিজের শক্তিসামর্থ্যের দ্বারা একটি জাতীয়-আদর্শের শিক্ষাশ্রম পরিচালনা করিতেছেন। তাঁহার একমাত্র প্রকাশিত কাব্য-গ্রন্থ 'মুক্তি-পথে' সরকার কর্ত্তৃক বাজেয়াপ্ত হইয়াছে। ('কবিতা-পাঠের' যথাস্থান দেখ)। [৯৬]

প্রমথ চৌধুরী—(১৮৬৭—) পাবনা জেলার হরিপুর গ্রামের বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণকুলে জমিদার বংশে জন্ম, জন্মস্থান যশোর। শৈশব ও বাল্যজীবন নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর সহরেই অতিবাহিত হয়, এজন্য তিনি কথ্য-বাংলার সুন্দর ভঙ্গি ও বাক্‌চাতুরী যেমন আয়ত্ত করিয়াছিলেন, তেমনি, সহজাত প্রতিভার বলে সেই ভাষায় তিনি নিজের অতিশয় মার্জ্জিত রসিকতা, নানা চিন্তার ভিতর দিয়া প্রকাশ কয়িয়াছেন। এই সকল রচনায় তিনি 'বীরবল' এই ছদ্মনাম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার ভাষার ঐ ভঙ্গীকে 'বীরবলী' ভঙ্গী বলা হইয়া থাকে। প্রমথনাথ, অনেক প্রবন্ধ নিবন্ধ এবং কতকগুলি গল্পও রচনা করিয়াছেন। তাঁহার 'নানা কথা', 'চার-ইয়ারী কথা' এবং 'নীললোহিত' প্রভৃতি গদ্যরচনা বাংলাসাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। তিনি 'সনেট পঞ্চাশৎ' নামে একখানি কবিতাগ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন—তাহারও ভাষায়, ভাবে এবং ছন্দে তাঁহার নিজস্ব ভঙ্গী বজায় আছে। 'সবুজ পত্র' নামক বিখ্যাত পত্রের সম্পাদকতা করিয়াও তিনি সাহিত্য-সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। [৬৬]

বিদ্যাপতি—(১৪শ—১৫শ শতাব্দী) মিথিলার রাজা শিবসিংহের সভাসদ ছিলেন। ইনি চণ্ডীদাসেরও পূর্ব্ববর্ত্তী। ভিন্ন দেশ ও ভিন্ন ভাষার কবি হইলেও, বাঙালীই ইঁহার কাব্য হৃদয়ে গ্রহণ করিয়া, ইঁহার কবিতা ও কবিতার ভাষাকে বাংলাসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছে। পরবর্ত্তী যুগের শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কবিগণ ইঁহাকে আদর্শ করিয়া বহু পদ রচনা করিয়াছেন। এ কারণে বিদ্যাপতি মৈথিল হইলেও বাঙালী কবি হইয়া গিয়াছেন। তিনি পদাবলী ছাড়াও বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। বিদ্যাপতির পদগুলির ভাষা ও ছন্দ যেমন জমকালো, তেমনই খাঁটি কাব্যহিসাবে তাঁহার রচনার একটি বিশেষ মূল্য আছে। [১, ২]

বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী—(১৮৩৫—১৮৯৪) কলিকাতার নিমতলা পল্লীতে জন্ম হয়। ১২৮১ সালে 'আর্য্যদর্শন' পত্রিকার সম্পাদনা করেন। 'সারদামঙ্গল' কাব্যই তাঁহার শ্রেষ্ঠ কাব্য ; অপর কাব্যগুলির মধ্যে 'সাধের আসন', 'বঙ্গসুন্দরী', 'নিসর্গ-সন্দর্শন' ও 'প্রেম-প্রবাহিনী' প্রধান। বিহারীলাল জীবিত-কালে কবি-যশ লাভ করিতে পারেন নাই ; তার কারণ, তাঁহার সময়ে নূতন গীতি-কবিতার সুর কেহ বুঝিত না, এবং তখন মহাকাব্যেরই বিশেষ আদর ছিল। কিন্তু পরবর্ত্তী যুগে রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি কবিগণের দ্বারা যখন নূতন গীতি-কবিতার অপূর্ব্ব রূপ—ভাবে, ভাষায় ও ছন্দে—প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন দেখা গেল, কবিতার এই নূতন আদর্শ ও নূতন ভঙ্গী বিহারীলাল হইতেই সুরু হইয়াছে, এবং তাঁহার কবিতার মধ্যে ভাবের যে সূক্ষ্ম বীজটি ছিল—পরবর্ত্তীগণের কবিতায় তাহাই নানারূপে বিকশিত পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছে। এজন্য বিহারীলালকেই নব্য গীতিকবিতার প্রবর্ত্তক বলা যাইতে পারে, এবং সেই হিসাবে বাংলা কাব্যের ইতিহাসে তাঁহার একটি অতি উচ্চ স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়া গেছে। ('কবিতা-পাঠ' দেখ)। [৩২, ৩৩]

মদনমোহন তর্কালঙ্কার—(১৮১৫—১৮৫৮)—বাংলা ১২২২ সালে নদীয়া জেলার বিল্বগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম রামধন চট্টোপাধ্যায়। সংস্কৃত কলেজে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহপাঠী ছিলেন, এবং অল্প বয়সেই অসাধারণ মেধা ও কবিত্বশক্তির পরিচয় দেন। বিশ বৎসর বয়সেই তিনি সংস্কৃত

গদ্যকাব্য 'বাসবদত্তা' অবলম্বনে বাংলা 'বাসবদত্তা' কাব্যখানি রচনা করেন। ১২৬৪ সালের ২৭শে ফাল্গুন বিসূচিকা রোগে তাঁহার মৃত্যু হয়। এককালে তাঁহার রচিত 'শিশুশিক্ষা' (তৃতীয় ভাগ) বাঙ্গালী শিশুমাত্রেই পাঠ করিত, এবং তাহাতেই তাঁহার নাম সর্ব্বজনবিদিত হইয়াছিল। [২৪]

মাইকেল মধুসূদন দত্ত—(১৮২৪—১৮৭৩)—১৮২৪ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারী যশোহর জেলার অন্তর্গত সাগরদাঁড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম রাজনারায়ণ দত্ত। ১২।১৩ বৎসর বয়সে কলিকাতায় আসিয়া পিতার খিদিরপুরের বাড়ীতে থাকিয়া হিন্দু-কলেজে সিনিয়ার ক্লাস পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন। ১৮৪৩ সালে তিনি খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন, এবং তাহার পর হিন্দু-কলেজ ছাড়িয়া বিশপ্স্ কলেজে কিছুকাল অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে মধুসূদন মাদ্রাজ গমন করেন, এবং তথায় জীবিকার জন্য শিক্ষকের কর্ম্ম গ্রহণ করেন। ঐখানে অবস্থানকালে তিনি তথাকার প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরেজ অধ্যক্ষের কন্যা শ্রীমতি হেনরিয়েটার পাণিগ্রহণ করেন, এবং ইংরেজী কবিতা লিখিয়া ও সংবাদপত্র পরিচালনা করিয়া খ্যাতিলাভ করেন। অতঃপর পিতার মৃত্যুর পরে দেশে ফিরিয়া তিনি সেকালের সম্ভ্রান্ত কৃতবিদ্য বাঙ্গালী সমাজে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সুযোগ পাইলেন, এবং বাংলাসাহিত্যের দিকে আকৃষ্ট হইয়া অতি অল্পকালের মধ্যে উৎকৃষ্ট নাটক, কবিতা ও মহাকাব্য লিখিয়া সকলকে বিস্মিত করিয়া দিলেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে তিনি ইংলণ্ড গমন করেন, এবং তথায় ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে দেশে ফিরিয়া ব্যারিষ্টারী ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ইউরোপে অবস্থানকালে তিনি ফরাসী ও ইতালীয় ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। অতিরিক্ত ব্যয় ও অমিতাচারের ফলে ঋণগ্রস্ত ও রোগগ্রস্ত হইয়া অশেষ কষ্ট ভোগ করিয়া, মধুসূদন ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জুন আলিপুরের দাতব্য চিকিৎসালয়ে দেহত্যাগ করেন। মধুসূদনের 'Captive Lady' ও 'Visions of the Past'—প্রথম রচনা, দুইখানি কাব্যই ইংরাজী। বাংলাভাষায় তিনি প্রথমে নাটক রচনা করেন, এবং পরে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার তিনখানি উৎকৃষ্ট কাব্য 'মেঘনাদ-বধ', 'ব্রজাঙ্গনা' ও 'বীরাঙ্গনা' প্রকাশিত হয়। য়ুরোপে অবস্থানকালে তিনি 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'র অধিকাংশ রচনা করেন।

মধুসূদন আধুনিক সাহিত্যের পত্তনকারীদের অন্যতম ; এবং কেবলমাত্র প্রতিভার শক্তিতে তিনি বোধ হয় অদ্বিতীয়। মাত্র চারি বৎসর লেখনী ধারণ করিয়া আর কোন দেশের কোন কবি এরূপ কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন বলিয়া জানা নাই। তিনি যখন বাংলাভাষায় সাহিত্য রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন সে ভাষায় তাঁহার অধিকার অল্পই ছিল—বাল্যে পাঠশালায় যেটুকু পরিচয়, এবং মাতৃভাষা বলিয়াই যেটুকু জ্ঞান, তাহার অধিক ছিল না ; এবং সেটুকুও বহুদিন বিদেশে বাস ও বিজাতীয় সমাজে বিদেশী ভাষা চর্চ্চার ফলে মলিন হইয়া গিয়াছিল। এরূপ অবস্থায় লেখনীধারণের দুই বৎসরের মধ্যেই 'মেঘনাদবধ', 'বীরাঙ্গনা' ও 'ব্রজাঙ্গনা'র মত কাব্য রচনা করিতে পারা যথার্থ দৈবী প্রতিভার পক্ষেই সম্ভব। ইহার দুইটি কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, প্রথম,—ঐরূপ প্রতিভা ; দ্বিতীয়,—ভাষামাত্রই আয়ত্ত করিবার আশ্চর্য্য ক্ষমতা। মধুসূদন যতগুলি ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন সেকালে ভারতবর্ষে আর কেহ ততগুলি ভাষা জানিতেন না। তিনি, বাংলা ও ইংরেজী ছাড়া এই ভাষাগুলি শিক্ষা করিয়াছিলেন—সংস্কৃত, তামিল, তেলেগু, হিব্রু, গ্রীক, ল্যাটিন, ফরাসী ও ইতালিয়ান। শেষ জীবনে তিনি স্বগৃহে ইংরেজীর পরিবর্ত্তে ফরাসী ভাষায় কথা কহিতেন। এইরূপ বহু ভাষার বিবিধ উৎকৃষ্ট কাব্যের সহিত পরিচয় থাকার জন্য, এবং তাহাতে উৎকৃষ্ট কবিপ্রতিভা যুক্ত হওয়ায়, তিনি যেন ইচ্ছামাত্রেই বাংলা কাব্যের গতি ফিরাইয়া দিলেন—নূতন কল্পনা, নূতন ভাষা ও নূতন ছন্দের প্রবর্ত্তন করিলেন। মধুসূদন নাটক-রচনাতেও নূতন আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার 'চতুর্দ্দশপদী' কবিতাই প্রথম বাংলা সনেট। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে যে তিনটি প্রথম শ্রেণীর প্রতিভার উদয় হইয়াছে তাহাদের মধ্যে মধুসূদন অন্যতম ; বলা বাহুল্য, অপর দুইজন—বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ। [২৮, ২৯, ৩০, ৩১]

মোহিতলাল মজুমদার—(১৮৮৮—)—বাংলা ১২৯৫ সালে (১১ই কার্ত্তিক) নদীয়া জেলার কাঁচড়াপাড়া গ্রামে মাতুলালয়ে বৈদ্যবংশে জন্ম ; পৈতৃক নিবাস হুগলী জেলার বলাগড় গ্রাম। পিতার নাম নন্দলাল মজুমদার, মাতার নাম হেমমালা দেবী। পিতা ছিলেন কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের নিকট জ্ঞাতি-ভ্রাতা ;

—দেবেন্দ্রনাথের পিতারও পূর্ব্ব উপাধি ছিল 'মজুমদার'। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের বংশও তাঁহার মাতুলবংশেরই এক শাখা। মোহিতলালের কৈশোর ও স্কুল-জীবন বলাগড় গ্রামেই অতিবাহিত হয়; বাল্যে কিছুদিন কাঁচড়াপাড়ার নিকটবর্ত্তী হালিশহরে মায়ের মাতুলালয়ে থাকিয়া তথাকার স্কুলে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন। নিজের সম্বন্ধে মোহিতলালের যে একটি কথা বলিতে ইচ্ছা হয়, তাহা এই। স্কুলের ও কলেজের (তিনি তখনকার 'মেট্রোপলিটান ইন্‌ষ্টিটিউশন' ও এখনকার 'বিদ্যাসাগর কলেজ' হইতে ১৯০৮ সালে বি-এ পাশ করেন) শিক্ষা তিনি সম্যক গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তাঁহার মানস-প্রকৃতির উন্মেষে ও সাহিত্যিক সাধন-পন্থার নির্দ্দেশে তাঁহার পিতার চরিত্র ও তন্নিহিত আদর্শ, এবং পিতারই কবি-স্বভাব ও কাব্য-প্রীতি প্রকৃত সহায় হইয়াছে—সে বিষয়ে পিতাই তাঁহার শিক্ষা ও দীক্ষাগুরু। বাংলাসাহিত্যের সেবায় মোহিতলালের যদি কিছুমাত্র অধিকার জন্মিয়া থাকে, তবে তাহার জন্য তিনি সর্ব্বতোভাবে তাঁহার পিতার নিকটে ঋণী। [মোহিতলালের কবি-খ্যাতি সাহিত্যসমাজেই সীমাবদ্ধ—সেখানেও তাঁহার কবিত্ব সম্বন্ধে সকলে একমত নহেন। তাঁহার কবিতার ভাব ও ভাষা এমনই গুরু ও গম্ভীর যে, তরল-মতি তরুণ, অথবা সৌখীন-হৃদয় বৃদ্ধ, কাহারও পক্ষেই তাহা সুখসেব্য নহে: তৎসত্ত্বেও, আধুনিক কবিগণের মধ্যে তাঁহাকে একটা স্থান দেওয়া চাই—নহিলে, নাকি অন্যায় করা হইবে।] মোহিতলাল এ পর্য্যন্ত এই কয়খানি কাব্য প্রকাশিত করিয়াছেন—'স্বপন-পসারী', 'বিস্মরণী', 'স্মরগরল', ও 'হেমন্ত-গোধূলি'। [৮৫]

মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়—(১৮৮২—)—বর্ত্তমান নিবাস খাগড়া মুর্শিদাবাদ, আদি নিবাস নবদ্বীপ। এই কবির একখানিমাত্র কাব্য 'বনফুল' ১৩১৬ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্র-যুগের আধুনিক কাব্য-মন্ত্রে দীক্ষিত কবি এই কাব্যখানিতে ভাষা ও ছন্দের বিষয়ে যেমন সত্যকার কবিশক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তেমনই পরম বৈষ্ণবসুলভ কৃষ্ণ-বিরহের আকুল উৎকণ্ঠা এই কবিতাগুলিতে সৌন্দর্য্য-প্রীতির সহিত যে ভক্তি-রস সঞ্চার করিয়াছে তাহাও কম উপভোগ্য নহে। এ বিষয়ে কবি মোহিনীমোহন কবি কুমুদরঞ্জনের সহিত

তুলনীয়; উভয়ের কবি-প্রকৃতি প্রায় একই বটে; তথাপি মোহিনীমোহনের কাব্য এই হিসাবে কৌতূহল উদ্রেক করে—যে, তিনি কেবল ভাব-জীবনেই বৈষ্ণব নহেন, বৈষ্ণব-মন্ত্রেরও দীক্ষিত সাধক। সে দিক দিয়া তাঁহার কাব্যচর্চ্চা প্রাচীন বৈষ্ণব পদকর্ত্তাদের মত ধর্ম্মসাধনারই একটি অঙ্গ। কবি তাঁহার কাব্যের মূল সুর এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

বিন্দুর ফাঁদে সিন্ধু যে কাঁদে—করুণা তাঁহার সাধে,
ভজ রাধে—কহ রাধে—জপ রাধে—জয় রাধে!

[৮০]

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত—(১৮৮৭—)—১২৯৪ বঙ্গাব্দে, আষাঢ় মাসে বর্দ্ধমান জেলার পাতিলপাড়া গ্রামে মাতুলালয়ে জন্ম হয়; নিবাস শান্তিপুরের নিকট হরিপুর গ্রাম। পিতার নাম ৺দ্বারকানাথ সেনগুপ্ত। যতীন্দ্রনাথ এফ-এ পাশ করার পর শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে প্রবেশ করেন, ও তথা হইতে ১৯১১ সালে বি-ই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিছুকাল কৃষ্ণনগরে ডিষ্ট্রিক্ট্‌ বোর্ডের অধীনে চাকুরী করিয়া পরে স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় সে কার্য্য ত্যাগ করিয়া কাশিমবাজার এষ্টেটে কর্ম্মচারীর পদ গ্রহণ করেন; এখনও সেই কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন। কৃষ্ণনগরে অবস্থানকালেই তাঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মরীচিকা' রচিত ও প্রকাশিত হয়। কবি তাঁহার সাহিত্যিক জীবনের কথা লিখিতে গিয়া বলিয়াছেন—বাল্যে ও কৈশোরে কাশীরাম দাসের মহাভারত ও পাঠ্যপুস্তকের কবিতা ভিন্ন তিনি আর কোন কাব্যপাঠের সুযোগ পান নাই; ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে রবীন্দ্র-কাব্য বা সাহিত্যের সঙ্গেও তাঁহার পরিচয় ঘটে নাই। কৃষ্ণনগরে অবস্থান কালে কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর সহিত পরিচয় ও তাঁহার সহানুভূতি ও উৎসাহের ফলে, তিনি রীতিমত কবিতা লেখা আরম্ভ করেন। যতীন্দ্রনাথের কবি-জীবনের এই ইতিহাস তাঁহার কবিতার ভাব ভাষা ও ভঙ্গির স্বাতন্ত্র্য বুঝিবার পক্ষে মূল্যহীন নহে। কবি আরও লিখিয়াছেন—"আমার কাব্যের দুঃখবাদ পারিবারিক জীবনের দুঃখ হইতে উদ্ভূত নহে; এ ভূত কোথা হইতে ঘাড়ে চাপিল, জানিনা,—প্রথম কৈশোর হইতেই সে আমার পিছু লইয়াছিল বলিয়া মনে হয়"। আধুনিক

কবিগণের মধ্যে যতীন্দ্রনাথ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছেন; তাঁহার কবিতায়—ভাষা ও ভাবের বলিষ্ঠতা এবং তীব্র অনুভূতির সহিত আত্মস্থতা অতিশয় লক্ষণীয়। যতীন্দ্রনাথের কর্ম্মজীবনে ও কবিজীবনে সাক্ষাৎ বিরোধ আছে মনে করিয়া কৌতুক বোধ হয়। তিনি বি-ই উপাধিধারী ইঞ্জিনিয়ার; আর কোন বাঙালী বোধ হয় ঐরূপ শিক্ষা ও ঐরূপ কর্ম্মজীবন সত্ত্বেও এমন কবি-প্রতিভার পরিচয় দেন নাই। কর্ম্মকার যেমন অতি কঠিন লৌহ আগুনে কোমল করিয়া তাহার সেই অত্যুজ্জ্বল রক্তবর্ণ পিণ্ডকে হাতুড়ির আঘাতে নানা আকারের গঠন দেয়—যতীন্দ্রনাথের কবিতায়, অগ্নিতপ্ত হৃদ্‌পিণ্ডের উপরে সেই হাতুড়ির আঘাত, এবং তাহার ফলে ভাব ও ভাষার জমাট দৃঢ়তা ও সুপরিচ্ছন্ন গঠন পরিলক্ষিত হয়। (কবিত্ব সম্বন্ধে 'কবিতা-পাঠের' যথাস্থান দেখ)। যতীন্দ্রনাথ এই কয়খানি কাব্য রচনা করিয়াছেন—'মরীচিকা', 'মরুশিখা', 'মরুমায়া' এবং 'সায়ম্'। [৮৩, ৮৪]

যতীন্দ্রমোহন বাগচী—(১৮৭৮—)—নদীয়া জেলার যমশেরপুরের সম্ভ্রান্ত বাগচী পরিবারে, সন ১২৮৫ সালের অগ্রহায়ণ মাসে কবি যতীন্দ্রমোহনের জন্ম হয়; পিতার নাম ৺হরিমোহন বাগচী। অতি অল্প বয়সেই যতীন্দ্রমোহন কবিখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন—ছাত্রাবস্থা শেষ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার কবিতা সেকালের 'ভারতী' 'সাহিত্য' প্রভৃতি বড় বড় মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইতে থাকে। তখন হইতে অদ্যাবধি তাঁহার কবিতা লেখার বিরাম নাই। তিনি অধুনালুপ্ত 'মানসী' ও 'যমুনা'—দুইখানি পত্রিকার সম্পাদকতাও করিয়াছিলেন। যতীন্দ্রমোহন সাক্ষাৎ রবীন্দ্র-শিষ্যগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান, এজন্য তাঁহার কাব্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব কিছু অধিক হওয়াই স্বাভাবিক। ভাষার বিশুদ্ধতা ও মাধুর্য্য—খাঁটি বাংলা বুলির ব্যবহারে কবিজনসুলভ নৈপুণ্য—ইঁহার রচনার একটি বিশেষ গুণ। কবিত্বের প্রধান লক্ষণ—সহৃদয়তা; অতিশয় সামান্য বাঙালী-জীবনের সুখ-দুঃখ, এবং বাংলার পল্লীপ্রকৃতির সৌন্দর্য্য ইঁহার কবিতায় যেমন মধুর তেমনই মর্ম্মস্পর্শী হইয়া উঠে। এই বাস্তবপ্রীতির সঙ্গে কবিকল্পনার সৌকুমার্য্যও তাঁহার কাব্যের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। যতীন্দ্রমোহনের কবিতার ভাষা ও ভাব যেমন

পল্লীবাসী খাঁটি বাঙালীর ভাবনা-কল্পনায় সঞ্জীবিত, তেমনই, উৎকৃষ্ট রুচি ও রসবোধের দ্বারা সংযত ও সুমার্জ্জিত। ইঁহার রচিত কাব্যগুলির মধ্যে এইগুলি প্রধান—'রেখা', 'লেখা', 'অপরাজিতা' 'জাগরণী', 'নাগকেশর' 'নীহারিকা', 'মহাভারতী' ও 'পাঞ্চজন্য'। [৭০, ৭১, ৭২]।

যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়—(১৮৩৯—১৯০০)—সন ১২৪৬ (?) সালে হুগলী জেলার কোন্নগরে কবির জন্ম হয়; মৃত্যু হয় ১৩০৭ সালে। 'পদ্যপাঠ' নামে, স্কুলের নিম্ন ও উচ্চ শ্রেণীর উপযোগী তিন ভাগ কবিতা-পুস্তক সঙ্কলন করিয়া তিনি বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের মতই বাংলার ছাত্রসমাজে অতি পরিচিত গ্রন্থকাররূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। ঐ সঙ্কলনগুলিতে যদুগোপালের স্বচরিত কবিতাও ছিল,—দুঃখের বিষয় সেইগুলি ছাড়া তাঁহার আর কোন কাব্য বা কবিতার কোন সংবাদই পাওয়া যায় না। 'পদ্যপাঠে'র সেই কবিতাগুলি হইতে ইহাই মনে হয় যে, সঙ্কলনেও যেমন—রচনাতেও তেমনই, যদুগোপাল অতিশয় সরল শুদ্ধ ও বিশদ ভাষায় উচ্চভাবপূর্ণ কবিতার পক্ষপাতী ছিলেন, এবং তরুণ শিক্ষার্থীর মনে সেই আদর্শ মুদ্রিত করিয়া দেওয়াই তাঁহার কবিত্বের প্রেরণা হইয়াছিল; এজন্য তাঁহাকে ছাত্রহিতৈষী কবি বলা যাইতে পারে। যদুগোপাল চিকিৎসা-শাস্ত্রেও ব্যুৎপন্ন ছিলেন, 'সরল শরীর-পালন' ও 'ধাত্রীবিদ্যা' নামে তিনি দুইখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। 'কবিতা-পাঠ' দেখ। [৩৬]

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—(১৮২৬—১৮৮৭) হুগলী জেলায় বাকুলিয়া গ্রামে জন্ম হয়। পিতার নাম রামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। রঙ্গলাল অতিশয় সুপণ্ডিত ছিলেন—অনেকগুলি ভাষায় তাঁহার অধিকার ছিল। তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। অল্প বয়সে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন; ঈশ্বরগুপ্তের 'প্রভাকর' পত্রিকায় তাঁহার কবিতা প্রকাশিত হইত। রঙ্গলাল আধুনিক ও প্রাচীন কবিগণের মধ্যবর্ত্তী—তাঁহার বিখ্যাত 'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্যে এ দুই যুগের চিহ্নই বর্ত্তমান, এবং তাহাতেই কাব্যের আধুনিক লক্ষণ—ইংরাজী কাব্যের প্রভাব—প্রথম প্রকাশ পায়। তথাপি রঙ্গলাল অতিশয় রক্ষণশীল ছিলেন; তিনি খাঁটি দেশীয় আদর্শেই বাংলা কবিতার উন্নতি সাধন করিতে চাহিয়াছিলেন; তাঁহার প্রধান চেষ্টা ছিল—সেকালের কদর্য্য রুচি, গ্রাম্য-ভাব ও অমার্জ্জিত ভাষা হইতে বাংলা কবিতাকে মুক্ত করিয়া শিক্ষিত সমাজের শ্রদ্ধার বস্তু করিয়া তোলা।

এই কার্য্যে তিনি সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রকৃত আধুনিক আদর্শে বাংলা কবিতাকে নূতন করিয়া সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। তাঁহার অন্যান্য কয়েকখানি কাব্যের নাম—'কর্ম্মদেবী', 'শূরসুন্দরী', 'কাঞ্চী-কাবেরী'। ['কবিতা-পাঠ' দেখ] [২৫, ২৬, ২৭]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—(১৮৬১—১৯৪১)—বাংলা ১২৬৮ সালের ২৫শে বৈশাখ কলিকাতার বিখ্যাত ঠাকুরবংশে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে জন্ম হয়; পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, এবং পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। ১৫ বৎসর বয়সে তাঁহার প্রথম কাব্য 'বনফুল' প্রকাশিত হয়। ১৭ বৎসর বয়সে শিক্ষালাভের জন্য প্রথম বিলাতযাত্রা করেন। সেই সময় হইতে 'ভারতী' পত্রিকায় বহুবিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়া খ্যাতিলাভ করেন। ইহার পর সারাজীবন ধরিয়া ক্রমাগত কাব্য, নাটক, নভেল, প্রবন্ধ প্রভৃতি প্রকাশ করিতে থাকেন। ১৮৯১ সালে বিখ্যাত মাসিকপত্র 'সাধনা' প্রকাশ করেন। ১৯০০—১৯০১ সালে বোলপুরে শান্তি-নিকেতন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন এবং নবপর্য্যায় 'বঙ্গদর্শনে'র সম্পাদক হন। ১৯০২ সালে স্ত্রী-বিয়োগ হয়। ১৯১২ সালে কবির বয়স পঞ্চাশ পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে, 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ' এক বিরাট সভায় দেশবাসীর পক্ষ হইতে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করেন, এবং ঐ বৎসর তিনি তৃতীয় বার য়ুরোপ-ভ্রমণে যাত্রা করেন। ১৯১৩ সালে নোবেল প্রাইজ পান। ১৯১৫ সালে নাইট পদবী লাভ করেন। ১৯১৯ সালে 'জালিয়ানওয়ালা বাগে'র প্রতিবাদ স্বরূপ 'সার' উপাধি পরিত্যাগ করেন। ১৯২০ সালে সমগ্র য়ুরোপ পর্য্যটন করেন এবং সর্ব্বত্র অসাধারণ সম্মান লাভ করেন। ১৯২১ সালে 'বিশ্বভারতী' ও পরবৎসর 'শ্রীনিকেতন' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩০ সালে একাদশতম বিদেশ ভ্রমণে বাহির হন, ও ইউরোপে নিজের অঙ্কিত চিত্র প্রদর্শন করেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি চীন, জাপান আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা এবং বহির্ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে পর্য্যটন করিয়াছিলেন —ইহার মধ্যে কোন কোন দেশে একাধিকবার গমন করেন। ১৯৩১ সালে তাঁহার বয়স ৭০ বৎসর পূর্ণ হইলে পৃথিবীর সকল দেশের মনীষিগণ তাঁহাকে আনন্দ ও সম্মান জ্ঞাপন করেন, এবং সেই উপলক্ষে কলিকাতায় তাঁহার জয়ন্তী-উৎসব হয়; সংস্কৃতশিক্ষা-পরিষদ তাঁহাকে 'কবি সার্ব্বভৌম' উপাধি দ্বারা

ভূষিত করেন। ১৯৩২ সালে তিনি পারস্যের সম্রাটের নিমন্ত্রণে আকাশযানে পারস্য গিয়াছিলেন। ১৯৪১ সালের ৭ই আগষ্ট, কিঞ্চিদূর্দ্ধ ৮০ বৎসর বয়সে কবি পরলোক গমন করেন।

রবীন্দ্রনাথ বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি, এবং ভারতের মহাকবিগণের অন্যতম। বাল্মীকি, ব্যাস এবং কালিদাসকে বাদ দিলে ভারতের প্রাচীন সাহিত্যেও চতুর্থ আর কোন কবি তাঁহার সমকক্ষ নহেন; এমনও বলা যাইতে পারে যে, গীতি-কবি হিসাবে তিনি এ দেশের প্রাচীন ও আধুনিক সকল কবির শীর্ষস্থানীয়। আরও একটি বিষয়ে তাঁহার প্রতিভা অনন্যসাধারণ—তিনি ভারতের সর্ব্বযুগের সাধনাকে কাব্যের ভিতর দিয়া এক অখণ্ডরূপে প্রকাশ করিয়াছেন; এবং সেই সাধনায় মানবাত্মার যে অত্যুচ্চ ধারণা নিহিত ছিল, তাহারই প্রেরণায় তিনি আধুনিক যুগে, সর্ব্বজাতির—সর্ব্বমানবের—মহামিলন-গান গাহিয়াছেন। এজন্য তাঁহার রচনাবলীতে বিশ্বজনীনতার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইউরোপীয় ভাব-চিন্তার যাহা কিছু সত্য, সুন্দর, ও সঞ্জীবন তাহাকেও তিনি খাঁটি ভারতীয় ভাবে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করিয়াছেন; এজন্য তাঁহার কাব্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে একটি উৎকৃষ্ট মিলনভূমি হইয়া আছে।

কিন্তু বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের দান অতুলনীয়। তিনি বাংলা ভাষা ও বাংলা ছন্দকে এত রূপে এত ভঙ্গিতে কর্ষণ করিয়াছেন, এবং গদ্য ও পদ্যের এত বিভিন্ন ছাঁচে সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন যে, তাঁহার হাতে বাংলা ভাষা ও বাংলাসাহিত্যের সকল দৈন্য ঘুচিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীর তালিকা এখানে দেওয়া অসম্ভব; তাঁহার রচিত প্রধান কাব্যগুলির নাম 'সঞ্চয়িতা' অথবা 'চয়নিকা'র সূচীপত্রে দ্রষ্টব্য। [৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২]

রাজকৃষ্ণ রায়—(১৮৫৫—১৮৯৩) রাজকৃষ্ণ রায়ের আদি নিবাস ছিল বর্দ্ধমান জেলার রামচন্দ্রপুর গ্রাম। শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হইয়া দারিদ্র্যের জন্য লেখাপড়া করিতে পারেন নাই; কলিকাতায় আসিয়া সামান্য খোলার ঘরে বাস করিতেন। অল্প বয়সেই কবিত্ব-শক্তির স্ফুরণ হয়। বাংলা ১২৮১ সাল হইতে তিনি নানা বিষয়ে অনর্গল কবিতা রচনা করিতে থাকেন, এবং কেবল কবিতার দ্বারা অন্নাভাব ঘুচে না দেখিয়া উপন্যাস ও নাটক রচনায় মন দেন। তিনি নিজেই মেছুয়াবাজারে 'বীণা'-প্রেস স্থাপন করেন, এবং সেই প্রেস হইতে 'বীণা' নামে একখানি মাসিকপত্রিকা বাহির করেন। পরে স্বরচিত নাটকগুলির

অভিনয়ের জন্য 'বীণা থিয়েটরে'র প্রতিষ্ঠা করেন। নাটক-রচনার অবকাশে তিনি মূল সংস্কৃত রামায়ণ ও মহাভারত অবিকল পদ্যে অনুবাদ করিয়াছি[illegible]ন। গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁহার নাটকে যে ভঙ্গ-অমিত্রচ্ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন রাজকৃষ্ণ রায় তাহার পথ-প্রদর্শক। তিনি এত দ্রুত কবিতা রচনা করিতে পারিতেন যে, দুইজন লোকেও তাহা লিখিয়া উঠিতে পারিত না। কবি শেষে ঋণ-জালে জড়িত হইয়া বড় দুঃখ ও কষ্টের মধ্যে ১৮৯৩ সালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার কবিতাগুলি 'অবসর-সরোজিনী' নামে দুইখণ্ডে প্রকাশিত হয়; তাঁহার 'প্রহ্লাদ চরিত্র', 'নরমেধ-যজ্ঞ' প্রভৃতি নাটক এবং বহু রঙ্গ-রচনা এককালে সকলকে মাতাইয়া তুলিয়াছিল। [৪৫]

রামনিধি গুপ্ত—(১৭৪১—১৮৩৯) হুগলী জেলার চাপতা নামক গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি 'নিধুবাবু' নামেই পরিচিত ছিলেন, এবং গীত-রচনাতেই বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দেন। ওস্তাদী 'আখড়াই'-গানের জন্য সেকালের গুণী সমাজে আদৃত হইলেও, ইনি টপ্পা-জাতীয় গান রচনা করিয়া জনপ্রিয় হইয়াছিলেন। ইঁহার রচিত এই ধরণের গান উৎকৃষ্ট গীতি-কবিতা বলিয়াও গণ্য হইতে পারে। [২৯]

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়—(১৭১২—১৭৬০) ব্রাহ্মণ জমিদার-বংশে ইঁহার জন্ম। পিতার নাম নরেন্দ্রনারায়ণ রায়; হুগলী জেলার অন্তর্গত (পূর্ব্বে বর্দ্ধমান) হাওড়ার অদূরবর্ত্তী আমতার নিকট ভূরশুট পরগণার মধ্যে পেঁড়ো গ্রামে জন্ম হয়। ভারতচন্দ্র পরে নিজ পৈত্রিক বাসস্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হন, এবং নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয়ে আসিয়া বাস করেন। অতঃপর উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করিয়া সেকালের শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। কৃষ্ণচন্দ্র কবিকে 'রায়-গুণাকর' উপাধি প্রদান করেন। বাংলা ভাষার সাহিত্যিক রূপ, ও বাংলা কাব্যকলা তাঁহার হাতেই পুরাতন যুগের শেষ উৎকর্ষ লাভ করে, এবং আধুনিক কাব্যের পূর্ণ বিকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত তিনিই বাংলার শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। তাঁহার কাব্যগুলির মধ্যে 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই কাব্যখানি তিন ভাগে বিভক্ত; তন্মধ্যে দ্বিতীয় ভাগকে 'কালিকামঙ্গল' নাম দেওয়া যাইতে পারে; এই অংশে কবির কবিত্বের যথার্থ পরিচয় থাকিলেও, অশ্লীলতার দোষে ইহা আধুনিক সমাজে প্রচারযোগ্য নয়। [১৪, ১৫, ১৬]

রামেন্দু দত্ত—(১৯০৫—) জন্ম ও নিবাস বর্দ্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ গ্রামে। 'ভারতবর্ষ', 'প্রবাসী' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় বহু কবিতা প্রকাশ করিয়াছেন। পরিপক্ব রচনা—ভাষা ও ছন্দের দৃঢ়তা, এবং ভাবের সরলতা লক্ষণীয়।

এ পর্য্যন্ত ইঁহার এই কয়খানি কাব্য প্রকাশিত হইয়াছে—'মঞ্জুলা', 'দুলালী' ও 'নবমঞ্জরী'। [৯১]

সজনীকান্ত দাস—(১৯০০—)। পৈত্রিক নিবাস বীরভূম জেলার রায়পুর গ্রাম : জন্ম বর্দ্ধমান জেলার বেতালবন গ্রামে, মাতুলালয়ে। সজনীকান্ত ছাত্রজীবন অসমাপ্ত রাখিয়া—এম্-এস্, সি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়াও—শেষে পরীক্ষা না দিয়া,—অতিশয় দুঃসাহস সহকারে সাহিত্যিক জীবন বরণ করেন। তিনি গদ্যরচনাতেই বিশেষ খ্যাতি লাভ করিলেও, বহু কবিতা লিখিয়াছেন ; সেই সকল কবিতার ভাষা ও ছন্দের অনর্গল স্রোত বিস্ময়কর। সজনীকান্তের ব্যঙ্গ-কবিতা বিশেষতঃ তাঁহার প্যারডি (parody)-কবিতাগুলি অতুলনীয়। তাঁহার রচিত গভীর ভাবের কবিতাগুলির প্রধান প্রেরণা এই যে—তিনি, আধুনিক জীবনে মানুষের ঘোরতর অধঃপতন সত্ত্বেও, মনুষ্যত্বের শাশ্বত মহিমায় দৃঢ় বিশ্বাসী। বহু ব্যঙ্গ-কবিতায় এবং তীক্ষ্ণ সমালোচনায় তিনি যেমন এই আধুনিকতার ব্যাধি ও দম্ভকে কশাঘাত করিয়াছেন, তেমনই তাঁহার 'রাজহংস' প্রভৃতি কয়েকখানি কাব্যে তিনি এই আধুনিক যুগকে মানবাত্মার অগ্নিপরীক্ষার যুগ বলিয়া গৌরব অনুভব করিয়াছেন, এবং আশা করেন, অদূর ভবিষ্যতে সেই মহাকবির আবির্ভাব হইবে, যাঁহার কাব্যে এই যুগের প্রকৃত পরিচয় মিলিবে। সজনীকান্ত এ যাবৎ এই কাব্যগুলি প্রকাশিত করিয়াছেন —'অঙ্গুষ্ঠ', 'পথ চল্‌তে ঘাসের ফুল', 'বঙ্গ-রণভূমে', 'আলো-আঁধারি', 'রাজ-হংস', 'মানস-সরোবর', 'পঁচিশে বৈশাখ'। [৯২]

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত—(১২৮৮—১৩২৯) ইনি বিখ্যাত গদ্য-লেখক অক্ষয়কুমার দত্তের পৌত্র—পিতার নাম রজনীনাথ দত্ত। সত্যেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ শিষ্যগণের অন্যতম হইলেও তাঁহার কবিপ্রকৃতি কিছু স্বতন্ত্র। খাঁটি বাংলা ভাষা ও বাংলা ছন্দের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ দেখা যায়, এই দুই বিষয়ে তিনি অসামান্য রচনাকৌশলের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি যেমন পুরাতন ভাষাকে নূতন ছাঁচে ঢালিয়াছেন, তেমনই বহু নূতন বিদেশী শব্দের দ্বারা তাহাকে প্রাণবন্ত করিয়াছেন। ছন্দের নিছক কারিগরিতে তিনি এ যুগের সকল কবির অগ্রগণ্য। তাঁহার কবিতায় বিজ্ঞান, ইতিহাস, পুরাণ এবং আধুনিক কালের সমসাময়িক নানা তথ্য এমন ভঙ্গিতে এবং এমন যুক্তি ও ভাবুকতার সহিত প্রযুক্ত হইয়াছে যে, কেবল সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যগুলি আদ্যোপান্ত ভাল করিয়া পাঠ করিলে বাংলা ভাষায় গভীর জ্ঞান, ভাবুকতা ও পাণ্ডিত্য লাভ করা যায়। তিনি রবীন্দ্রনাথের যুগে জন্মিয়া এবং রবীন্দ্র-শিষ্য

হইয়াও প্রাচীন (ক্লাসিক্যাল) কাব্যরীতির পক্ষপাতী ছিলেন, এবং তাঁহার কবিতায় শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের চূড়ান্ত করিয়া গিয়াছেন। সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যগুলির মধ্যে এইগুলি উল্লেখযোগ্য :—'তীর্থ-সলিল', 'কুহু ও কেকা'; 'অভ্র-আবীর', 'মণিমঞ্জুষা', 'বিদায়-আরতি' ও 'বেলাশেষের গান'। [৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬]

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার—(১৮৩৭—১৮৭৮)—যশোহর জেলার অন্তর্গত ভৈরব নদের তীরবর্ত্তী জগন্নাথপুর ইহার জন্মভূমি, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণবংশে জন্ম হয়। বাংলা কাব্যের নবযুগের কবিগণের অন্যতম; কিন্তু তাঁহার কাব্যসাধনার আদর্শ অতিশয় স্বতন্ত্র ছিল। তিনি কাব্যে নিছক কল্পনা বা কাব্য-সৌন্দর্য্য অপেক্ষা—সমাজ, সংসার ও প্রকৃতির বাস্তব-পরিচয় অধিকতর মূল্যবান বলিয়া মনে করিতেন। ইতিহাস, দর্শন ও জ্ঞানবিজ্ঞানের অনুশীলনই তাঁহার সাহিত্যিক আদর্শ ছিল; এজন্য তিনি অতিশয় গাঢ় ও অর্থপূর্ণ ভাষায় অতিশয় সারবান ভাব-চিন্তা কবিতার আকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তথাপি, সেইরূপ রচনাতেও গভীর ভাবুকতার সহিত একপ্রকার কবিত্বের মিলন প্রায় দেখা যায়। 'মহিলাকাব্য'ই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা; অন্যান্য কাব্য—'বর্ষ-বর্ত্তন', 'সবিতা-সুদর্শন' প্রভৃতি। [৩৪, ৩৫]

সৈয়দ আলাওল—(খ্রীঃ সপ্তদশ শতাব্দী)—জন্ম ও মৃত্যুকাল জানা যায় নাই; তবে কবির বৃদ্ধ বয়সেই মৃত্যু হয়, এবং তাহা ১৬৭১ খৃষ্টাব্দের পরে। আলাওলের জন্মস্থান ফরিদপুর জেলার ফতেহাবাদ পরগণার জালালপুর গ্রাম। একদা স্থানান্তরে যাইবার কালে পিতাপুত্রে জলদস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন; যুদ্ধে পিতা নিহত হন, আলাওল পলায়ন করিয়া অবশেষে আরাকান রাজ্যে (রোসাঙ্গ বা রোসাঙ্গ) আসিয়া আশ্রয় লন, এবং সেইখানেই রাজার অনুগ্রহ লাভ করেন। রাজমন্ত্রী মাগন ঠাকুরের অনুরোধে তিন হিন্দি কবি মালিক মুহম্মদ জয়সীর 'পদুমাবৎ' কাব্যের বাংলা অনুবাদ 'পদ্মাবতী' রচনা করেন। মধ্যযুগের বাঙ্গালী কবিগণের মধ্যে আলাওলের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে; তিনি বহুভাষাবিদ্ পণ্ডিত ছিলেন, এবং বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত অনেকগুলি বৈষ্ণব পদও আছে। আলাওল শেষ বয়সে চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী থানার জবরা গ্রামে বসবাস করিয়াছিলেন; সেইখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। [১৩]

হুমায়ুন কবির—(১৯০৬—)—কবি হুমায়ুন কবীর বাংলার আধুনিক শিক্ষিত সমাজে তাঁহার বহুমুখী প্রতিভার জন্য একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছেন। তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'গ্রেট্স্' (Greats)-এর সম্মান-সহ উচ্চ ডিগ্রী লাভ করেন, এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজী সাহিত্য ও দর্শনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। বাংলা সাহিত্যের সেবা করিয়া এবং বহু কবিতা ও প্রবন্ধ রচনা করিয়া তিনি মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ, ভাবুকতা ও চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়াছেন। এক্ষণে তিনি 'চতুরঙ্গ' নামে একখানি সাহিত্য-পত্রিকা সম্পাদন করিতেছেন। রাজনীতির ক্ষেত্রেও তিনি সমান খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, এবং হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে ভারতে একজাতীয়তা-স্থাপনের আদর্শ তিনি কাজে ও কথায় পালন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত তাঁহার দুইখানি কাব্য প্রকাশিত হইয়াছে—'সাথী' ও 'স্বপ্নসাধ'। [৯৮]

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—(১৮৩৮—১৯০৩)—হুগলী জেলার অন্তর্গত গুলিটা নামক গ্রামে মাতুলালয়ে জন্ম হয়। হেমচন্দ্রের পিতার নাম কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। হেমচন্দ্র হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন; এবং পরে প্রেসিডেন্সি কলেজে কিছুকাল অধ্যয়ন করেন। তিনি ১৮৫৯ সালে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, এবং অল্প দিন মুন্সেফী করার পর, স্বাধীনভাবে ওকালতী আরম্ভ করেন। শেষ-জীবনে তিনি অন্ধ হইয়াছিলেন। বাংলা ১৩১০ সালের ১০ই জ্যৈষ্ঠ তাঁহার মৃত্যু হয়। হেমচন্দ্র আধুনিক বাংলা মহাকবিগণের অন্যতম। হেমচন্দ্রের প্রথম কাব্য 'চিন্তা-তরঙ্গিনী' ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়, এবং শেষ কাব্য 'চিত্ত-বিকাশ', অন্ধাবস্থায় কাশীধামে রচিত হয়। হেমচন্দ্রের রচনাবলীর মধ্যে 'বৃত্রসংহার'-মহাকাব্য, 'দশমহাবিদ্যা' ও 'কবিতাবলী' জনসমাজে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। (কবিত্বের সম্বন্ধে 'কবিতা-পাঠের' যথাস্থান দ্রষ্টব্য)। [৩৭, ৩৮, ৩৯]

সংশোধনী

(১) পৃঃ ২৭৩, ৭ পং—'শীবভূত' না হইয়া 'বশীভূত' হইবে।

(২) শব্দার্থ-সূচী হইতে বাদ পড়িয়াছে—
"জনু (১)—যেন না।"

(৩) পৃঃ ৩৪৯, পং ৬—'পড়ে' না হইয়া 'পড়' হইবে।

(৪) পৃঃ ৩৬৫, পং ১৬—'কবিতার' না হইয়া 'পত্রিকার' হইবে।